কত অজানারে

শংকর

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

সংসার পরিক্রমার পথে কত বিচিত্র সঞ্চয়ই যে দিনে-দিনে পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে তার বুঝি আর ইয়ত্তা নেই। যা একদিন অচেনা থাকে, অজানা থাকে তাকেই আবার একদিন চিনে ফেলি, জেনে ফেলি। অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন খুলে কখন সে-ই আবার ধরা দেয় মনের কাছে। এই এমনি করেই সঞ্চয়ের পুঁজি একদিন ভারি হয়ে ওঠে, আর স্মৃতির আকাশে রং ধরে তখনই।

ঘটনাচক্রে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের আদালতি কর্মক্ষেত্রে আমাকেও একদিন এমনি অসংখ্য অপরিচিত চরিত্রের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। সেদিন অচেনাকে চেনা আর অজানাকে জানাই ছিল আমার জীবিকার অপরিহার্য অঙ্গ। তারপর এতোদিন পরে হঠাৎ একদিন টের পেলাম কখন যেন আমার আকাশও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে তাদের রঙে। কখন যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাদের আমি ভালোও বেসে ফেলেছি মনে মনে। জানি, আইনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা বিশেষ মধুর নয়। অন্ততঃ সাহিত্যের কমলবনে আইনের কলরব ঠিক ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো শোনায় না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমি আইনকে দেখিনি। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের যে-মানুষদের একদিন ভালোবেসেছিলাম তাদেরই আজ অক্ষরে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি মাত্র, আর কিছু নয়।

শংকর

গ্রন্থকারের অন্য রচনা :

যা বলো তাই বলো

পদ্মপাতায় জল

উৎসর্গ

পরলোকগত
নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল মহোদয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ।

কত অজানারে

প্রীতি উপহার —

কত অজানারে

"এর নাম হাইকোর্ট!"

অবাক হয়ে হাইকোর্টের উঁচু চুড়োটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এর নাম হাইকোর্ট! বিভূতিদার মুখের দিকে তাকালাম। বিভূতিদার হাত ধরেই এখানে এসেছি। চাকরি হবে, যা-তা চাকরি নয়। সায়েব ব্যারিস্টার, তাঁর কাছে চাকরি।

এর আগে তো রাস্তায় ছোটোখাটো জিনিষ ফেরি করেছি। কিন্তু 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' মন্ত্র মনে-প্রাণে জপ করেও জীবনধারণ যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তখন বাণিজ্য দেবীর ভগিনী দেবী সরস্বতী অপ্রত্যাশিতভাবে কৃপাবর্ষণ করলেন। অবশ্য আমার পক্ষে খুরুট রোডের বিবেকানন্দ স্কুলে মাস্টারি লাভ কোনোদিনই সম্ভব হতো না, যদি না ওই স্কুলের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক আমার 'বাজেট-সংকট' সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হতেন। মাস্টার মানে অঙ্ক ইংরেজীর নয়। মাস্টার সমাজে অঙ্ক ও ইংরেজীর মাস্টারমশায়রা কুলীন। বাকি সব ইতরে জনা সর্বশাস্ত্রবিদ্। আমি শেষোক্ত দলে। সুতরাং ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, বাংলা, সংস্কৃত কোনোটা পড়াতে বাকি রাখিনি। সেখান থেকেই সোজা চলে এসেছি রামকৃষ্ণপুর ঘাট এবং হোরমিলার কোম্পানির 'অম্বা' স্টীমারে নদী পেরিয়ে হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের চুড়োটার দিকে আবার তাকালাম। বর্শার ফলকের মতো তীক্ষ্ণ শীর্ষ যেন মেঘের আবরণ ভেদ করে আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে চাইছে। আমার অবস্থা দেখে বিভূতিদা হেসে বলেছিলেন, "বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো একেই বলে; রোজ এখানে আসতে হবে, চূড়ো কেন ওই বাড়িটার ভিতরের অনেক কিছুই ক্রমশঃ দেখতে ও জানতে পারবে। এখন চেম্বারে চলো"

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি বিভূতিদা ঠিকই বলেছিলেন। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীট ও তার পাশের ওই আকাশচুম্বী লাল প্রাসাদটিতে অহরহ জীবন নাটকের কত খেলা চলেছে। জীবনের কয়েকটা বছর সেখানে খরচ করে স্মৃতির খাতায় জমার অঙ্ক অনেক বেড়ে গিয়েছে। যতো দেখেছি তার কতটুকু আজ আর মনে পড়ে? তবুও কত বিচিত্র মুখের ছবি সেখানে সাজানো।

বিভূতিদা বললেন, "সায়েব-সুবোরা সাধারণত কেমন খটমট হয়; কিন্তু এ-সায়েব অন্য মানুষ, একেবারে অন্য মানুষ। কোনো ভয় নেই। প্রথমে যদিও সামান্য অসুবিধা হয়, ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"চেম্বার কাকে বলে!"

আমার প্রশ্নে বিভূতিদা হেসে ফেললেন। "সায়েব যেখানে বসেন। ওই-যে সামনের হলদে রঙের বাড়িটা।"

এতোক্ষণে সেদিকে আমার নজর পড়লো। বাড়ির নাম টেম্পল চেম্বার। কতকালের পুরনো বাড়ি বলা শক্ত। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের এক পাশে টেম্পল চেম্বার; অন্য পাশে হাইকোর্ট!

টেম্পল চেম্বারে ঢোকার পথে দেওয়ালে অসংখ্য চিঠির বাক্স! তার কোনোটি চকচকে, সদ্য যৌবন প্রাপ্ত। কোনোটি-বা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে প্রসাধনহীন জীর্ণ মলিন বেশে পথের পাশে ডাকপিওনের প্রতীক্ষারত।

মস্ত বড়ো বাড়ি। কিন্তু ঠিক বোলতার চাকের মতো—এক একটি খোপে এক একটি এটর্নির বাসা। অনেক ঘরে দিনদুপুরেও সূর্যালোক প্রবেশ অসম্ভব, ফলে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর ব্যবসার প্রসার হয়েছে। কিন্তু মনের হরষে দিবসে বাতি জ্বালা সত্ত্বেও এখানকার ভাড়াটিয়াদের নিশীথ-প্রদীপের কোন অভাব হয় না।

লিফ্‌টে কেমন এক সোঁদা গন্ধ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের লিফ্‌ট। তিনজনের বেশি একত্রে ঊর্ধ্বে আরোহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে সরাসরি স্বর্গারোহণের সমূহ সম্ভাবনা। লিফ্‌টের জন্য অনেক যাত্রী সার দিয়েছেন। কালো কোটপরা এটর্নি, কালো গাউন হাতে ব্যারিস্টার। আধময়লা জামাপরা এটর্নি

বাড়ির বাবু, ফিনফিনে ধুতি ও মাথায় টুপিওয়ালা দীর্ঘবপু মারওয়াড়ী কোনো শাঁসালো মক্কেল। আমার ঠিক সামনে গরদের চাদর গায়ে এক বাঙালী বিধবা, হাতে হরিনামের ঝুলি, কাঁচা সোনার রঙ। হয়তো কোনো জমিদার গৃহিণী, আইনের হেফাজত সামলাতে পুজো ছেড়ে এটর্নি আপিসের লিফ্‌টে লাইন দিয়েছেন।

গুটিগুটি পা পা করে আমরা শেষ পর্যন্ত লিফ্‌টের ভিতর ঢুকে পড়লাম। লিফ্‌টম্যান একবার আড়চোখে তাকালো, কিন্তু কথা বললে না। বয়স এমন কিছু হয়নি, কিন্তু মাথার চুলগুলো একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। "এই যে বৃন্দাবন, সব খবর ভালো তো? সায়েবের নতুন বাবু"—বিভূতিদা আলাপ করিয়ে দিলেন। লিফ্‌ট হুহু করে উপরে উঠছে, এক একটি তলা মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। বৃন্দাবন এবার আমার দিকে ভালো করে তাকালো, কিন্তু কিছু বলবার পূর্বেই তাকে হাতল ঘোরাতে হলো। নামবার সময় এসে গিয়েছে।

পকেট থেকে চাবি বার করে বিভূতিদা দরজা খুললেন। আলো জ্বলে উঠলো। একটা বড়ো ঘর। মধ্যে পার্টিশন। সামনের ছোটো অংশে একটা টেবিল, আলমারি, কাগজপত্র। "আমরা এখানে বসি।" সুইংডোর ঠেলে বিভূতিদা আমাকে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "সায়েব এখানে বসেন।" মস্ত টেবিল, চারিদিকে অনেকগুলো চেয়ার! অন্য কোণে আর একটা ছোটো টেবিল। তিনদিকের দেওয়াল র‍্যাকে ঢাকা, তাতে অসংখ্য মোটা মোটা আইন বই!

"এতো বই!"

"এ আর ক'খানা।" বিভূতিদা বুঝিয়ে দিলেন, "বই নিয়েই তো এখানকার কারবার। কারখানার যেমন হাতুড়ি বাটালি, তেমনি এগুলো ওকালতির যন্ত্রপাতি। আরও অনেক বই লাগে। বার লাইব্রেরিতে যখন নিয়ে যাবো তখন দেখতে পাবে।"

সায়েব এখনও আসেনি। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন বিভূতিদা। আমাকেও বসতে বলে কেমন দুঃখভরা চোখে তাকালেন। তারপর আরম্ভ করলেন নিজের কথা।

ষোল বছর আগে বিভূতিদা যখন টেম্পল চেম্বারে এসেছিলেন,

তাঁর বয়স তখন কুড়ি বছর। পাঁচ টাকা মাইনেতে টেম্পল চেম্বারে এক এটর্নি আপিসের টাইপিস্ট। লিফ্‌টে জাঁদরেল চেহারার এক ইংরেজ ব্যারিস্টারের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়েছে, বিভূতিদা ভয়ে এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আপিস থেকে বেরোবার সময়ও এক একদিন সায়েবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "কী কাজ করো?"

এক শনিবার দেড়টার সময় বিভূতিদা মেশিন বন্ধ করেছিলেন। বেয়ারা এসে বললে, "পাশের ঘরের ব্যারিস্টার সায়েব আপনাকে ডাকছেন।"

"আমার একটা জরুরী টাইপের কাজ করে দিতে পারবে? এখানেই টাইপরাইটার রয়েছে।" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজী হয়ে গিয়ে বিভূতিদা একমনে টাইপ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে গেল, "মাই সন, কমলালেবু খাবে?" বিভূতিদা চমকে উঠে দেখলেন সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর হাতে একটা কমলালেবু। বিভূতিদা অবাক। এ আবার কেমন সায়েব? মনিবরা আবার টাইপিস্টদের সঙ্গে কমলালেবু ভাগ করে খায় নাকি?

কাজকর্ম শেষ করে চলে যাবার সময় সায়েব তাঁর হাতে একখানা পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিলেন—"তোমার পারিশ্রমিক।"

"আজ্ঞে, আমার কাছে তো ভাঙানি নেই।"

"না না, ভাঙানির দরকার নেই, পুরো পাঁচটাকাই দিলাম।"

বিভূতিদার বিশ্বাস হয় না। দেড় ঘণ্টায় পাঁচটাকা—এ যে তাঁর এক মাসের মাইনে।

ছুটির পর এমনি কাজ করে মাঝে মাঝে পাঁচ টাকার নোট পেতে লাগলেন বিভূতিদা। শেষপর্যন্ত সায়েব একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কাছে কাজ করবে?"

বিভূতিদা এক কথায় রাজী। এমন সুযোগ কে ছাড়বে?

দিন কয়েক কাজ করেই কিন্তু বিভূতিদা হাঁপিয়ে উঠলেন। ভয়ঙ্কর খাটুনি। দিন নেই, রাত নেই, শুধু কাজ। ছুটির দিনেও নিস্তার নেই, সন্ধ্যে সাতটা আটটা পর্যন্ত টাইপ করো। অসম্ভব। সায়েবকে কিছু না জানিয়েই বিভূতিদা চেম্বার থেকে ডুব দিলেন।

পুরনো এটর্নি আপিসই ভালো। কিন্তু দু'দিন পরে টেম্পল চেম্বারের সামনে বিভূতিদা সায়েবকে দেখতে পেলেন। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও সায়েবের কাছে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। হাতটা চেপে ধরলেন সায়েব। "চাকরি ছেড়ে যাবে কোথায়, দুষ্টু ছেলে

কাঁচুমাচু মুখে, ইস্কুল পালানো ছেলের মতো সায়েবের পিছুপিছু বিভূতিদা আবার চেম্বারে ফিরে এলেন।

"সেই যে এলাম, এই ছাড়ছি। মাঝখানে একটানা ষোলো বছর কেটে গিয়েছে।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিভূতিদা বললেন।

এই ষোলো বছরে বিভূতিদা সায়েবকে চিনেছেন। সায়েব তাঁকে ডেকে বলেছেন, "বিভূতি, তোমার বাড়ি যাবো!"

"সেকি! আমরা যে বড়ো নোংড়া জায়গায় থাকি।"

"উঁহু, তবুও যাবো।"

সায়েব বাড়ি এসেছেন। পরনে ধুতি-চাদর—বাঙালীর বাড়ি বাঙালী সাজে যেতে ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। ধুতি পরা সোজা নয়। কোমরে কাপড় আটকে থাকতে চায় না। তাই বেল্ট দিয়ে কাপড় পরেছেন সায়েব। শান্তিপুরি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর।

"তোমার মাদারের সঙ্গে আলাপ করবো।" ঘোমটা দিয়ে বিভূতিদার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন "ছেলেকে আপনার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।"

সায়েব আবার এসেছেন, মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে! কিন্তু তাঁর গাড়ি যখন কালী বাঁড়ুজ্যে লেন-এর সরু রাস্তা দিয়ে কোনো রকমে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো তখন সব শেষ। শ্মশান-যাত্রীরা তার আধ ঘণ্টা আগে গলির মোড় পেরিয়ে চলে গিয়েছেন। আপিসে বিভূতিদা কেঁদে ফেলেছেন। সায়েব কাঁধে হাত রেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছেন। "তোমার মাদারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখন থেকে তোমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার।

আরও দিন গিয়েছে। ছোট ভাই-বোনদের স্কুল কলেজে পাঠিয়েছেন বিভূতিদা, সায়েব খবর নিয়েছেন। বোনের বিয়েতে তিনি এসেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, সব ঠিক তো?"

কালী বাড়ুজ্যে লেন-এ সায়েব আবার গাড়ী থেকে নেমেছেন—পরনে এবারও ধুতি। কিন্তু তাঁর হাতে ফুলের তোড়া, আর মুখে হাসি। বিভূতিদার যে বিয়ে!

এমনি করে কোন ফাঁকে বিভূতিদা ও সায়েব দু'জনেই ভুলে গিয়েছেন তাঁদের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। এ যেন এক সংসারে বাস এক সূত্রে বাঁধা জীবন।

কিন্তু ষোলো বছর পরে বিভূতিদার মনে হঠাৎ ভয় ধরেছে। বিভূতিদার ছেলেপুলে হয়েছে। সংসারে দায়িত্ব অনেক। সায়েব বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু বিভূতিদার সামনে জীবনের অনেকটা অংশ পড়ে রয়েছে।

শুনে সায়েবও চিন্তিত হয়ে ঘাড় নেড়েছেন—"সত্যিই তো। পার্সোনাল সার্ভিসের এই দোষ। ঠিক আছে।" কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লাইভ স্ট্রীটে বিভূতিদার চাকরি যোগাড় করে ফেলেছেন সায়েব।

"সেই সায়েবকে আমি স্বার্থপরের মতো ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সায়েবকে দেখো।" বিভূতিদার চোখে জল।

"সায়েবকে দেখবে তো?" বিভূতিদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"দাঁড়ান আগে তো ইণ্টারভিউ হোক। সায়েব আমাকে পছন্দ করবেন কিনা তারই ঠিক নেই।"

এমন সময় কয়েক জোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল।

"সায়েব আসছেন," বিভূতিদা বললেন।

"আমার যে ইংরেজী কথা আটকে যায়।"

"কোনো ভয় নেই। শুধু গুড্ মর্নিং বলবে। তারপর আমি আছি।"

কিন্তু উত্তেজনার বশে আসল সময়ে আমার মুখ থেকে গুড্ মর্নিংও বার হলো না। বরং সায়েবই আমাকে গুড্ মর্নিং জানিয়ে ঘরে ঢুকলেন। পিছনে মোহনচাঁদ ও দেওয়ান সিং দুই বেয়ারা।

কোনো ইংরেজের সঙ্গে আমার জীবনে এই প্রথম সাক্ষাৎ। ছ'ফুট লম্বা গোলাপী রঙের দেহ, এই বয়সেও সম্পূর্ণ সোজা, সারা মাথা জুড়ে টাক্, সমস্ত মুখটিতে হাসি ছড়িয়ে আছে।

বিভূতিদা আমাকে ভিতরে সায়েবের টেবিলের কাছে নিয়ে গেলেন। "এই ছেলেটির কথাই বলেছিলাম।"

"অল রাইট, কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিয়েছো তো ?"

"না, আগে দেখা না করেই……"

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে ঘাড় নেড়ে খুব গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "তাই তো, ঠিক বলেছো। Yes, yes, I must ask him some very difficult questions and that too with Scotch accents,"

এঁ্যা !

বিভূতিদা ভাবে বুঝলেন, বললেন, "না না, সায়েব কিছুই জিজ্ঞাসা করবেন না। এমনি মজা করছেন।"

নাম জিজ্ঞাসা করলেন সায়েব। পুরো নাম শুনে বললেন, "উঁহু, এতো বড়ো নাম আমি বলতে পারবো না। একটা ছোট্ট পোর্টেবল নাম চাই।"

চোখ বুজে সায়েব নিজেই ভাবতে লাগলেন।

"ভালো নাম দেওয়া খুব কঠিন কাজ। কিন্তু। হুঁ, পেয়ে গিয়েছি—শংকর। এ নামে তোমার কোন আপত্তি আছে ?"

ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের জীবনে আমার আসল নামটা সেদিন থেকেই হারিয়ে গিয়েছে। কেউ ডাকে না আমায় সে নামে। পুরনো বেনারসী শাড়ীর মতো সেটা বিস্মৃতির বাক্সে কোথায় চাপা পড়ে আছে, আমার নিজেরও খোঁজ নেবার আগ্রহ হয় না।

পকেট থেকে চাবির রিং বার করে বিভূতিদা আমার হাতে দিলেন। "এ-সংসার এখন থেকে তোমার। সব কিছু কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নাও আমার কাছ থেকে।"

ছোটোখাটো কয়েকটা খাতাপত্তরের খুঁটিনাটি তিনি বুঝিয়ে দিলেন। "চেম্বারে অনেক কিছুই করবার আছে! কিন্তু সেসব ক্রমশঃ নিজেই বুঝতে পারবে। কোনো ট্রেনিং-এর দরকার নেই। সবচেয়ে কাজে লাগবে যে-বিদ্যেটি এম. এন. দত্তর শর্টহ্যাণ্ড স্কুল থেকে আয়ত্ত করেছো। কোর্টে কাজ কম থাকলেই সায়েব অনেক চিঠি লিখবেন, সেগুলো যত্ন করে টাইপ কোরো।"

শর্টহ্যাণ্ড থেকে যে চিঠিটি আমি প্রথম টাইপ করেছিলাম সেটি আজও মনে আছে। খুব আস্তে আস্তে বলেছিলেন সায়েব। আট দশ লাইনের চিঠিটা টাইপ করে টেবিলে দিয়ে আসার কিছুক্ষণ

পরেই মোহনচাঁদ বললে, "সায়েব আপনাকে ডাকছেন।" ভিতরে ঢুকে আড়চোখে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে আমার কান লাল হয়ে উঠলো। দশ লাইনে গোটা পনের ভুল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না আমাকে।

চিঠিটা আবার টাইপ করে এগিয়ে দিলাম। এবার হেসে বললেন, "বাঃ, সুন্দর হয়েছে।"

আমি অবাক।
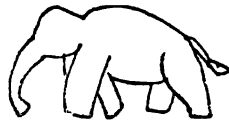
এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ। আমার সায়েব নাকি কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরাজ ব্যারিস্টার। এ-কথা বিভূতিদাই বলেছিলেন। শুধু এই নয়, আরও অনেক কথা বলেছিলেন।

সে কোন্ আদ্যিকালের কথা, সুপ্রীম কোর্টের সৃষ্টি হলো লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টে। চাঁদপাল ঘাটের কাছে জাহাজ থেকে জজসায়েবরা প্রথম কলিকাতার মাটিতে পা দিলেন। খাস বিলেত থেকে যাঁরা বাঙলা মুলুকে এলেন, তাঁদের প্রধান স্যার ইলায়জা ইম্পে। রাস্তায় কাতারে-কাতারে দর্শনার্থী কৌতূহলী দেশী লোকের ভিড়। ইম্পে চমকে উঠলেন। বেশির ভাগ লোকের খালি গা ও খালি পা। অন্য জজদের ডেকে তিনি বললেন, "ব্রাদার্স দেখেছো, এদেশের লোকের গায়ে কাপড় নেই! পায়ে মোজা পর্যন্ত জোটে না! আমরা কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে প্রত্যেককে জুতো আর মোজা পরিয়ে ছাড়বো।"

তারপর কত ছ'মাস কেটে গিয়েছে। এদেশের লোকদের মোজা পরাবার কথা ইম্পে সাহেব একেবারে ভুলে গেলেন। মোজা তো দূরের কথা, পেটপুরে খাবার ব্যবস্থাও হলো না। ইম্পে তখন পুল তৈরির কণ্ট্রাক্ট বাগাবার আশায় বাল্যবন্ধু হেস্টিংস-এর পিছনে ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। দুষ্টজনে তাঁর নতুন নাম দিলে 'পুলবাঁধা ইম্পে'। মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে পুলবাঁধা ইম্পে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন।

ইম্পের পিছন পিছন বিলেত থেকে আর এক দল লোক এসে হাজির। সুপ্রীম কোর্টের আশেপাশে তাঁরা ঘাঁটি বসালেন। এঁরা এটর্নি। এঁরা ব্যারিস্টার। বিলেতের আইনব্যবস্থাকে এদেশে চালু করার মতো কোনো মহান উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল কিনা জানি না, হয়তো কেবল অর্থের আকর্ষণেই তাঁদের বাঙলা দেশে আগমন। কিন্তু ধীরে ধীরে এক গৌরবময় ট্র্যাডিশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো তাঁদের দ্বারা। গড়ে উঠলো কলকাতা বারের গর্বের ইতিহাস।

সে-যুগে আইনের কাজ আজকের মতো সোজা ছিল না লোকে তখন আদালতকে মান্য করতে শেখেনি। তখন জোর যার মুলুক তার। কোর্টে মামলা করে লাভ নেই। কারণ মামলায় জিতলেও অপর পক্ষ আদালতের রায় মানে না। বলে, লাঠি থাকতে আদালত কি? আইনজ্ঞরা বুঝলেন, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। লোকে যদি আদালতের আদেশই না মানলো, তাহলে কোর্ট খুলে লাভ কী?

সেকালে ডাকসাইটে সায়েবদের আইন অমান্যের উৎসাহ নেটিভদের থেকে একটুও কম ছিল না। প্রয়োজন মত এদেশী লোকদের কাছে কলাটা-মূলোটা ছাড়াও সায়েব-সুবোরা টাকাপত্তর নিতেন। নিজের এলাকায় তাঁরা এক-একটি খুদে হিজ হাইনেস। স্বদেশের সুবোধ সুশীল বালকদের এমন নবাবী মেজাজ দেখে জজরা অবাক।

রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে নামে এক ভদ্রলোক এসে জানালেন, "ধর্মাবতার, বিহারের আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন অনেকদিন আগে, কিন্তু এখন দেনা শোধ দিতে রাজী নন।"

বিচার করে সুপ্রীম কোর্ট ডিক্রি দিলেন ম্যাকেঞ্জিকে টাকা ফেরত দিতে হবে।

ম্যাকেঞ্জি যে সে লোক নন, তিনি বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট। খবর শুনে বললেন, এতো বড়ো আস্পর্ধা আমার নামে ডিক্রি। একটি পয়সাও মিলবে না।

সুপ্রীম কোর্টের শেরিফ চললেন বিহারে। ম্যাকেঞ্জিকে ধরে আনতে। কিন্তু পথিমধ্যে ছোটোখাটো যুদ্ধের ব্যবস্থা। ম্যাকেঞ্জি

সায়েবের বরকন্দাজরা তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার, বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত। শেরিফের দলবলের উপর তারা যখন হা-রে-রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন যে যেদিকে পারে পালালো।

সুপ্রীম কোর্টও ছাড়বার পাত্র নন। সম্মানে আঘাত লেগেছে তাঁদের। সুতরাং শেরিফকে আবার বিহারে পাঠানো হলো, সঙ্গে এবার পুরো সৈন্যবাহিনী। জেনারেল উড্ ও তাঁর আর্মি প্রয়োজন হলে ম্যাকাঞ্জির সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। গতিক সুবিধে নয় দেখে, ম্যাকেঞ্জি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যের টাকা কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দিলেন।

গোরা পাঠিয়ে ডিক্রি জারির প্রয়োজন অবশ্য বেশী দিন রইলো না। লোকে ক্রমশঃ বুঝতে পারলো আদালতকে মান্য করলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। টাকাপয়সা, জমিজমা নিয়ে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ছেড়ে তারা কোর্টে আসতে শুরু করলো। দেশে খুন জখমের সংখ্যা অনেক কমলো। ফলে লেঠেলদের ব্যবসায় মন্দা পড়লো বটে, কিন্তু সৃষ্টি হলো এক নতুন বুদ্ধিজীবী লেঠেল সম্প্রদায়ের, যাঁরা আইনের লাঠি চালিয়ে জীবন ধারণ করেন। বিলেত থেকে অসংখ্য জজ, ব্যারিস্টার ও এটর্নি এসে কলকাতার আইন জগতে যোগ দিলেন।

তারপর ইতিহাসের রথচক্র কতবার না আবর্তিত হলো। কোথায় গেলেন ওয়ারেন হেস্টিংস আর ইলায়জা ইম্পে। কোথায় গেলেন কর্নওয়ালিস আর ওয়েলেসলি। শেষ পর্যন্ত যারা রাজত্বের পত্তন করলে, সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও রইলো না। দিন মজুরের গাঁইতির আঘাতে একদিন সুপ্রীম কোর্টের পুরনো বাড়িটাও কলকাতার বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের ধারে নতুন হাইকোর্ট তৈরি হলো। কিন্তু পুরনো ট্র্যাডিশনের স্রোতে বাধা পড়লো না।

বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার এলেন হাইকোর্টে। এলেন প্রখ্যাত এটর্নির দল। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে মাথা তুলে দাঁড়ালো বড়ো বড়ো বাড়ি—টেম্পল চেম্বার, লিণ্ডলি চেম্বার। অনেক মামলা, অনেক মক্কেল। একশ' বছর ধরে গম গম করছে আইনপাড়া।

"এ পাড়াটি এক আজব জায়গা", বিভূতিদা বলছিলেন।

“মক্কেল, জজসায়েব, উকিল, ব্যারিস্টার ও এটর্নি ছাড়াও কতরকম লোকের আনাগোনা এখানে।”

“খানিকটা হয়তো জানো। তবু বলে রাখি। বিশেষ করে এটর্নি-ব্যারিস্টারের সম্পর্কটা বাইরের অনেকের জানা নেই। ডুয়াল সীস্টেম বা ওই ধরনের কি একটা নামও আছে। ‘আদিম বিভাগে মক্কেলের সঙ্গে এটর্নির প্রথম সম্বন্ধ। হাইকোর্টে মামলা করতে এলে এটর্নির কাছে যেতেই হবে। এটর্নি কেসটা ঠিকঠাক করে কোর্টে ফাইল করবেন এবং ব্যারিস্টারকে ব্রীফ পাঠাবেন জজের সামনে মামলা করার জন্য। ব্যারিস্টার মক্কেলের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক রাখতে পারেন না, সব কাজ এটর্নির মাধ্যমে করতে হবে।”

বিভূতিদা আরও বললেন, “অনেকে ভাবে এ-পাড়ায় আইনের নামে যতোরাজ্যের বেআইনী কাজ হয়। উকিলরা মিথ্যে কথা বলে, এটর্নিরা সুযোগ পেলেই মক্কেলকে শোষে। ভাই-এ ভাই-এ মোকদ্দমায় ছু’জনেই পথে বসে, মাঝখান থেকে এটর্নিরা কলকাতায় বাড়ি তোলে। কথাগুলো যে সবসময় মিথ্যা তা নয়, কিন্তু সবাই এখানে কিছু চোর ডাকাত নয়। এখানে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা জীবনে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি। সততাই তাঁদের জীবনের একমাত্র মূলধন।”

বিভূতিদা সায়েবের কথায় ফিরে এলেন। বললেন, “উড্‌রফ, স্যর গ্রিফিথ ইভান্স, উইলিয়ম জ্যাক্সনের মতো আইনবিদ্‌রা যে কীর্তি রেখে গিয়েছেন, আমাদের সায়েব তার শেষ বর্তিকাবাহী। কলকাতা হাইকোটের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যার শুরু, বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে তার অবসান!”

টেম্পল চেম্বারে ঠিক দশটায় যাই। সাড়ে-দশটায় কোর্টে যাবার আগে সায়েব টাইপের কাজকর্ম দিয়ে যান। লাঞ্চের সময় ফিরে এসে সেগুলি তিনি দেখবেন। ছুটোর সময় আবার কোর্টে যাবেন, ফিরবেন ঠিক চারটেয়। মোহনচাঁদ তৎক্ষণাৎ এক গ্লাশ

ঠাণ্ডা জল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে তাঁর দিকে এগিয়ে দেবে। জল খেয়ে আমাকে ডাক দেবেন তিনি—

"কেমন লাগছে, মাই সন? কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। আমি কেস্ থাকলে তবে কোর্টে যাই। অন্য সময় এখানে বসে কাজ করি।"

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি।

"উঁহু, কথা বলতে হবে। না বললে ছাড়বো না। প্রথমে দু'চারটে ভুল সবারই হয়। ইংরেজী ভাষাটা সোজা নয়।" সায়েব হাসতে হাসতে বলেন।

সাহস পেয়ে শেষপর্যন্ত আমিও একদিন কথা বলতে আরম্ভ করলাম। প্রায় চীনাবাজারের ইংরেজী।

সায়েব তাতেই খুশি। বললেন, "দেখো, যদিও আমার মাথায় মস্ত টাক, বুড়োদের আমি মোটেই দেখতে পারি না। ইয়ংম্যানদের সঙ্গেই আমার যতো মনের কথা হয়। তাই না মিস্টার মোহনচাঁদ?"

মোহনচাঁদ বেয়ারা হলেও আমার থেকে একশ'গুণ ভালো ইংরেজী বোঝে। সে ব্যাগের ভিতর কাগজপত্র গুছোতে গুছোতে সায়েবের কথা শুনে মুখ টিপে হাসে, কিছুই বলে না।

ওর হাসি দেখে আমার বুকের বল আরও বেড়ে যায়। বেপরোয়া হয়ে সায়েবের সঙ্গে গল্পগুজব আরম্ভ করে দিই। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, মনের ভাব প্রকাশ করতে এমন কিছু অসুবিধা হয় না।

এতো বড়ো ব্যারিস্টার, কিন্তু শিশুর মতো মন। সময় পেলে কত গল্প করেন। অথচ কাজের সময় ভয়ানক গম্ভীর। চোখে চশমা লাগিয়ে যখন বই পড়েন, তখন কে বলবে ইনিই আমার সঙ্গে টাকের গল্প করেন। তখন কোনো শব্দ সহ্য করেন না। বই কিংবা কাগজ এগিয়ে দিতে সামান্য দেরি হলে রেগে ওঠেন। কাজ ফুরোলে কিন্তু আবার সেই পুরনো মানুষটি। কাছে ডেকে গল্প করেন। জিজ্ঞাসা করেন, এটা জানো, ওটা জানো? যদি বলি, না তাহলে তখনই সরলভাবে বুঝিয়ে দেন।

সায়েব এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের এক নামকরা হোটেলে থাকেন।

তাঁর গাড়িতে ছুটির পর রোজ সেখানে যাই। চা পানান্তে সামান্য বিশ্রাম। তারপর দু'একটা চিঠি টাইপ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি।

হোটেল নয়তো যেন রাজপ্রাসাদ। ঘরের সংখ্যা তিনশ'র কাছাকাছি। আর তকমাপরা চাকরবাকর—তাদের গুনতে গেলে সেন্সাস আপিস বসাতে হবে। ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান, চীনা, জাপানী সর্ব্বজাতির এই মিলনতীর্থে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের প্রতিনিধিরাও আছেন। তবে তাঁরা এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

আমার ধারণা ছিল হোটেল মানে যেখানে খেতে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন হলে থাকার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এখানে থাকা বা খাওয়ার ব্যাপারটি যেন নিতান্ত নগণ্য। কোটপ্যাণ্টের দরকার টেলরিং ডিপার্টমেণ্টে স্লিপ পাঠিয়ে দিন। সিনেমা? দোতলার হল-এ চলে যান। সিনেমা দেখে স্নানের আগে চুল কি দাড়িটা ঠিক করে নিতে পারেন—দেশী নাপিত নয়, খাস চীন থেকে আমদানী।

এখানে লাঞ্চের সময় হাল্কা সুরে বাজনা বাজে, বিকেলে চায়ের সময়েও বাজনা, তবে ভিন্ন সুর। রাতের ডিনারে কিন্তু কেবল নিরামিষ বাজনা নয়। কন্টিনেণ্টের প্রখ্যাত সিনেমা ও টি. ভি. অপ্সরীরা তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হন। এবং তাদের সংগীত ঝঙ্কারে ও নৃত্য ছন্দে আগন্তুকদের প্রথমে মুগ্ধ এবং অবশেষে মন্ত্রমুগ্ধ হতে দেখা যায়। আমার দৌড় তো আমাদের গলির মোড়ের বিনোদিনী কাফে পর্যন্ত। সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসে মনে হলো যেন একেবারে আবু হোসেনের রাজত্বে হাজির হয়েছি।

গেট পেরিয়ে হোটেলের ভিতরে ঢোকার প্রথম অভিজ্ঞতা শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। এর পরে চোখ ঝলসানো লাউঞ্জ। পুরু কার্পেটে ঢাকা মেঝের উপর কতকগুলো সোফা। পাশেই ছোটো-ছোটো টিপয়ের উপর একরাশ বিলিতি ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন। সন্ধ্যার পর দেওয়ালের মধ্যে লুকোনো নীলাভ আলোগুলো জ্বলে উঠে সেখানে এক অস্পষ্ট স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আমার দৃষ্টি ইদানীং রোজই লাউঞ্জের কোণের দিকে বসা একটি মেয়ের দিকে পড়ে যেতো। ভদ্রমহিলার বেশের পরিপাট্য বিচিত্র ধরনের। প্রসাধন বৈশিষ্ট্যও অদ্ভুত। মুখটি আড়ালে থাকলে দেহের অবশিষ্ট অংশের দিকে তাকিয়ে কে বলবে তাঁর বয়স একুশ কিংবা বাইশের বেশি। লণ্ডন ও প্যারিসের প্রসাধন প্রস্তুত-কারকদের কিন্তু এক জায়গায় পরাজয় হয়েছে। বিভিন্ন বিউটি প্রডাক্টের সযত্ন প্রলেপও মুখমণ্ডলের চলে-যাওয়া যৌবনের চিহ্নগুলি ঢাকতে পারেনি। বুঝতে কষ্ট হয় না, বসন্ত নেই। তবে সে বসন্তের বিদায়-উৎসব দশ না কুড়ি বছর আগে সম্পন্ন হয়েছে, অনভ্যস্ত চোখ নিয়ে হিসেব করতে পারিনি।

পিছনের দেওয়ালে অজন্তা-স্টাইলে আঁকা শকুন্তলার ছবি। অস্তমিত সূর্যের পটভূমিকায় মৃগশিশুদের সঙ্গে ক্রীড়ামত্তা তপোবনবাসিনী শকুন্তলা। আশে পাশে পিতলের টবে রাখা নানান জাতের লতাপাতা। শকুন্তলার এই ছবির সহিত মেয়েটির উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকার দৃশ্যটি মিশে গিয়ে যেন আর একটি স্বতন্ত্র ছবির সৃষ্টি হতো।

প্রতি সন্ধ্যায় দোতলায় যাবার পথে তাঁকে দেখেছি। কাজের শেষে ফেরার পথেও লাউঞ্জ খালি নয়। ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন একাকিনী আসর জাগায়ে।

জনৈক ভদ্রলোককে একদিন বলতে শুনলাম, "লাউঞ্জ সাজানোর জন্য নানান মরসুমী ফুলের মতো হোটেল কোম্পানি এঁকেও আমদানী করেছেন। দাদা, শুধু নিরামিষ ফুল আর ফ্রেস্কো-ছবিতে অনেকের যে মন ভরে না!"

ভদ্রমহিলার পরিধানে এক-একদিন এক-এক রঙের শাড়ি কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও গোলাপী। এক পায়ের উপর আর একটি পা চড়িয়ে, সোফায় হেলান দিয়ে তিনি একমুখ ধোঁয়া শূন্যে ছুড়ে দেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে অলস গতিতে সেই ধোঁয়া দূরে মৃগশিশুদের দিকে অগ্রসর হয়। মেয়েদের মুখে—সে যে-দেশের মেয়েই হোক—সিগারেট আমার কেমন দৃষ্টিকটু ঠেকে। কিন্তু আরও অশোভন তাঁর সোনালী রঙের গ্রীসিয়ান জুতো নাড়ানোর ভঙ্গি। হোটেল-বাসিনী আধুনিক শকুন্তলার ওইখানেই ছন্দপতন।

কিছুদিনের মধ্যে লাউঞ্জে এক যুবকের আবির্ভাব হলো।

ছোকরার বয়স চব্বিশ কিংবা পঁচিশ। হুডখোলা এক বিরাট বুইক গাড়ি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রেস্কো-ছবির শকুন্তলাকে পিছনে রেখে ওঁরা ত্ব'জনেই মৃত্বগুঞ্জনে সময় কাটান। নিরালা আলাপ যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে, আলো জ্বলে ওঠে, কিন্তু গুঞ্জন চলে। পাশে ছুটি পানীয়ের গ্লাস, তাতে কোল্ড-ড্রিঙ্ক না দ্রাক্ষা রস বলতে পারবো না। খুব সম্ভব শেষেরটি। কেননা, অরেঞ্জ বা লাইম স্কোয়াশ মানুষকে অতো ঢুলু-ঢুলু করে তুলতে পারে মনে হয় না।

হোটেলে ঢোকার পথে হুডখোলা বুইক গাড়িটা মাঝে মাঝে আমার নজরে পড়েছে। ড্রাইভারের আসনে সেই ছোকরা, আর পাশে ভদ্রমহিলা। চোখে নীল চশমা।

এঁরা ত্ব'জন ক্রমশঃ হোটেলের চাকর-বাকরদের নানা রসালো গল্পের নায়ক-নায়িকা হয়ে দাঁড়ালেন। রিসেপশনিস্ট শৈলেন বোসের সঙ্গে আমার খানিকটা আলাপ আছে। সে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে, দেখেছেন কি?" প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "বৃক্ষচূড়া কোথায় পেলেন?" "ওইটুকুই বাকি আছে, তাহলে গাছে তুলে মই কেড়ে নেবার কোনো অসুবিধা থাকে না", বোস হেসে উত্তর দিলে।

লাউঞ্জের প্রণয়-দৃশ্যটি সায়েবের নজর এড়ায়নি। হাইকোর্ট থেকে ফিরে আমরা লিফ্‌টে উপরে উঠছিলাম একদিন। ওঁরা ত্ব'জনে লাউঞ্জ আলো করে বসেছিলেন। মুখ কুঁচকে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "লাউঞ্জে বাঘ-ভালুক-হাতি-ঘোড়া মার্কা ছোকরাটিকে দেখেছো?" (বুইক গাড়ির মালিক যুবকটি সর্বদা কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের ছবিওয়ালা বুশশার্ট পরেন।) সায়েব আরও মুখ কুঞ্চিত করে বললেন, "ছেলেটি ভদ্রমহিলাকে দিদিমা না বলুক—সহজেই মাতৃস্থানীয়া কোনো সম্বোধন করতে পারে।"

ত্ব'জনের বয়সের অসমতা সত্যই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। তাঁদের প্রকাশ্য প্রেমালাপও প্রায়ই শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। সোফায় ত্ব'জনের মধ্যে দূরত্ব কমতে কমতে শূন্যে এসে ঠেকে।

ফিস-ফিস কথা চলে। ভদ্রমহিলা যেন ক্লান্ত হয়ে নিজের মাথাটি বুশশার্ট-পরা ছোকরাটির দিকে এগিয়ে দেন। তারপর কোন সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়ে অবিন্যস্ত বেশবাস ঠিক করে নেন। তারপর হাতে হাত দিয়ে দু'জনকে বার-এর দিকে যেতে দেখা যায়। আমার অশোভন কৌতূহল দমনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। সংযমের লাগাম প্রাণপণে টেনে রেখেও প্রতিবার দোতলায় যাবার পথে লাউঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাতের লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

"মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।" লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফটে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ বাধা পড়লো। সামনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তুমি বুঝতে ভুল করেছো, নিশ্চয়ই আমাকে নয়।"

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বললে, "আজ্ঞে আপনাকেই ডাকছেন।"

বাধ্য হয়েই লাউঞ্জে ফিরতে হলো। শকুন্তলার ছবির সামনে তিনি বসে আছেন। সামনে এসে দাঁড়ালাম। এতো নিকটে থেকে পূর্বে তাঁকে দেখিনি। দূর থেকে যাঁকে এতো উজ্জ্বল দেখায়, কাছে এসে তাঁকে কিন্তু বড়ো নিষ্প্রভ মনে হোলো। ডান হাতের আঙুলের বিশাল আংটি সমেত সিগারেটটা তিনি ছাইদানিতে ঝাড়লেন। আংটির লাল পাথর জ্বলজ্বল করে উঠলো।

সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি হানলেন ভদ্রমহিলা। সায়েবের নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁর কাছে কাজ করি কিনা। স্বরে অদ্ভুত মিষ্টতা। অনেক মহিলার মুখে ইংরেজি শুনেছি, কিন্তু স্বরের মধ্যে এমন সুরের উপস্থিতি সচরাচর কানে আসে না।

উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।"

"আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?"

বললাম, "না না, আপনার কোনো উপকারে লাগলে আনন্দিত হবো।"

সিগারেট ছাইদানে নিক্ষেপ করে ভদ্রমহিলা প্রথমে সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন এবং যথাসম্ভব আস্তে বললেন, "দেখুন,

আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনার সায়েবের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ প্রয়োজন। কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

সেদিন দেখা হওয়া কোনোক্রমে সম্ভব নয়। অন্য একটা কেসে সায়েব ব্যস্ত থাকবেন, তাই ওঁকে পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় সায়েবের ঘরে আসতে বললাম।

শর্টহ্যাণ্ডের খাতা নিয়ে সায়েবের পাশে বসে আছি আমি। সামনের চেয়ারে ভদ্রমহিলা। মেঝের দিকে ঘাড় নিচু করে তাকিয়ে রয়েছেন। বোধ করি লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। সায়েবের ঠোঁটে একটুকরো হাসি দেখতে পেলাম। প্রথম দর্শনে কোনো মক্কেলই সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে না। টেম্পল চেম্বারে এ-দৃশ্য তাঁকে বহুবার দেখতে হয়েছে।

যথারীতি অভিবাদন বিনিময়ের পর সায়েব বললেন, "দেখুন, ডাক্তার আর উকিলের কাছে রোগ গোপন করতে নেই।" তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আমার স্টেনোগ্রাফার। এঁর সামনে নিঃসঙ্কোচে আপনার বক্তব্য বলতে পারেন।"

"না-না, সে তো বটেই।" ঘরের চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আধো আধো স্বরে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন। "একেবারে গোড়া থেকে বলাই বোধ হয় ভালো।" তিনি আবার থামলেন।

"নিশ্চয়।"

"সে এক বিরাট কাহিনী…"

"তার আগে আপনার নাম বলুন, আমার স্টেনোগ্রাফার লিখে নেবে।"

"নাম? পরে হবে, আগে আমার কাহিনী…"

নোট বই-এর অনেকগুলি পাতা সেদিন ভরে গিয়েছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিলাম এক বেদনাবিধুর পঙ্কিল জীবনের ইতিবৃত্ত।

বলতে বলতে কখনো তাঁর গলা কেঁপে উঠলো, কখনো লজ্জায় দুটো হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরলেন। আবার

কখনো নিজের আবেগ সংযত রাখতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

ভারতবর্ষে নয় লেবাননের এক খ্রীস্টান পরিবারে মেরিয়ন স্টুয়ার্টের জন্ম। বাবাকে মনে পড়ে না। খুব ছোটোবেলায় তিনি মারা গিয়েছেন, মা-ই সব। মেয়েকে মানুষ করার জন্য মাকে রোজগার করতে নামতে হয়েছিল এবং বহুক্ষেত্রে যা হয়, সেই জীবিকা যা কোনো সমাজে কোনো সময়েই সম্মানজনক পরিগণিত হয়নি। কিন্তু মেয়েকে তিনি সে পথে আসতে দিতে চাননি। মেয়ে তাঁর দেখতে শুনতে খারাপ নন, তাই আশা ছিল ভালো জামাই নিশ্চয় জুটে যাবে এবং তিনি ঝাড়া হাত-পা হয়ে বাঁচবেন।

মেরিয়নের মা মেয়ের বর যোগাড়ের কাজ যতো সহজ মনে করেছিলেন, আসলে সেটি ততো সহজ নয়। মেয়ের সঙ্গে ঘোরবার, সিনেমা বা কাফেতে নিয়ে যাবার ছেলে ছোকরার অভাব হচ্ছিলো না। কিন্তু তাই বলে যে তাদের মধ্যে কেউ খামকা বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে, এমন সেন্টিমেণ্টাল লোক ওদেশে জন্মায়নি। মেয়ে এদিকে তেইশ ছাড়িয়ে চব্বিশে পা দিয়েছে। স্বজাতি পাত্রের আশা ত্যাগ করে মেরিয়নের মা শেষপর্যন্ত বাইরের পাত্র সন্ধান করতে মনস্থ করলেন।

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড নামে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর এক ছোকরাকে অবশেষে মেরিয়নের মা জামাই করতে পারলেন। বিয়ের পর বছরখানেক মন্দ কাটলো না। এ-শহর থেকে ও-শহর মেরিয়ন হাওয়ার্ড স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড আদর করে বলেন, "মেরী, আর্মিতে চাকরি নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরেছি, কিন্তু কোনো মেয়েই আমার চোখে রঙের পরশ লাগাতে পারলো না। পারবে কি করে? আমার বরাত যে বাঁধা রয়েছে লেবাননের এক ভারি দুষ্টু মেয়ের সঙ্গে।"

কপট রাগে মেরিয়ন মুখ ফিরিয়ে নেয়। "খুব হয়েছে, অমন করে আর নিজের দাম বাড়াতে হবে না। তোমার তুলনায় আমি যে কিছুই নই, তা আমার জানা আছে।" হাওয়ার্ডের পেশীবহুল হাতটিকে সে নিজের কাছে টেনে নিয়ে খেলা করে।

দিনগুলি বেশ কেটে যায়। স্বামীগরবে গরবিনী মেয়ের দিন

কি আর খারাপ কাটে? হাওয়ার্ডের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মেরিয়নের সদাই চিন্তা। চাকরদের উপর নির্ভর না করে স্বামীর অনেক কাজ সে নিজে করে।

হাওয়ার্ড বলে, "নিজে এতো পরিশ্রম করো কেন? আর একটা চাকর রাখো।"

"অনর্থক খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই," মেরিয়ন উত্তর দেয়।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দিন সেটা। সূর্য ডোবার কিছু আগে লনে বস ওরা ছ'জন চা খাচ্ছিলো। এমন সময় ক্যাপ্টেনের নামে এক টেলিগ্রাম হাজির। খাম ছিঁড়ে, টেলিগ্রামের উপর একবার দৃষ্টিপাত করে সেটা পকেটে মুড়ে রাখলো হাওয়ার্ড।

হাসির ফোয়ারায় বাধা পড়ে। ক্যাপ্টেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

"কি লিখেছে? নিশ্চয় দুঃসংবাদ।"

একরকম জোর করেই মেরিয়ন টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নেয়। বিলেতে বদলির হুকুম এসেছে।

"এ তো সুখবর। ইংলণ্ড কিন্তু আমার খুব ভালো লাগবে, তুমি দেখে নিও।" মেরিয়নের আনন্দ উছলে পড়ছিল।

কিন্তু হাওয়ার্ডের মুখ আরও কালো হয়ে উঠলো। উত্তর না দিয়েই ক্যাপ্টেন সায়েব চেয়ার ছেড়ে ভিতরে চলে গেল।

হাওয়ার্ডের দুশ্চিন্তার কারণ তখনো মেরিয়নের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও প্রকাশ হতে দেরি লাগলো না। মেরিয়নের পাসপোর্ট মিলবে না। আইনের চোখে সে বিবাহিতা স্ত্রী নয়! আসল মিসেস হাওয়ার্ড যে এক গণ্ডা ছেলেপুলে নিয়ে নটিংহামশায়ারে ঘরকন্না করছেন।

চমকে উঠেছিল মেরিয়ন। বিস্ময়ে হাওয়ার্ডের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও সে কোনো কথা বলতে পারেনি।

বন্ধুবান্ধবরা উপদেশ দিলেন—জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী শয়তানটাকে সহজে ছেড়ো না। ইংরেজদের আইনে এক স্ত্রী বর্তমানে আর এক বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ। বাছাধন ভেবেছে কি! ওকে জেলে পাঠাও, আর সঙ্গে-সঙ্গে আদালতে একটা ক্ষতিপূরণের মামলা লাগাও।

কিন্তু রাজী হলো না মেরিয়ন। যে ক্ষতি তার হয়েছে, তা কেউ পূরণ করতে পারবে না। কোর্টে গিয়ে কী হবে ?

মেরিয়নের জীবননাট্য থেকে ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড বিদায় নিলো। এখন আর ক্যাপ্টেনের স্ত্রী রূপে তার পরিচয় নেই ; অনেকে আড়ালে তাকে অমুক ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের প্রাক্তন "ইয়ে" বলে ডাকে !

এদিকে পেট চলা দায় হয়ে উঠেছে। লোকের ধারণা যে, বেশ কিছু হস্তগত না করে ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দেবার পাত্রী মেরিয়ন নয়। আসলে কিছুই নেয়নি সে। হাওয়ার্ডের অর্থ স্পর্শ করতে সে ঘৃণা বোধ করেছে।

বছরখানেক মেরিয়ন কিভাবে পয়সা রোজগার করেছিল আমাদের বলেনি। সায়েবও জিজ্ঞাসা করেনি। তবে সেটা আন্দাজ করতে খুব বড়োদরের কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

আন্তর্জাতিক বিয়ের বাজারের খবর রাখেন এমন একজন হিতৈষী বন্ধু শেষপর্যন্ত মেরিয়নকে ইণ্ডিয়াতে যেতে উপদেশ দিলেন। বললেন, ভাগ্য বিমুখ না হলে ওখানে কিছু যোগাড় করা শক্ত হবে না।

ভারতবর্ষের ভিসা সংগ্রহ করা নিতান্ত সহজ নয়, অন্ততঃ মেয়েদের পক্ষে। ভিসা দেবার আগে দেখা হয় কি ধরনের মেয়ে ; স্বামী বাহাল তবিয়ত কি না ; স্বামী অবর্তমানে জীবনধারণের সঙ্গতি আছে কি না। কিন্তু যে মেয়ের স্বামী বা সঙ্গতি কিছুই নেই ভিসা কর্তৃপক্ষ তাকে ভারতবর্ষে স্বাগতম জানাতে বিশেষ উৎসুক নন। তাঁদের ইচ্ছা থাকলেও কলকাতা, বোম্বাই বা দিল্লীর সিকিউরিটি পুলিস রাজী হন না। এই ধরনের মেয়েদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে তাঁদের হিমশিম খেতে হয়।

পাসপোর্ট আপিসের পর্বত ডিঙিয়ে, ভিসা আপিসের সাগর পেরিয়ে, মেরিয়ন কিভাবে শেষপর্যন্ত বোম্বাইতে এসে হাজির হলো, তা এখানে না বললেও চলবে। শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, বোম্বাইয়ের এই নতুন আগন্তুকটির নাম মেরিয়ন রইলো না, তার নতুন নাম আভা স্টুয়ার্ট। শহরের বিরাট জনারণ্যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অপরিচয়ের অকূল জলধিতে মনে হয় দেশত্যাগ অনুচিত হয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধ তখনও থামেনি। তাই দু'-এক রাত্রের অতিথিদের নিয়ে মিস আভা স্টুয়ার্ট এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, বিয়ে করে ঘরবাঁধার চিন্তার অবসর রইলো না।

কিছুদিন পরের কথা। পূর্বাঞ্চলের এক দেশীয় রাজ্যের নবাব বেম্বাইতে বেড়াতে এসেছেন। রাজরাজড়ারা কখনও একা আসেন না। পাত্র, মিত্র, অমাত্যের দল ছায়ার মতো তাঁদের অনুসরণ করেন।

তাজ হোটেলে এক ককটেল পার্টিতে নবাবের তরুণ এ. ডি. সি-র সঙ্গে আভার পরিচয় হলো। এ. ডি. সি. ভারি আমুদে মানুষ, তাই আলাপ জমতে বেশি সময় লাগেনি। নোটবুকে তিনি নতুন বান্ধবীর ঠিকানা লিখে নিলেন।

আভা স্টুয়ার্টের ঘরে তাঁর পদধূলি প্রায়ই পড়তে আরম্ভ করল। তরুণ এ. ডি. সি হৃদয় দিয়ে ফেললেন লেবাননের এই মেয়েটিকে। বয়সে আভা সামান্য বড়োই হবে, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? বাধা আছে, তবে অন্য ধরনের।

নিজের নখগুলোর দিকে সযত্ন নজর দিতে দিতে ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন একদিন বললেন, "আভা, আমরা যে মুসলমান। বাপ-পিতামহের ধর্ম ; তা ছাড়া মুসলমানের রাজ্যে চাকরী করি।"

"কী হয়েছে তাতে? পর্বত মহম্মদের কাছে এল না বলে মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবে না? তুমি আমার এতো আদরের, আর তোমার জন্য খ্রীস্টান থেকে মুসলমান হতে পারবো না?" আভা আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলো।

বোম্বাইয়ের এক মসজিদে আভা স্টুয়ার্টের নতুন নামকরণ কি হয়েছিল খাতায় লিখে রাখিনি। জেবউন্নিসা না মেহেরউন্নিসা, ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।

নবপরিণীতা বধূ নিয়ে এ. ডি. সি. নবাবের রাজধানীতে ফিরে এলেন। এ. ডি. সি.-র বাংলো একটি ছোটোখাটো প্রাসাদ, পরিপাটি করে সাজানো। মহীউদ্দীন মৃদু হেসে বললেন, "এই তোমার রাজত্ব বেগম-সায়েবা। এখানকার সর্বময় কর্তৃত্ব তোমার।"

নববধূর সলজ্জ হাসিতে মহীউদ্দীন ধন্য মনে করেন নিজেকে। নতুন পরিবেশ ভারি ভালো লাগছে আভার। ভালো লাগবে

না? এ যে তার নিজের সংসার। হোটেলের ভাড়া-করা ঘর নয় যে, ক'দিন আছি জানি না, নিজের মতো গুছিয়ে লাভ নেই।

সংসারে বিশেষ কিছু করবার নেই। সরকারী বেতনে চাকর আছে অনেক। পরিচর্যার জন্য তুজন দাসী সর্বদা মোতায়েন। তুপুরে খাওয়ার পর আভা মহীউদ্দীনের ছবির এলবামটা দেখতে বসে। নানা রাজকীয় উৎসবে এ. ডি. সি-র বেশে মহীউদ্দীন; তারও পূর্বের ছাত্রজীবনে মহীউদ্দীন—স্বামীর অজ্ঞাত অতীত জীবনের নিদর্শনগুলো আভার মনে পুলকের সঞ্চার করে। অপরাহ্নে স্নান সমাপন করে সে প্রসাধনে বসে। তারপর সযত্ন সজ্জিত তনুদেহটিকে আয়নার সামনে মেলে ধরে। কোনোদিন মহীউদ্দীন হঠাৎ এসে পড়লে অবাক হয়ে যান। মৃতু হেসে বলেন "শাড়ি তোমাদের দেশে চলে না, তবুও শাড়ি পড়লে কি সুন্দর দেখায় তোমাকে!"

কখনো বা বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে স্বামীর প্রতীক্ষায় আভা সময় গোনে। পাশের চেয়ার খালি। নবাবের প্রাসাদ থেকে মহীউদ্দীনের ফিরতে দেরী হয়। দূরের আকাশ একেবারে নির্মল, কোনো অজ্ঞাত শিল্পী যেন ছবি আঁকার আগে ক্যানভাসটা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রেখেছেন। সেই নির্মেঘ আকাশের পটে ক্রমশঃ তারা জেগে উঠতে থাকে। শিল্পী যেন একের পর এক তুলির আঁচড় টেনে যাচ্ছেন। নববধূর মনের পটেও চিন্তার তারারা এবার উঁকি দেয়। এক-আধটা নয়, অনেক অনেক চিন্তা। সাজানো-গোছানো নয়, এলোমেলো অবিন্যস্ত। লাইন বেঁধে মার্চ করা সৈন্যদলের মতো তারা আসে না, আসে দিবাবসানে ঘরমুখো একঝাঁক পাখির মতো। তু'দিন আগে যে পৃথিবীকে নিষ্ফল নিষ্করুণ মনে হয়েছে, আজ তার অন্য রূপ। জীবনে সে তুঃখ পেয়েছে সত্য। বিশ্বাসের বদলে প্রিয়তম হাওয়ার্ডের কাছে পেয়েছে প্রতারণা, সে-ও সত্য। কিন্তু, নববধূ ভাবে, ঘর ভেঙে ভগবান ঘর গড়েও দিলেন।

মহীউদ্দীন নিজের বিবাহের কথা নবাবকে জানাননি। আসলে জানাতে সাহস হয়নি। কিন্তু খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। নবাব এ. ডি. সি-কে ডেকে পাঠালেন।

"দেখো ক্যাপ্টেন সায়েব, বিয়ে যদি করলে খানদানী বংশ দেখে করলে না কেন?" নবাব মহীউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। "আমেরিকানদের একটা এঁটোকে বিয়ে করতে তোমার রুচিতে বাধলো না? যা হোক, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। খানদানী বংশের খুবসুরত জেনানার সঙ্গে তোমার সাদির ব্যবস্থা আমি নিজেই করে দেবো, ওই ডাইনী স্পাইকে তুমি বিদায় করো।"

মহীউদ্দীন নবাবকে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন—"আমার জেনানা স্পাই নয়, খুব ভালো মেয়ে, বিশ্বাস করুন।"

নবাব গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাকে বলা হয়নি। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটির স্টেট ছেড়ে যাবার আদেশপত্রে আজ সকালে আমি সই করেছি। যদি চাও, তোমার নামও তাতে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

বেচারা ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন গভীর আঘাত পেলেন। কিন্তু এ-জগতে সবাই অষ্টম এডওয়ার্ড বা তাঁর ভাবশিষ্য চারুদত্ত আধারকার নন। মহীউদ্দীন ভাবলেন, এক জেনানা গেলে আর এক জেনানা হবে! কিন্তু এক নোকরি হারালে, আর এক নোকরি এ জন্মে নাও মিলতে পারে।

বাড়ি ফিরে মহীউদ্দীন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "ডার্লিং মনটা ভালো নয়। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো, নবাব কিন্তু সব ভেঙে দিলেন।"

নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন মহীউদ্দীন। "অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিছুই হলো না।" ঢোক গিললেন তিনি। "কিন্তু ভেবে দেখলাম, নোকরি ছাড়া চলে না।"

একটু থেমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন মহীউদ্দীন। "ডার্লিং, যেখানেই থাকো, আমার দিল-এ শুকতারার মতো তুমি সর্বদা জেগে থাকবে।"

সেদিন রাত্রে মহীউদ্দীন স্টেশন পর্যন্ত আসতে সাহস করেননি। কিন্তু চাকর মারফত দুটো খাম পাঠিয়েছিলেন। একটাতে একখানি উকিলের চিঠি—

"মহাশয়া, এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার মক্কেল ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন খাঁ দু'জন গণ্যমান্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে

পবিত্র ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী তিনবার তালাক উচ্চারণ করিয়া আপনাকে তালাক দিয়াছেন। ইতি……"

অন্য খামে পঞ্চাশখানা দশটাকার নোট। সঙ্গে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা "পাথেয়রূপে পাঠালাম।"

এবার কেন্দ্র কলকাতা। লেবাননের একটি মেয়ে কলকাতায় এসে দাঁড়ালো। চোখে তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

কলকাতার জীবনের দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। হোটেলের লাউঞ্জে তাকে আমরা পূর্বেই দেখেছি।

বর্তমানে একটি বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। পানিপ্রার্থী আর কেউ নয়, ঐ জংলা বুশ-শার্টপরা ছোকরাটি। ছোকরার পরিচয় জানা ছিল না। কোনো ধনী ব্যবসায়ীর বিপথগামী পুত্র-সন্তান ভেবেছিলাম। জানলাম, উনি একটি বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজপুত্র। ধরুন, রাজ্যটির নাম চন্দ্রগড়।

"যুবরাজ আমাকে বিয়ে করতে চান," আভা থামলো। সলজ্জ-দৃষ্টি হেনে সে আবার বললো, "আমিও যুবরাজকে পেতে চাই।"

তার কথা কেমন বেসুরো মনে হলেও সে স্বরে ছিল অদম্য আত্মপ্রত্যয়। জীবনখেলায় বারবার যারা প্রবঞ্চিত ও পরাজিত হয়, বোধ করি ভগবান তাদেরই এমন মনোবল দিয়ে থাকেন।

এতোক্ষণ এক নিঃশ্বাসে শুনে যাচ্ছিলাম আভা স্টুয়ার্টের কাহিনী। সত্যি বলে বিশ্বাস হয় না। ভালো করে চেয়ে দেখলাম ওর মুখের দিকে। বাগদত্তাসুলভ নম্র আভা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত মুখটিতে। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য দর্শন দিচ্ছেন।

"আসছে শনিবার এক মিশন আমাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেবে। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমাদের বিয়ে।"

চোখ থেকে চশমা খুলে রাখতে রাখতে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কাছে আসবার উদ্দেশ্য কী এবার বলুন।"

"যুবরাজের বাবার এই বিয়েতে মত নেই। অবশ্য তিনি এখনও জানেন না যে, আসছে শনিবার আমাদের বিয়ে।

কাউকে আজকাল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু······ কিছুদিন পরে বাবার চাপে যুবরাজ যদি এই বিয়ে অস্বীকার করেন, তখন······। এখন থেকে তার জন্য কী করতে পারি? আর একটা কথা। যুবরাজ আমাকে খ্রীস্টান বলে জানেন। কিন্তু বর্তমানে আমি খ্রীস্টান না মুসলমান?" আভা স্টুয়ার্টের স্বর কি রকম বেসুরো শোনালো।

আইনজ্ঞের কাছে এগুলি এমন কিছু কঠিন প্রশ্ন নয়। সায়েব বললেন, "প্রথমতঃ বিয়ের পর মিশনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে ভুলবেন না। বিবাহ প্রমাণের জন্য ভবিষ্যতে সেটি হবে আপনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। আর আপনি যখন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছেন, তখন আসলে আপনি খ্রীস্টান না মুসলমান কিছু আসে যায় না। আপাতত এই আমার উপদেশ। ভবিষ্যতে নতুন কিছু ঘটলে আমার সাহায্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।"

আভা স্টুয়ার্ট বেড়িয়ে যাবার পরও সায়েব কিছুক্ষণ নির্বাক রইলেন। অভিজ্ঞতার দপ্তরখানায় যে নতুন ঘটনাটি জমা হলো সেটিকে খুব সম্ভব, মনের দপ্তরখানায় সাজিয়ে রাখছিলেন।

সামান্য হেসে আমার কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে তিনি বললেন, "আশ্চর্য লাগছে তোমার। তাই না?" একটু থেমে আবার বললেন, "তোমার জীবনের এই তো শুরু। চোখ আর কান ছটোকে একটু সজাগ রেখো, তুনিয়ার অনেক বিচিত্র পদার্থের দেখা পাবে।"

হ্যাঁ, না, কিছু না বলে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

"তোমাদের পরিবারে বিয়ের কয়েকদিন আগেই মেয়েকে নিয়ে নানান উৎসব পড়ে যায়। আমাদের দেশেও তাই"—কি যেন চিন্তা করতে করতে সায়েব বলে যাচ্ছিলেন। "মেয়ে তখন ভাবে কত ভাগ্যবতী সে, তাকে কেন্দ্র করেই যতো কিছু উৎসব। কিন্তু যে মেয়েকে নিজের বিয়ের যোগাড় নিজেকেই করতে হয়, আইনের পরামর্শ নিতে আমাদের কাছে ছুটে আসতে হয়, সে?"

পরের রবিবার বেশি কাজ থাকায় আমাকে হোটেলে আসতে হয়েছিল। ছুটির দিন সায়েব অন্য প্রকৃতির হয়ে যান। ব্যারিস্টারের কালো গাউনের ভিতর লুকানো সদা-হাস্যময়

রসিক মনটা রবিবার সুযোগ বুঝে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সেদিন যতো না কাজ তার অনেক বেশি গল্প হয়। ইংরেজের কাছে কাজ আর আড্ডার ভাসুর-ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক। সায়েব রসিকতা করে বলছিলেন, "ইংরেজ যেখানে আপিস খোলে, তার পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন ক্লাবের নামগন্ধ থাকে না। রবিবারে আমি কিন্তু পুরো ফরাসী। ওদের যে ঘরে আপিস, সেই ঘরেই আধখানা পর্দা টাঙিয়ে আড্ডা জমাবার ব্যবস্থা।"

বিকালে চা-এর টেবিলে সায়েব গল্প বলছিলেন, আমি শুনছিলাম। এমন সময় বেয়ারা হাতে স্লিপ দিয়ে জানালো, রানী মীরা আদিত্যনারায়ণ সায়েবের দর্শনপ্রার্থী।

এমন অদ্ভুত নাম কখনো শুনিনি। এদেশের মানুষ না হলেও ভারতীয় নামের কূট-কচালিতে সায়েব অভ্যস্ত। মুখুজ্যে কি ধরনের কুলীন, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর তফাত কোথায়, গোয়েল উপাধির উৎপত্তি সিন্ধুদেশ, না রাজপুতনায়, ইত্যাদি প্রশ্নে প্রয়োজন হলে ডজনখানেক ভটচার্যিকে তিনি কাবু করতে পারেন। তিনিও এই নামের কিছু বুঝতে পারছিলেন না।

সকল ঔৎসুক্য দূর করে যে মহিলাটি ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের যুবরাজপ্রিয়া। গেরুয়া রঙের সিল্কের শাড়ি তাঁর দেহকে বেষ্টন করে উঠেছে। সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের রেখা। এমন স্নিগ্ধ ও সৌম্যরূপে আভা স্টুয়ার্টকে কোনোদিন দেখিনি।

"মীরা নামটি আপনার কেমন লাগে?" চেয়ারে বসে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন।

"বেশ সুন্দর নাম।" সায়েব ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন।

"অনেক ভেবে এই নাম পছন্দ করেছি; আর আদিত্যনারায়ণ আমার স্বামীর বংশগত উপাধি।"

"মোস্ট ইন্টারেস্টিং।" সায়েব বেয়ারাকে আর একটা কাপ আনতে নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন কোনো খবর আছে নাকি রানী-সাহেবা?"

রানী নিস্তব্ধ রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের প্রশান্তি বিদায় নিলো। হঠাৎ রানীকে বেশ ক্লান্ত মনে হতে লাগলো।

চা-এর কাপ দূরে ঠেলে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "চিন্তায় আছি। আপনাকে বলেছিলাম, আমার শ্বশুর এই বিয়েতে মত দেননি। এখন তিনি আমাকে ইণ্ডিয়া থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করছেন। এখানকার সিকিউরিটি পুলিসকে তিনি……"

গম্ভীরভাবে সায়েব উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তাহলে চিন্তার ব্যাপার। সিকিউরিটি পুলিস ইচ্ছে করলে যে কোনো বিদেশীকে এখান থেকে বহিষ্কৃত করতে পারে।"

"তা হলে কী হবে? আপনিই এই বিদেশে আমার একমাত্র বন্ধু।" রানীর উদ্বেগকম্পিত কণ্ঠ থেমে গেল।

গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন সায়েব। এক অসহায় নারীকে সাহায্য করার জন্য আইনের অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। রানীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সায়েব আবার চিন্তামগ্ন হলেন।

একটু পরে তিনি বললেন, "না আইন আপনার দিকেই। আপনি এখন বিদেশিনী নন। ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করায় আপনিও একজন ভারতীয়। সুতরাং বিয়ের সার্টিফিকেটটা যতোক্ষণ আপনার কাছে আছে, বিশেষ ভয়ের কারণ নেই।"

আনন্দিত হলেন না রানী, বরং চমকে উঠলেন। শীতের সন্ধ্যায় তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিলো। সার্টিফিকেট নিয়েই যতো গোলমাল। মিশনের কর্তারা দু'দিক থেকে অর্থ উপার্জন করছেন। যুবরাজের বাবা তাঁদের টাকার লোভ দেখিয়েছেন, সার্টিফিকেট দিতে চাইছেন না তাঁরা।

রানী বললেন, "কাল সারাদিন সেখানে বসেছিলাম। কত অনুনয় বিনয় করলাম, কিছু হলো না। আর টাকা দেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যুবরাজের টাকা ফুরিয়ে এসেছে। আমার শ্বশুর সব সাহায্য, এমনকি মাসোহারা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন।"

একটু ইতস্তত করে রানী মীরা বললেন, "আমার কাছে সামান্য যা ছিল, তাই দিয়ে ক'দিন দু'জনের খরচ চালাচ্ছি।"

সায়েব বললেন, "কাল দুপুরের দিকে ওল্ড পোস্ট আপিস

স্ট্রীটে আমার চেম্বারে আসবেন। ইতিমধ্যে ভেবে দেখবো কী করা যেতে পারে।"

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে রানী মীরা সেদিনের মতো বিদায় নিলেন। রানীর যাত্রাপথে কতকক্ষণ চেয়েছিলাম জানি না, সায়েবের কথায় ফিরে তাকালাম। বেশ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে প্রায় সাতটা। কোন সকালে এসেছি, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু সমস্ত দেহ ও মন যেন ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

চশমাটা খাপে পুরে সায়েব আমাকে বললেন, "তোমাদের দেশের রূপকথার গল্পগুলো কেমন মনে হচ্ছে।" (আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্তুরের গল্প মাঝে মাঝে সায়েবকে বলেছি।) "রূপকথার রাজপুত্রই শুধু সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারে কুঁচবরণ রাজকন্যার খোঁজে বার হয়েছে। পথে নানা কষ্ট, কিন্তু রাজপুত্রের জীবনমরণ পণ। আজকের পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাজকন্যাই নদী, পাহাড়, বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে রাজপুত্রের সন্ধানে বেরিয়েছে।" সায়েব সামান্য হেসে অন্তঃসলিলা বেদনার প্রবাহ ঢাকবার চেষ্টা করলেন।

পরের দিন রানীর অপেক্ষায় চেম্বারে অনেকক্ষণ ছিলাম। কিন্তু তিনি এলেন না। সায়েব একটু চিন্তিত রইলেন।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, এক সপ্তাহ গেল। রানীর কোনো সংবাদ মিললো না। হোটেলের কর্মচারীরাও কোনো হদিশ দিতে পারলো না।

সায়েব সন্দেহ করলেন সিকিউরিটি পুলিশ রানীকে জোর করে দমদমের কোনো উড়োজাহাজে তুলে দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করেছে। এর আগেও দু'-একবার সিকিউরিটি পুলিসকে এইরকম করতে শুনেছেন তিনি।

কোনো খবর না পেলেও রানীর শেষ পরিণতি জানার অদম্য আগ্রহকে মন থেকে সহজে বিতাড়িত করতে পারিনি। কোনো কোনো অলস অবসরে তাঁর ম্লান ছবিখানি চোখের সামনে জেগে উঠেছে। পাষাণপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যা দুরন্ত রাক্ষসের চোখ এড়িয়ে দুর্গম গিরি-কান্তার, দুস্তর-মরু-পারাবারে রাজপুত্রের সন্ধান

করছেন। কিন্তু কোনো বেঙ্গমা-বেঙ্গমী তাঁকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে না।

এক-এক সময় মনে হয়েছে, আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে রানীর কোনো তফাত নেই। তাঁদের মতো রানীও কি স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে পারলে সুখী হতেন না? পরের মুহূর্তে অন্য রকম ভেবেছি। চোখের সামনে দেখেছি, রূপের পসরা সাজিয়ে রানী লাউঞ্জে বসে আছেন, অশোভনভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাচ্ছেন। তাঁর পায়ের সোনালী গ্রীসিয়ান জুতো পুরুষালী ঢঙে নাচছে। তবুও রানীর জীবন-নাটকের আকস্মিক পরিসমাপ্তিতে প্রকৃত দুঃখবোধ করেছি।

সময়ের স্রোতে স্মৃতিপটের সকল লিখন অস্পষ্ট হয়ে আসে। রানী মীরাকে আমিও ক্রমশঃ প্রায় বিস্মৃত হলাম। হাইকোর্টের ছায়ায় গড়া ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে প্রতিদিন জীবন-নাট্যের কত খেলা চলছে। স্যাকরার দোকানের ধুলো বাছলেও যেমন সোনা পাওয়া যায়, এখানকার এক-একটা ছোট্ট খুপরির দেওয়ালের ঝুল ঝাড়লেও বহু চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা এখানে, কত বিচিত্র সমস্যা তাদের। কেউ বিয়ে ভাঙতে, কেউ বিয়ে করতে চায়। কেউ নতুন জমিতে প্রাসাদ তুলতে, কেউ বা পয়সার অভাবে নিজের বাসস্থানটুকু বন্ধক রাখতে চায়।

এসবের মধ্যে রানীকে মনে রাখার সময় কোথায়?

কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা লেখা একটা চিঠি রানীকে আবার মনে করিয়ে দিলো। পড়া শেষ করে সায়েব চিঠিটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—

চন্দ্রগড়

প্রিয় মিস্টার '—'

এই চিঠি পেয়ে আপনি হয়তো অবাক হবেন। হয়তো এর আগে ভেবেছেন, আমি হঠাৎ কলকাতা

থেকে উবে গেলাম নাকি! কিন্তু বিশ্বাস করুন নানান ঝঞ্ঝাটে খবর দিয়ে আসতে পারিনি।

একটা কথা লিখতে বসে বার বার মনে জাগছে। আমি আর যাই হই, অকৃতজ্ঞ নই। সেদিন এক অসহায় মেয়েকে বিনা পারিশ্রমিকে আপনি যে সাহায্য করেছিলেন, কোনোদিন তা ভুলবো না।

আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পর ভেবে দেখলাম যুবরাজকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিলাম। ঠিক করলাম, আমার শ্বশুরের সঙ্গে সামনা-সামনি বোঝাপড়া করবো।

কী ভাবে এই চন্দ্রগড়ে এলাম, আমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করলাম, সে এক বিরাট কাহিনী। যদি কখনও সাক্ষাৎ হয় বলবো। আপাতত জেনে সুখী হবেন, হারেমে থাকবার অনুমতি পেয়েছি। যুবরাজের ছ' নম্বর স্ত্রী আমি। তাতে কিছু এসে যায় না। জীবনের শেষ ক'টা দিন এইভাবে একটু শান্তিতে কাটাতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবো। জীবনে কোনোদিন খারাপ পথে আসতে হবে বুঝতে পারিনি। আর সবার মতো স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করার ইচ্ছে আমারও ছিল। কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ। তাই পঁয়ত্রিশটা বছর ছন্নছাড়া হয়ে কেটে গেল।

হিমালয়ের বুকের মধ্যে এই চন্দ্রগড়রাজ্যে সভ্যতার হাওয়া এখনো পৌঁছয়নি। আজব দেশ। হারেমের আইন-কানুন আরও আজব। মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা। আমি অবশ্য লক্ষ্মী মেয়ের মতো নতুন পরিবেশে নিজেকে মানাবার চেষ্টা করছি।

না করেও উপায় নেই। গত রবিবারে আমার এক সতীনের সঙ্গে যুবরাজের কথা-কাটাকাটি হয়। পরের দিন থেকে তাকে আর দেখিনি। আমার পরিচারিকার মুখে শুনলাম, তার খবর আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না।

এখানে চিঠি লেখা একেবারে নিষিদ্ধ। এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার হাতে চিঠিটা ফেলতে পাঠাচ্ছি। সুতরাং উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন না।

ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে আমাদের আবার দেখা হবে।

ইতি—

চিরকৃতজ্ঞা

রানী মীরা আদিত্যনারায়ণ।

ব্যারিস্টার পাড়া থেকে বিদায় নেবার আগে বিভূতিদা একদিন আমাকে হাইকোর্টে নিয়ে গিয়েছিলেন। গেটে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বলছিলেন, "কেমন জব্বর বাড়িখান দেখছো তো? বাড়িটার অনেক হিস্ট্রি সায়েবের কাছে শুনেছিলাম। কোথাকার এক টাউন হল-এর অনুকরণে তৈরি, নামটা কিছুতেই মনে থাকে না।"

উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে আমরা প্রথমে দোতলায় গেলাম। কাঠের প্যানেল দেওয়া বড়ো বড়ো ঘর। প্রতি ঘরের বাইরে জজদের নাম লেখা! "মিস্টার জাস্টিস্ রণধীর সিংহ বাচাওয়াত, টেকিং ইণ্টারলকুটারি অ্যাফেয়ারস্।"

"এর মানে কি?"

বিভূতিদা পিছন ফিরে বললেন, "এখানে অনেক নতুন কথা শিখবে, একদিনে হবে না, সময় লাগবে।"

আমরা অন্য এক ঘরে ঢুকে পড়লাম। এখানে আবার দু'জন জজ। বিভূতিদা কানে কানে বললেন, "আপীল হচ্ছে। খুব সাবধান, কোনো আওয়াজ না হয়।"

কোর্টঘর দেখা শেষ করে বিভূতিদা আমাকে যেখানে নিয়ে গেলেন, সেখানে গাদা গাদা বই প্রায় মাথার ছাদ পর্যন্ত সাজানো। এক ভদ্রলোক হাতে কাগজ নিয়ে মই বেয়ে সরসর করে উপরে উঠে যাচ্ছেন। দেওয়াল থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে তিনি আবার ইঁদুরের মতো দ্রুতগতিতে নেমে

এসে অন্য আর এক জায়গায় মই লাগাচ্ছেন। "বার-লাইব্রেরী ব্যারিস্টারদের ক্লাব। এখান থেকে বই নিয়ে যেতে হবে মাঝে মাঝে," বিভূতিদা বলে দিলেন।

"আরও অনেক দেখবার আছে, কিন্তু সময় নেই। ষোলোবছর এ পাড়ায় কাটিয়েও সব জানতে পারিনি, তুমি একদিনে কী করবে?"

হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে, আমরা আবার বৃন্দাবনের লিফ্‌টে চড়ে টেম্পল চেম্বারের চারতলায় ফিরে এলাম।

ক'দিন পরে আমাকে আবার হাইকোর্টে যেতে হলো। এবার একা একা। বিভূতিদা নেই। বার-লাইব্রেরী থেকে বই আনতে হবে। সশঙ্কচিত্তে এই অপরিচিত জগতের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলাম। ব্যারিস্টারের বাবু হয়েও এখানকার কোনো আইন-কানুন আমার জানা নেই।

লাইব্রেরীর সামনে বারান্দায় পরপর সাজানো খানকয়েক বেঞ্চিতে আট দশজন লোক বসে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে উঠলেন,—"এই যে স্যার, এদিকে একটু দেখা দিয়ে যান না স্যার।"

সলজ্জভাবে বেঞ্চির কাছে এগিয়ে গেলাম। "আমাকে কিছু বলছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার," রোগামতো এক ভদ্রলোক মুখভর্তি পানের পিক সামলাতে সামলাতে বললেন। "মহাশয়ের পরিচয়, নিবাস ইত্যাদি জানতে পারি কি?"

পাশের এক ভদ্রলোক আমাকে সে যাত্রা রক্ষা করলেন। রোগামতো লোকটিকে ভৎর্সনা করে তিনি বলে উঠলেন, "আঃ অর্জুন, পেটে বোমা মারলেও তো 'ক' অক্ষর বেরোয় না। আর ছেলেমানুষটাকে নতুন পেয়ে বঙ্কিমী বাংলা চালাচ্ছো। ছি ছি।"

আমার পরিত্রাতার দিকে চেয়ে রইলাম। ভদ্রলোকের মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। গায়ে আধময়লা লঙ-ক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের নিউকাট জুতো, আর গলায় পাকানো একটা আধময়লা চাদর। খুব লম্বা টানের শেষে মুখের বিড়িটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে ঘষতে ঘষতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমিই বুঝি বিভূতির জায়গায়—সায়েবের নতুন বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"আমরাও তোমার মতো ব্যারিস্টারদের বাবু। কিন্তু তোমার কপাল ভালো। এখানকার ক'জন বাবু আর তোমার মতো আপিসে বসতে পায়। অমন নইলে সায়েব। বিভূতিকে বড়ো ভালোবাসতো। নিজে থেকে বিলিতী আপিসে মস্ত চাকরি করে দিলো।

তা এই যে ক'খানা বেঞ্চি দেখছো সবক'টি বাবুদের জন্যে রিজার্ভ। যখন ইচ্ছে হয় আসবে এবং এখানে বসে থাকবে।"

অন্য একজন কথার মধ্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-পাড়ায় ক'দিন হলো?"

"সাতদিন," আমি উত্তর দিলাম।

"এ্যাঁ, মাত্র সাতদিনের দুগ্ধপোষ্য শিশু! এখানকার হালচাল কিছুই জানা নেই নিশ্চয়। ছোকাদা, আপনি তো আমাদের ট্রেনর, একে ট্রেনিং দিয়ে দিন। নইলে কোন সময় বাবুদের প্রেস্টিজ ঢিলে করে ছেড়ে দেবে।"

ছোকাদা বললেন, "হ্যাঁ বাপু, মোস্ট্ ইম্পর্টেণ্ট কথাটা শুনে রাখো। উকিলের মুহুরীদের কোনো পাত্তা দেবে না। তুমি ব্যারিস্টারের বাবু—সিপাইকো ঘোড়া, হাতিকো দাঁত, আর ব্যারিস্টারকো বাবু। আমাদের সায়েবদের বিলেত থেকে পাশ দিয়ে আসতে হয়েছে, আর উকিলবাবুরা আজকাল ল' কলেজে রাত্রে ক্লাশ করে ব্যারিস্টারদের ডিঙিয়ে যেতে চান। এ যে বাপু জাম্পিং হর্স ইটিং গ্রাস।" আসলে ছোকাদা বলতে চাইলেন উকিলদের সঙ্গে ব্যারিস্টারদের যে তফাত, মুহুরী ও বাবুদের মধ্যে সেই একই পার্থক্য।

ছোকাদাকে থামিয়ে টাকমাথা এক ভদ্রলোক বললেন, "দেব্তাদের বাহন বোঝো? আমরাও সেই রকম। কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, মহাদেবের ষাঁড়, আর ব্যারিস্টারের বাবু, সব এক কেলাশের।"

পিছনের বেঞ্চি থেকে অন্য এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "দাদা, তোমাদের হাই হাই টক্ রাখো। মাইরি বলছি, মেজাজ একদম বিগড়ে রয়েছে। কলিফ্লাওয়ারের মতো এনিম্যাল যে হ্যাণ্ডিকাপে ডোবাবে, কেমন করে জানবো।"

ওই বেঞ্চিতে ঘোড়ার আলোচনা পুরোদমে চলছে। মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা কানে আসে—পুণা রেস্, গভর্নর জেনারেলস্ প্লেট হ্যাণ্ডিকাপ।

হাতে একটা ছাপানো কাগজ নিয়ে আর এক ভদ্রলোক বেঞ্চিতে এসে বসলেন। ঐ ছাপানো কাগজটি আমার জানা। বিভূতিদা বলে দিয়েছিলেন, "এর নাম ডেলি কজ্ লিস্ট। কোন কোর্টে কী মামলা ধরা হবে তার লিস্টি। রোজ সকালে এসে এই লিস্টি দেখবে, সায়েবের মামলা থাকলে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রাখবে।"

ভদ্রলোক ঠিক হয়ে বসার আগেই সমস্বরে সবাই জিজ্ঞাসা করে উঠলো,—

"এই যে দাদা, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "ছ' নম্বরে বাঁড়ুজ্যের কোর্ট ওয়াচ করছিলাম। সায়েব আবার মিত্তিরের কোর্টে রয়েছেন, সময়মতো খবর দিতে হবে। ব্যাটা এটর্নির আর কি, ব্রীফ দিয়ে তিনি ঘুম মারতে গেলেন। আর ছাই আমি তীর্থ-কাকের মতো কোর্টে হাঁ করে বসে থাকি।" কথা শেষ না করেই ভদ্রলোক আবার উঠলেন। "যাই, কেদারবাবুকে ধরিগে যাই। বই-এর লিস্টি তো অনেকক্ষণ দিয়ে এসেছি।" তারপর তিনি ব্যস্তভাবে বার-লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান কেদারবাবুর সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন।

"হারুটা আর বাক্‌তাল্লা মারার জায়গা পেলে না। বেটা আমাদের কাছেও রাজা-উজির মারছে।" ছোকাদা বললেন।

"যা বলেছো ছোকাদা," আর একজন ফোড়ন দিলে। "হারুটা তো হাজরা সাহেব বলতে অজ্ঞান। কিন্তু বাপু বিজয় হাজরা মাসে ক'টা অ্যাপিয়ার হচ্ছে, সে কি আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুটো ব্রীফ এক সঙ্গে হাতে থাকে কিনা সন্দেহ। তাতেই হারু ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।"

বার লাইব্রেরী থেকে গাউন হাতে একজন আমাদের বেঞ্চির কাছে এগিয়ে এসে ডাকলেন, "অর্জুন, এই ব্রীফটা সাণ্ডেল কোম্পানির রমেনবাবুকে দিয়ে এসো, আর বলে দিও আজ সাড়ে চারটায় কন্সাল্টেশন।"

অর্জুনবাবু ব্রীফ নিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। ছোকাদা

চিনিয়ে দিলেন, "ঘোষ সাহেব, কমার্সিয়াল ম্যাটারে ঝানু ব্যারিস্টার।"

ছোকাদা অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে একে-একে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ব্যানার্জী সাহেবের বাবু, চৌধুরী সাহেবের বাবু, যেন বাবুদের কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই। হারুবাবু, হারুবাবু নন, তাঁর ডাক নাম ও পরিচয়, 'হাজরা সাহেবের বাবু'।

একেবারে শেষ বেঞ্চিটা একটু নড়বড়ে। সেখানে যে চার-পাঁচজন লোক বসে আছেন, ছোকাদা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না। বললেন "ওরা এখনও জুনিয়র, আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারবার স্ট্যাণ্ডার্ডে আসেনি।"

"আজ্ঞে আমিও তো জুনিয়র," ছোকাদাকে বললাম।

জিব কেটে ছোকাদা বললেন, "ছি ছি, তুমি জুনিয়র নও। তুমি সীনিয়র।"

জুনিয়র সীনিয়র রহস্য বুঝতে আমার সময় লেগেছিল। সীনিয়র ব্যারিস্টারের বাবু আমি বয়সে যতোই জুনিয়র হই না কেন, বাবু সমাজে আমি সীনিয়র। অথচ জুনিয়র ব্যারিস্টারের বাবু বয়সে সীনিয়র হলেও সমাজে তিনি জুনিয়র।

ছোকাদার স্নেহ লাভ করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। সময় পেলেই চেম্বারে মোহনচাঁদকে রেখে ছোকাদার কাছে যাই। প্রতিমিনিটে কত নতুন কথা, কত নতুন খবর জানতে পারি। যেমন এটর্নিদের সঙ্গে বাবুদের সম্পর্ক।

বাবুরা সায়েবের ব্রীফের জন্য এটর্নিদের আপিসে যান। কখনও বা পথে দেখা হলে নমস্কার জানিয়ে বলেন, "এই যে স্যার, ভালো তো? একটু মনে রাখবেন।" আবার মামলার শেষে এটর্নি আপিসে হাজির হতে হয়। "স্যার, চেকটা হবে নাকি? সায়েব পাঠালেন।" এটর্নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দার্শনিকের হাসি হাসেন। বলেন, "আরে একটু নিঃশ্বাস ফেলতে দাও। ক'দিন যাক। মক্কেলের গলায় তো আর ছুরি লাগাতে পারি না। সবুরে মেওয়া ফলে, বুঝেছো ভজহরি?"

ভজহরি এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। এটর্নি মহাপাত্রের

হাতে জলই গলতে চায় না, তায় চেক! তবু যথাসম্ভব বিনয় প্রকাশ করে বলে, "আজ্ঞে সে কথা তো একশ'বার। তবে স্যার তিনমাস হলো। সব কিছু তো চালাতে হবে।"

মহাপাত্র যেন শুনতে পেলেন না এমনি ভাব করে টেলিফোন তুলে নম্বর চান। ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার আগে বলেন, "আচ্ছা ভাই ভজহরি, আবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে। তোমার সায়েবকে বলো।"

বিফলমনোরথ ভজহরি রাস্তায় বেরিয়ে আসে। দশ নম্বরের (দশ নম্বর ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীট, এ-পাড়ায় শুধু নম্বর ধরে কথাবার্তা হয়) দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে একটা বিড়ি ধরায়। সায়েব রেগে যাবেন। বিশ্বাস করবেন না, বলবেন—'তুমি ভালো করে বলতে পারো না। মহাপাত্র নিজে আমাকে বলেছে বাবুকে পাঠালেই চেক দিয়ে দেবে।'

"সবই কপাল," ছোকাদা আমাকে বলছিলেন। "ওই মহাপাত্রই পাঁচুবাবুকে নিজে এসে চেক দিয়ে যায়। ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ের বাবু যে! চেক আসতে একদিন দেরি হলে পাঁচু পরের বার হটিয়ে দেবে। সুব্রত রায় তো আর ব্রীফের তোয়াক্কা করেন না।"

ছোকাদার পাশে বসে বাবুদের কর্ম-তালিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু ধীরে ধীরে জেনেছি। সায়েবের জন্য সব কিছু করেন তাঁরা। ব্রীফ নিয়ে সায়েবের পিছনে পিছনে ছোটেন, বার-লাইব্রেরী থেকে সায়েবের জন্য বই নিয়ে আসেন। সি-ডবলু-এন, অল-ই-আর এ-আই-আর ইত্যাদি শব্দ প্রথমে আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। বাবুরা কিন্তু এসব জানেন। ১৯৩৬-এর অল-ই-আর বললেই বাবু জিজ্ঞাসা করবেন, ভল্যুম এক না দুই স্যার? চিনির বলদ বলতে পারেন! মোটা মোটা বই তাঁরা বয়ে নিয়ে যান, আবার ফেরত আনেন। সায়েবের নির্দেশ মতো এক-একটি বিশেষ পাতায় একটু করে কাগজ গুজে রাখেন। সায়েবরা একের পর এক সেগুলো দেখে মামলা তৈরি করেন; আইনের নতুন ব্যাখ্যা সৃষ্টি হয় বা বিশেষ কোনো ধারা বাতিল হয়ে যায়। বাবুরা অতোশত বোঝেন না। ছোকাদা বলেন, "আমরা জীঞ্জার

মার্চেণ্ট জাহাজের খোঁজ নিয়ে কী করবো ? আমরা শুধু দেখবো এটর্নি কে, ক'দিন হিয়ারিং হবে, ক'-মোহর মিলবে।"

মোহর ? অনেকে অবাক হতে পারেন। মোহর আবার কি ? এ কি আলিবাবার দেশ যে, মোহর দিয়ে কেনা-বেচা হয় ? সবিনয়ে বলবো, হাইকোর্টে সব কিছু হিসেব হয় মোহর দিয়ে। ব্যারিস্টারের ফীও মোহর হিসেবে দিতে হবে। একজন নতুন মক্কেল রেগে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মশায় মোহর পাবো কোথায় ? আপনার সায়েবের জন্য তো আর টাঁকশালের কর্তারা টাকা তৈরি ছেড়ে মোহর তৈরি করতে বসবেন না।

তাঁকে অনেক কষ্টে বোঝালাম—"আজ্ঞে সে আমিও জানি। আমরা শুধু হিসেব করি সোনার মোহরে, নেবার বেলায় নিই রূপো কিংবা কাগজের টাকা। সতেরো টাকায় এক মোহর। সায়েব তিরিশ মোহর চেয়েছেন। সুতরাং তিরিশকে সতেরো দিয়ে গুণ করে যা হয়, অর্থাৎ পাঁচশ' দশটাকা দিলেই চলবে।"

মোহরের কথা শুনে ছোকাদা হেসেছিলেন। "এ-পাড়ায় প্রথম এসে আমরাই কত আবোল-তাবোল বকেছি, ভাবলে হাসি লাগে। কিন্তু সে-সব কথা থাক," ছোকাদা থেমে গেলেন। নিজের মনে বিড়বিড় করে তিনি বলছিলেন, "কত ব্যারিস্টার এ-পাড়ায় এল গেল। কত বাবুকেও তো দেখলাম।"

"হাইকোর্টে কতদিন আছেন ছোকাদা ?"

"অনেকদিন হয়েছে। তখন তোমরা জন্মাওনি, বুঝেছো হে।"

স্মৃতির রোমন্থন ছোকাদার ভালো লাগে। বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে তিনি বললেন, "ওহে ছোকরা, ব্যারিস্টারের বাবু হওয়া সহজ নয়। এর জন্য সময় লাগে, বুদ্ধি লাগে, আর লাগে কপাল। বুঝেছো ?

বুঝতে না পেড়ে ছোকাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। ছোকাদার তখন বলার নেশা ধরেছে। বললেন, "বোঝা কি এতই সহজ ! এতোদিন ধরে চেষ্টা করে আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না।" ছোকাদা আরম্ভ করলেন।

ছোকাদার তখন বছর পনেরো বয়স। ছ'-নম্বরের চোংদার

কোম্পানি বড়ো সলিসিটর, সেই আপিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক দাশুবাবু তাঁর মামা।

কাসুন্দেতে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে দাশুবাবু ভাগনেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন ক্লাশ হচ্ছে ?"

"আজ্ঞে ফোর্থ ক্লাশ।"

"লেখাপড়া শিখে তো বাপ-মাকে রাজা করবে। তার থেকে চলো হাইকোর্টে, কোনো সায়েবের বাবু করে দেবো। দু'হাতে কাঁচা পয়সা। তিনটে পাশ দিয়েও অতো পয়সা রোজগার করতে পারবে না। শুধু একটু কপাল জোর চাই। আর কিছু না। ব্যারিস্টার সেনের একজন বাবু দরকার।"

ডিসেম্বরের গোড়া। গায়ে সবুজ রঙের র‍্যাপার চড়িয়ে পনেরো বছরের ছেলে কানাই ঘোষ ব্যারিস্টার দেখতে এল। সে কি জিনিস! কাসুন্দের লোকেরা বললে, "এ যে-সে ছেলে নয়, বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টারের সঙ্গে দিন-রাত কাজ করবে। মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের কানাই গড়গড় করে ইংরিজী বলবে।"

সেন সায়েবের সঙ্গে দেখা হলো। প্রথম দৃষ্টিতে ছোকাদা অবাক, এই ব্যারিস্টার! মিষ্টার সেনের মুখে পাইপ। বয়স খুব কম। ঠিক যেন লাল টুকটুকে আপেল। এ ছেলে যাদের জামাই হবে……!

সেন সাহেব বিলেত থেকে নতুন এসেছেন। কিন্তু বাঙলাতেই কথা বললেন। কাজ হয়ে গেল। হবার কারণও আছে। চোংদার কোম্পানির ম্যানেজিং ক্লার্ক দাশুবাবুর ভাগনে! দাশুবাবু নিজে কথা দিয়েছেন জুনিয়র ব্রীফ কিছুকিছু পাঠাবেন।

"বাবুদের জীবন অনেকটা জুয়ার মতো। সায়েব যদি উন্নতি করলেন, প্র্যাকটিশ জমালেন, তাহলে বাবুরও দু'পয়সা হবে। চাই কি, কলকাতায় খানকয়েক বাড়িও উঠতে পারে। এটর্নিরা খাতির করবে, দেখা হলে হাত তুলে নমস্কার করবে। কিন্তু কপাল মন্দ হলে সায়েব বার-লাইব্রেরীর টেবিলে মাথা রেখে ঢুলবেন, আর তাঁর বাবু বাইরের বেঞ্চিতে ঝিমুতে-ঝিমুতে পাশের লোকের কাছে বিড়ি চেয়ে খাবে।" ছোকাদা বলে যাচ্ছিলেন।

ব্যারিস্টার সেনের সঙ্গে ছোকাদারও সাধনা শুরু হলো। নতুন

ব্যারিস্টার। এখন তো বেশ কিছুদিন জুনিয়রি করো, এটর্নিদের মন রেখে চলো, সীনিয়রের বাড়ি ডাক পড়লেই হাজির হও। সীনিয়র ব্যস্ত লোক, বেশি কথা বলার সময় নেই। তিনি বলবেন, এই পয়েন্টে যতো মামলা হয়েছে, তার তালিকা প্রস্তুত করো। রাত জেগে সেন সাহেব মামলার লিস্টি তৈরি করে যান। সীনিয়রের মন জয় করতে হবে, তাঁর নজরে পড়তে হবে। এমনি পরিশ্রম করতে করতে যদি ভাগ্যলক্ষ্মী কোনোদিন সদয়া হন।

কাসুন্দের কানাইলাল ঘোষ সলজ্জ নয়নে ও সভয়ে অন্য বাবুদের পাশে এই বেঞ্চিগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। বসতে সাহস হয় না, বড়ো বড়ো ব্যারিস্টারের বাবুরা গম্ভীরভাবে আসেন বসেন। সেন সাহেবের মতো জুনিয়র ব্যারিস্টারের বাবুর সঙ্গে তাঁরা কথাও বলেন না। হাইকোর্টের বড়ো বড়ো ব্যাপার সে কী বুঝবে, এমন একটা ভাব।

বনোয়ারীবাবুকে মনে পড়ছে। কি সুন্দর তাঁর চেহারা, ঠিক যেন বনেদী জমিদার বংশের ছেলে। লাল টুকটুকে রঙ, গাল ছুটো যেন রক্তের চাপে ফেটে পড়বে। তাঁর পরনের আদ্দির পাঞ্জাবি এতো ফিনফিনে যে, ভিতরে গেঞ্জি পর্যন্ত দেখা যায়। পাঞ্জাবির হাতা গিলে করা, তার ভিতর থেকে সোনা দিয়ে মোড়া অষ্টধাতুর তাবিজ মাঝে-মাঝে উঁকি দেয়। পরিধানে জড়িপাড় ফরাসডাঙার নম্বরী ধুতি, পায়ে লাল পাম্পশু, গলায় পাকানো সাদা উড়ুনি। রোজ ধোপভাঙা পাঞ্জাবি পরেন বনোয়ারীবাবু। কথা কইবার সময় নেই তাঁর। কত লোক তাঁর কাছে আসে। কত কাজ তাঁর।

বেঞ্চিতে বসে বনোয়ারীবাবু পকেট থেকে এক বিরাট রূপোর ডিবে বার করেন। মৃদু চাপে খুট্ করে ডিবের মুখ খুলে এক জোড়া পান তিনি মুখে পুরে দেন। ডিবের আর এক কোণ থেকে সামান্য একটু চুন আঙুলের ডগায় লাগিয়ে তিনি যখন জিবে ঠেকান, তখন তাঁর তিন আঙুলের তিনটে পাথর-বসানো আঙটি চোখ ঝলসে দেয়। পানের খুশবাই চারিদিক আমোদিত করে তোলে।

আর ওই যে রূপোর ডিবে, ওটি যে-সে জিনিস নয়! খোদ হ্যামিল্টনের বাড়ির তৈরি। হ্যামিল্টন কোম্পানি—যারা লাট

সায়েবের বৌদের গহনা তৈরি করে। রূপোর ডিবের উপর বাঁকা বাঁকা ইংরিজী অক্ষরে লেখা—বনোয়ারী। চিৎপুরের মল্লিকরা মস্ত জমিদার। তাঁদের মেজো তরফের চুনীবাবু সেবারে পার্টিশন স্যুটে জিতে বনোয়ারীবাবুকে এই পানের ডিবে উপহার দিয়েছিলেন।

বনোয়ারীবাবুর সায়েবের পসার সবচেয়ে বেশি। অসংখ্য মামলা তাঁর হাতে। এটর্নিরা এসে ধরেন, "এই যে বনোয়ারীবাবু, সায়েবকে একটা ব্রীফ পাঠাবো, একটু দেখবেন।" বনোয়ারীবাবু, গম্ভীরভাবে বলে দেন, "না না মশায়, সায়েবের কড়া হুকুম, আর ব্রীফ নিতে পারবো না। কাজের চাপে সায়েবের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।"

এটর্নি হেসে বলেন, "না না, চিন্তার কিছু নেই। শুধু ব্রীফটা দিয়ে যাবো। কেস হিয়ারিং-এ আসতে অনেক দেরি।" বনোয়ারীবাবু তবু অবিচলিত। এটর্নির মুখের দিকে না তাকিয়ে তিনি বলে দেন, "পরে আসবেন, ভেবে দেখবো।"

অন্য বাবুরা অবাক হয়ে দেখে। ব্রীফ নিয়ে এটর্নি এলে তারা কত আদর আপ্যায়ন করে। ব্রীফের জন্য এটর্নি বাড়িতে ধন্না দিয়েও কিছু হয় না। এটর্নিরা মুখ বেঁকিয়ে বলেন, পরে দেখা যাবে। আর বনোয়ারীবাবু এটর্নিদেরই ফিরিয়ে দেন!

বনোয়ারীবাবু বলেন, "আমি তো নেহাত ভালো লোক। এটর্নিদের সঙ্গে যতোটা নম্র হওয়া সম্ভব ততোটা হই। তোমরা তো কারসন সায়েবের গল্প জানো না।"

অন্য বাবুরা উৎকর্ণ হয়ে বনোয়ারীবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন—"আপনার সায়েব বলেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ-গো হ্যাঁ," বনোয়ারীবাবু গলার চাদরটা ঠিক করে নিলেন।

"স্যর এডওয়ার্ড কারসন, মস্ত ব্যারিস্টার। তার ফীও তেমনি। ষাট মোহর শুনলেই তো এখানে এটর্নিদের চোখ বেরিয়ে আসার যোগাড়। আর কারসন সায়েব পাঁচশ মোহর হরবখত নেন। একবার এক এটর্নি এসে তাঁকে ধরলো একটা কেস-এ ফী কমাতে হবে। কারসন সায়েব রাজী নন, এটর্নি তবুও নাছোড়বান্দা। কারসন হঠাৎ এটর্নির হাত ধরে বার-লাইব্রেরীর কাছে নিয়ে

গেলেন। লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ-ষাটজন ব্যারিস্টার বসে আছেন। কারসন জিজ্ঞাসা করলেন, "এঁদের দেখতে পাচ্ছেন?"

এটর্নি বললো, "হ্যাঁ।"

কারসন গম্ভীরভাবে বললেন, "এঁদের কাউকে কেসটা দিন অর্ধেক ফী-তে হবে।"

এটর্নি হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, "আজ্ঞে না, আপনাকেই আমি ব্রীফ দিতে চাই।"

কারসন আরও গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, আপনি যদি এতোই বোকা হন, তা হলে আমার পুরো ফী-ই দিতে হবে।"

বনোয়ারীবাবুর সায়েবকে ছোকাদা অবাক হয়ে দেখতেন। দীর্ঘ দেহ, মোটা চশমার আড়ালে ছুটি চিন্তামগ্ন চোখ, মাথায় এক থোক সাদা ও পাকা চুলের বিচিত্র সংমিশ্রণ। পিছনের চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। গায়ে গোলাপী রঙের আভা, সমস্ত শরীরে তীক্ষ্ণতার ছাপ। অথচ কী শান্ত, কী সৌম্য রূপ। অমন শরীরে কালো রঙের কোট ভারি ভালো লাগতো ছোকাদার।

বনোয়ারীবাবু ছায়ার মতো তাঁর সায়েবকে অনুসরণ করেন। যেখানে সায়েব সেখানেই বনোয়ারীবাবু। সকালবেলায় সায়েবকে বার-লাইব্রেরীতে বসিয়ে এসেই তিনি হাঁক ছাড়েন, "ওরে কোথায় গেলি সব।" একটু পরে দেখা যায়, সামনে চলেছেন বনোয়ারীবাবু, পিছনে গোটাকয়েক চাপরাসী, কাঁধে তাদের বই-এর পাহাড়। লিস্টি দেখে সেগুলো পর পর কোর্টের টেবিলে সাজিয়ে রাখেন তিনি; ছোটোছোটো কাগজের স্লিপ ঢুকিয়ে দেন এক-এক পাতায়। কিছু পরেই বনোয়ারীবাবুর সায়েব বার-লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে আসেন, তারপর ধীরপদক্ষেপে কোর্টরুমের দিকে এগিয়ে যান। বনোয়ারীবাবু ছুটে এসে সায়েবকে আজানুলম্বিত কালো গাউনটা পরিয়ে দেন।

সুন্দর ইংরেজি বলেন বনোয়ারীবাবুর সায়েব। ছোকাদা তার কিছুই বোঝেন না, তবু খুব ভালো লাগে তাঁর ইংরেজি শুনতে। জজরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বনোয়ারীবাবুর সায়েবের বক্তৃতা শুনছেন। তাঁর ছুটো চশমা। একটা চশমা টেবিলে, আর একটা চোখে। মাঝে-মাঝে এক চশমা খুলে অপর চশমা চোখে লাগিয়ে তিনি

সামনে বই-এর সারি থেকে একটা মোটা বই টেনে নেন। ফর ফর করে পাতা উল্টিয়ে যেখানে বনোয়ারীবাবুর স্লিপ লাগানো সেই পাতা থেকে তিনি গড়গড় করে পড়তে শুরু করেন। পর মুহূর্তেই চশমাটা নামিয়ে টেবিল থেকে অন্য চশমা তুলে নেন। জজ সায়েবের দিকে তাকিয়ে হাত-মুখ নেড়ে ইংরেজীতে তিনি কি সব বলেন, ছোকাদা বুঝতে পারেন না। তবুও শুনতে ভালো লাগে। একটা শব্দ বারবার কানে আসতো—'ওয়েলমেলুড্', 'ওয়েলমেলুড্'। সেদিন ছোকাদা বারবার শুনেও তার অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। পরে আসল কথাটি জেনে নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসেছেন। চল্লিশ বছরে লক্ষ-লক্ষবার তাঁর কানে এসেছে, 'ওয়েল মাই লর্ড'।

বনোয়ারীবাবুর সায়েব এক কোর্টে বেশিক্ষণ থাকেন না। বক্তৃতা শেষ করে হাতের ব্রীফে কি সব লেখেন। লেখা শেষ করে কালো রঙের গাউন বাঁ হাতে জড়িয়ে তিনি অন্য কোর্টের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে বনোয়ারীবাবু আর এক গাদা মোটা-মোটা বই সাজিয়ে রেখেছেন। ছোটোছোটো কাগজের টুকরোগুলো বই-এর ভিতর থেকে উঁকি মারছে। আবার সেই দৃশ্য শুরু হয়। বনোয়ারীবাবুর সায়েব এক চশমা খুলে অন্য চশমা পরতে থাকেন।

এই অবসরে বনোয়ারীবাবু বাবুদের বেঞ্চিতে চলে আসেন। সবাই আগ্রহে তাঁর বসবার জায়গা করে দেয়। পকেট থেকে হ্যামিল্টনের বাড়ির রূপোর ডিবে যথারীতি বার হয়, তিনি এক সঙ্গে দুটো পান মুখে পুরে দেন। চারিদিকে খুশবাই ছড়িয়ে পড়ে।

বনোয়ারীবাবু আর তাঁর সায়েবকে নিয়ে নানান গল্প হয়। কেউ বলে, "ওঁর সায়েবের রোজগার কুড়ি হাজার টাকা।" আর একজন বলে, "কুড়ি হাজার টাকা ওঁর হাতের ময়লা; শুধু অর-ডিগনাম কোম্পানি মাসে কুড়ি হাজার টাকা দেয়। নিদেন পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার।" কাসুন্দের কানাই ঘোষ অবাক হয়ে যায়। মাসে কুড়ি হাজার টাকা, তাও কিনা হাতের ময়লা। মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা !

এই বনোয়ারীবাবু পনেরো বছরের কানাই ঘোষকে দেখে বলেছিলেন, "দুগ্ধপোষ্য ছোকরাটি কে আনলো ?"

বনোয়ারীবাবু কানাই ঘোষকে 'ছোকরা' বলে ডাকতেন।

দেখাদেখি অন্য বাবুরাও ওই নামে ডাকা শুরু করলো। কাসুন্দের কানাই ঘোষ ক্রমশঃ সবার ছোকাবাবু হয়ে দাঁড়ালো। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে এবং কোন্ ফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে ছোকাবাবু ছোকাদাতে পরিণত হয়েছে।

বনোয়ারীবাবুকে ছোকাদা ভয় করতেন। বনোয়ারীবাবু বেঞ্চিতে বসলে তিনি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতেন, বসতে সাহস হতো না।

ছোকাদা মনে-মনে স্বপ্ন দেখেন, তিনিও বনোয়ারীবাবুর মতো হয়েছেন। এটর্নিরা বলছে, "এই যে ছোকাবাবু, সেন সাহেবকে একটা ব্রীফ পাঠাচ্ছি।" ছোকাদা নিস্পৃহভাবে রূপোর ডিবে থেকে পান বার করে খেতে-খেতে বলছেন, "না না এখন ব্রীফ নিতে পারবো না। সাহেব ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।"

সেন সায়েব এক কোর্টে কেস শেষ করে অন্য কোর্টে যাচ্ছেন। একটুও অবসর নেই। দিন-রাত শুধু কাজ আর কাজ।

ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনায় ছোকাদার প্রতি লোমকূপ সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু কল্পনার স্বর্গ হতে ছোকাদাকে আবার বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। তখন বনোয়ারীবাবুর ভাগ্যে হিংসা হয়।

কিন্তু বনোয়ারীবাবুর ভাগ্যে যে এই পরিণতি ছিল তা কে জানতো?

অন্যদিনের মতো বনোয়ারীবাবু সেদিনও সকালে বেঞ্চিতে বসে হ্যামিণ্টনের বাড়ির রূপোর ডিবে থেকে পান বার করে খেলেন, চারিদিকে খুশবাই ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর সায়েব এখনও আসেননি। মামলা রয়েছে। মস্ত বড়ো মামলা—কুমার সত্যনারায়ণ সিংহ মহাপাত্র ভারসেস রাজমাতা অশ্রুলতা। অনেক বই লাগবে। গত কাল বাড়ি ফেরার আগে সায়েব লিস্টি দিয়ে গিয়েছেন। সমস্ত বই-এ স্লিপ লাগিয়ে কোর্টে রেখে এসেছেন বনোয়ারীবাবু; চল্লিশখানা মোটা মোটা বই। সায়েব এসেই যুদ্ধ শুরু করবেন। বইগুলো আসলে বই নয়, আইনযুদ্ধের গোলাগুলী। বনোয়ারীবাবুর সায়েব চশমা পরে এক-একটা বই থেকে গড়-গড় করে পড়ে যাবেন; রাজমাতা অশ্রুলতার স্বপক্ষে প্রতিটি নজির জজের সামনে অকাট্য হয়ে ফুটে উঠবে।

রাজমাতা অশ্রুলতা মোটরে বসে আছেন, চীনে কোটপরা তাঁর এস্টেট ম্যানেজার বনোয়ারীবাবুকে বলে গেলেন।

"এই যে বনোয়ারী সব ভালো তো ?" ছু' তিনজন এটর্নি কোর্টে যাবার পথে তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে গেলেন।

বনোয়ারীবাবু ডিবে থেকে আবার পান বার করলেন। কিন্তু সায়েব আসছেন না কেন ? এতো দেরি তো হয় না। এমন সময় বার-লাইব্রেরী থেকে ছু'-একজন ব্যারিস্টার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

টেলিফোনে খবর এসেছে। ভয়ঙ্কর খবর। সেকথা ভাবলে আজও ছোকাদার বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। বনোয়ারীবাবুর সায়েব আর নেই। হার্টফেল, বেলা সাড়ে দশটায়। দাবাগ্নির মতো খবর ছড়িয়ে পড়েছে, এতো বড়ো ব্যারিস্টারের আকস্মিক মৃত্যু।

সেই দৃশ্য ছোকাদা আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। বনোয়ারীবাবুর বিশাল দেহটা কয়েক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলো, ম্যালেরিয়া জ্বর আসার আগে রোগীর যেমন হয়। তিনি হঠাৎ গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে। মেঝের ধুলোয় তাঁর গিলেকরা পাঞ্জাবি লুটোতে লাগলো। সবাই ছুটে এল। বনোয়ারীবাবু সংজ্ঞাহীন।

ছোকাদা এই পর্যন্ত বলে থামলেন। অনেকদিন গিয়েছে, কিন্তু আজও ছোকাদা সে-আঘাত যেন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বেঞ্চির সামনে মেঝের দিকে তাকিয়ে ছোকাদা কি যেন খুঁজছেন। ঠিক যেখানে পোড়া-বিড়ির টুকরোগুলো পড়ে রয়েছে, ওই জায়গায় বনোয়ারীবাবুর ধূলিলুণ্ঠিত দেহের চারিদিকে অগণিত লোক একদিন ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল।

"বনোয়ারীবাবুর তখনকার অবস্থা কেমন জানিস ? রাজা মরলে রাণীর যেমন হয়। রাজার অবর্তমানে রাণীকে কে চিনবে ? সোনার সিংহাসনে আর স্থান হবে না রাণীর।"

ছোকাদার উপমায় সূক্ষ্ম রসবোধ কিছু নেই নিশ্চয়। কিন্তু বহু চিন্তা করেও তার থেকে ভালো উপমা আজও খুঁজে পাইনি।

বনোয়ারীবাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটা কোনোক্রমে গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ি পাঠানো হলো। বিদায় বনোয়ারীবাবু, বিদায়। কাল থেকে হাইকোর্টে কে তোমায় চিনবে ? কোন্ এটর্নি বলবে, 'ব্রীফ পাঠাচ্ছি,

দেখবেন।' কোন্ বাবু ব্যস্ত হয়ে তোমার জন্যে বেঞ্চিতে জায়গা করে দেবে?

"সেদিন আমার মনে কিরকম ভয় হলো। শুধু মনে হতে লাগলো, সেন সাহেবও যদি……। ছোকাদা দোতলা থেকে উঠোনের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। ফেলে আসা জীবনের বেদনা আজও যেন তাঁকে কাঁটার মতো বিদ্ধ করছে।

সেদিনের কিশোর কানাই ঘোষ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে বনোয়ারীবাবুর সায়েব আর ফিরবেন না। তার মাথাটা যেন ঘুরছে। এক ভাঁড় গরম চা খেয়েও কিছু উন্নতি হলো না। যেদিকে তাকায় শুধু বনোয়ারীবাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কিশোর ছেলেটি আর বসে থাকতে পারলো না। নিজের অজান্তেই এক সময়ে সে বার-লাইব্রেরীর ভিতর ঢুকে পড়েছে। দূরে সেন সাহেব একমনে বই পড়ছেন। মোটা ফ্রেমের চশমায় সেন সাহেবকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর নিজের সেন সাহেব, বয়স খুব কম। এখনও অনেকদিন কাজ করবেন। তবু মন প্রবোধ মানে না। সে আরও কাছে এগিয়ে যায়।

তারপরের কথা ভাবতে ছোকাদার আজও লজ্জা হয়। সেন সাহেবের ঘাড়ে নীলাভ ছুটি শিরা দপদপ করছে। ছোকাদার হাত নিজের অজান্তে সেন সাহেবের দেহ স্পর্শ করেছে। না ভয় নেই, উষ্ণ রক্ত সেন সাহেবের ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে। সেন সাহেব চমকে উঠে পিছনে তাকালেন। "কি ব্যাপার কানাই?"

লজ্জায় ছোকাদার মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করলো। কী উত্তর দেবেন? মুখ, চোখ, কান সব লাল হয়ে উঠেছে। হে ধরণী দ্বিধা হও। কিন্তু ভগবান মুখে কথা যুগিয়ে দিলেন। "না স্যার, একটা পিঁপড়ে ঘুরছিল।"

সেন সাহেব বিশ্বাস করলেন। ছোটোছেলের মতো হেসে বললেন ,"আজকে তুমি চলে যাও, কোর্ট বন্ধ থাকবে। সকাল সকাল বাড়ি তো রোজ যেতে পারো না।"

"অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে,"

ছোকাদা চমকে বর্তমানে ফিরে এলেন। কখন চারটে বেজে গিয়েছে আমিও লক্ষ্য করিনি। তিনি পায়ে জুতো গলিয়ে উঠে পড়লেন।

আমিও চেম্বারের দিকে চললাম। এতো দেরি করা উচিত হয়নি।

আইনপাড়ায় জীবনটা মন্দ কাটছিল না। কয়েকমাসের ভিতর কত লোকের সঙ্গে চেনা জানা হলো। এটর্নিদের পরিচয় এখন আমার মুখস্থ, তাঁদের নাম শুনলেই বলে দিতে পারি ক' নম্বরে আপিস; ছোকাদার সাহায্য না পেলে এতো সহজে নিশ্চয়ই পোক্ত হয়ে উঠতে পারতাম না।

ছোকাদা প্রশ্ন করতেন, "বলো দিকিনি মুখুজ্যে-বিশ্বাস।" উত্তর দিতে একটু দেরি হলে তিনি বলেন, "এর মধ্যে ভুলে গেলে, কাল বলে দিয়েছি, দশ নম্বর।"

ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ের বাবু পাঁচুগোপাল ব্যাস্ত লোক— আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুনছিলেন মন দিয়ে। তিনি বলে দিলেন, "কতক জিনিস, বিশেষ করে এটর্নিদের নাম-ঠিকানাটা নামতার মতো মুখস্থ করে ফেলো, কাজে লাগবে।"

মুখস্থ করতে আমার মোটেই আপত্তি সেই। সুতরাং প্রচুর আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ব্যারিস্টারের বাবু হওয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা চলতে লাগলো।

চেম্বারের সায়েব-ভীতিটাও ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। বিলিতী উচ্চারণ এখন আর অবোধ্য ঠেকে না কয়েকদিন কোর্টে সায়েবকে কেস্ করতেও দেখে এসেছি। বেশিরভাগ মামলা আইনের জটিলতায় কণ্টকিত। কিছু বুঝিনি, এবং বোঝার চেষ্টাও বিশেষ করিনি। বেয়ারা মোহনচাঁদ আমার থেকে হাইকোর্টের খবর অনেক বেশি জানে। পণ্ডিতের মতো ঘাড় নেড়ে সে আমাকে জানিয়ে যেতো, আজকের কেসে সায়েবের জিত হয়েছে, কিংবা কেস এখনও শেষ হয়নি, আগামী কাল চলবে।

কোর্টে কাজ না থাকলে সায়েব ভিতরে বসে পড়াশুনা করেন।

আমি তাঁর ঘরের বাইরে বসে টাইপ করি। সায়েবের সঙ্গে কারুর দেখা করতে হলে আমার সামনে দিয়ে যেতে হয়।

ভয়ঙ্কর গরম পড়েছিল ক'দিন। পুরোদমে পাখা চালিয়ে দিয়ে টাইপ করে যাচ্ছিলাম। এমন সময় কে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "সায়েব ভিতরে আছেন নাকি ?"

আগন্তুকের দিকে চেয়ে দেখলাম। এমন বিচিত্র বেশভূষা সচরাচর চোখে পড়ে না। বিলিতী আদবকায়দা, কিন্তু প্যাণ্টে অন্ততঃ ডজনখানেক তালি। শার্টের কলার ফেটে প্রায় জামা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। জামাটি শেষ কবে কাচা হয়েছে ভগবান জানেন। তেল ও ঘামে টাইটা যে রঙ ধারণ করেছে তা বর্ণনা করার মতো ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না। জুতো ক্যাম্বিশের হলেও অসংখ্য চামড়ার তালিতে প্রায় চামড়ার জুতোর রূপ নিয়েছে।

এমন লোককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছি। সাধারণতঃ ভিক্ষার জন্য এই ধরনের লোক আপিসে-আপিসে হানা দেয়।

আগন্তুকের মুখের দিকে আবার তাকালাম। শরীরে কোথাও মাংসের লেশ মাত্র নেই। একটা দীর্ঘ কঙ্কাল যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা। কিন্তু এই শ্রীহীনতার মধ্যেও দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো।

হাতের জীর্ণ এটাশি কেসটা খুলতে-খুলতে আগন্তুক বললে, "আমি সায়েবের বন্ধু।"

অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করতে হলো।

আমাকে নির্বাক দেখে লোকটি তীব্র দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সামনের চেয়ারে বসলো। এটাশি কেসের ভিতর বিরক্তভাবে হাত চালিয়ে একটা কার্ড বার করলো। কার্ডটিও মালিকের মতো বহু ব্যবহারে মলিন।

কার্ড পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাতে লেখা—

"বি. কে. বোস, বি. এ. (ক্যাণ্টাব),
ব্যারিস্টার-এট-ল"

ইনি ব্যারিস্টার ? অসম্ভব। চৌরঙ্গী-অঞ্চলের সিনেমা-হাউসগুলির সামনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভিখারির গোষ্ঠীভুক্ত বলে যাকে আন্দাজ

করছিলাম তিনি কিনা ব্যারিস্টার। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে কাজ করতে এসে বহু ব্যারিস্টার দেখেছি, অনেকের সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচয় হয়েছে। তাঁদের অনেকের ভালো পসার, ছ'হাতে টাকা রোজগার করেন; আবার কেউ হয়তো ছ'মাসে একবার গাউন পরেন। তবু সকলেরই চালচলনে, বেশবাসে অভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ব্যারিস্টার বোসের একি রূপ!

আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করে ব্যারিস্টার বোস ভিতরে ঢুকে গেলেন।

"এই যে বোস, অনেকদিন কোন খবর নেই কেন?" চেয়ার থেকে উঠে যখন সায়েব বোসকে অভ্যর্থনা করলেন, তখন আমার সন্দেহ নিরসন হলো, লোকটা সত্যই তাঁর পরিচিত।

"নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, আসা হয়ে ওঠে না।" বোস উত্তর দিলেন।

আমাকে ডেকে সায়েব চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন।

"শরীর কেমন?"

বোস উত্তর দিলেন, "বেশ ভালোই আছি। শরীরে মেদ থাকলেই সুস্থ, এবং না থাকলেই অসুস্থ, এমন কোন নিয়ম নেই।"

ছ'জনের আলাপ-আলোচনা অনেকক্ষণ চললো। আমার চেয়ার থেকে সে-সব স্পষ্ট শোনা না গেলেও, মিস্টার বোসের ইংরেজী কথনের অপূর্ব ভঙ্গিমায় বেশ আশ্চর্য বোধ করলাম।

সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যারিস্টার বোস আমার কাছে এলেন। সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে ক্যাম্বিসের জুতোর ফিতেটা আঁট করে নিলেন। তারপর এটাশি কেস্ নিয়ে বিদায় নিলেন।

"বোসকে দেখলে?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন?

উত্তর দিলাম "হ্যাঁ"।

কথার ভঙ্গিতে হয়তো সায়েব আমার মনের কথা বুঝলেন। তাই বললেন, "তোমাদের শাস্ত্রেই বলে পুরুষের ভাগ্য স্বয়ং দেবতার অজ্ঞাত, মানুষ তো ছার। এমন এক দিন ছিল যখন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না বোসকে এই বেশে দেখতে হবে কোনোদিন।"

আর কিছু বললেন না তিনি। একটা চিঠি টাইপ করতে দিয়ে বোসের প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।

ব্যারিস্টার বোসের দারিদ্র্যক্লিষ্ট কঙ্কালসার চেহারাটি ক্রমশঃ আমার খুব পরিচিত হয়ে উঠলো। এটাশি কেস্ হাতে তিনি চেম্বারে আসেন। সেই তালিমারা প্যান্ট, তেল চিটচিটে শার্ট ও টাই; সেই ক্যাম্বিশের জুতো, সেই একই ভঙ্গিতে এটাশি কেস্ ও ব্রীফের বাণ্ডিল নামিয়ে জিজ্ঞাসা—"সায়েব ভিতরে আছেন?" এবং ভিতরে প্রবেশ ও সায়েবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও প্রস্থান।

ইদানিং প্রায়ই চেম্বায়ে আসছিলেন তিনি। আগে মাসে একবারের বেশি দেখা হতো না। কিন্তু সময়ের ব্যবধান কমতে কমতে সপ্তাহে দু'তিনবার হাজিরা দিতে লাগলেন ব্যারিস্টার বোস।

ফলে সায়েবের কাজে ক্ষতি হয়। গল্পে বসলে মিস্টার বোস সহজে উঠতে চান না। কেসের কাগজপত্র ফেলে সায়েবকেও কথা বলতে হয়। আড়ালে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। দুপুরবেলায় সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে যাঁর একঘণ্টার মূল্য বেশ কয়েক মোহর।

"বোসের কি কোনো কাজকর্ম নেই?" একদিন সায়েবকে জিজ্ঞাসা করলাম।

ম্লান হেসে তিনি বললেন, "বেচারা ব্রীফ পায় না।"

"কিন্তু ওঁর হাতে তো সর্বদাই ব্রীফের বাণ্ডিল থাকে।"

সায়েব আবার হাসলেন। "ওগুলো বাসী ব্রীফ। পড়লে দেখবে একটারও বয়স কুড়ি বছরের কম নয়। ডাক্তারদের স্টেথিস্কোপের মতো ব্যারিস্টারদের ব্রীফ হাতে রাখতেই হয়, মক্কেল থাক আর না থাক।"

ব্রীফ রহস্য আমার জানা ছিল না। নতুন জ্ঞান সঞ্চয়ে তাই মনে মনে বেশ ধাক্কা খেলাম।

আর একদিন বোস এটাশি কেস্ ও ব্রীফের বাণ্ডিলটা আমার টেবিলে রেখে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। একটুপরে সুইং ডোরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বোস কয়েকটা নোট পকেটে রাখছেন। বলছেন, "মেনি থ্যাঙ্কস। এখন উঠি, অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"কাজ থাকলে এখানে সময় নষ্ট করতে বলতে পারি না।" সায়েবের উত্তর কানে এল।

ভারিক্কী চালে গটমট করে বোস বেরিয়ে গেলেন।

টাকার পরিমাণটা জানতাম না, সায়েবও বলেননি আমাকে। কিন্তু বোসের ঘন-ঘন আবির্ভাবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সায়েব যে লজ্জিত হচ্ছেন তা বুঝতে পারি। বোস এসেই চাপা গলায় কিছুক্ষণ কথা বলেন, এবং সায়েব পকেট থেকে টাকা বার করে দেন। মুখে কিছু বলতে পারেন না।

শেষে একদিন আমি বললাম, বোস এবার এলে আভাসে খানিকটা বুঝিয়ে দেবো। নিজের পক্ষে সেটি সম্ভব নয় বলেই সায়েব প্রথমে কিছুতে রাজী হন না, কিন্তু পরে নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে মত দিলেন।

একদিন সকালে বোস এলেন। এটাশি কেস্‌টা নামিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "সায়েব আছেন?"

কথাটা কী ভাবে পাড়বো, পূর্বাহ্নেই মনে-মনে রিহার্শল দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু বোসের চালচলন ও ব্যবহারে এমন একটা প্রখর ব্যক্তিত্ব আছে যে, ঘটনাস্থলে সব গোলমাল হয়ে গেল। সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম।

যথাসম্ভব মনোবল সঞ্চয় করে বললাম, "হ্যাঁ আছেন, তবে কাজে ব্যস্ত। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কী প্রয়োজন এই স্লিপটাতে লিখে দিন।"

চমকে উঠলেন বোস। উত্তেজনায় থর-থর করে তাঁর দেহ কাঁপতে লাগল। "কী বললেন? স্লিপ? স্লিপ দিয়ে দেখা করতে হবে?"

প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। আকস্মিক আঘাতে তাঁর সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠেছে। তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, চোখ নামিয়ে নিলাম। মনে হলো যেন অসংখ্য রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ [illegible] ভিতরে প্রবেশ করে সবকিছু দেখে নিচ্ছে। প্রস্তুত হয়ে রইলাম, [illegible]তিকর কথা শুনতেই হবে তাঁর কাছে।

কিন্তু পরমুহূর্তে [illegible] পরিবর্তন। শান্ত হয়ে গিয়েছে তাঁর মুখমণ্ডল। চোখে [illegible]গুন দপ করে জ্বলে উঠেই নিবে গিয়েছে।

কোনো কথা [illegible]। এটাশি কেস্ ও ব্রীফের বাণ্ডিলটা হাতে তুলে তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন। লজ্জিতকণ্ঠে বললাম, "চলে যাচ্ছেন কেন?

মুখ ফিরিয়ে তিনি আর একবার তাকালেন। চোখ কুঞ্চিত করলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না। শুধু তাঁর দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ কানে বাজতে লাগলো।

আমি বিমূঢ়। সম্বিত ফিরে এলে বেদনা বোধ করলাম। ব্যারিস্টার বোসকে অপমানের উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

যথাসময়ে সায়েবকে সব বললাম। শুনে তিনি নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মনের গোপন কোণে তিনি আঘাত পেয়েছেন, লজ্জিত হয়েছেন। সামনের একখানা মোটা আইন বই-এর দিকে শূন্য দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, "বোস চলে গেল? নাঃ, খুব অন্যায় করেছি।"

আমি বললাম, "কোন রূঢ় কথা বলিনি তাঁকে।"

সায়েব আমার মুখের দিকে তাকালেন। "সে-কথা বলছি না। অপরাধ আমারই।"

তাঁর মনের আকাশে বিষণ্ণ মেঘ ক্রমে-ক্রমে জমে উঠছিল। বোধ করি তাই তিনি ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন বোসের কাহিনী। হাতে কাজ ছিল, সেগুলো পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, "এসব তো রোজই আছে।"

"তোমাকে আগে বলিনি, বোস আমার বহুদিনের পরিচিত, সে আমার সহপাঠী!"

"আপনার সহপাঠী?" ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিলো আমার।

"হ্যাঁ।"

আশ্চর্যভাবে পরিচয় হয়েছিল তার সঙ্গে। ছাত্রজীবনের কথা। বেশ ছিল দিনগুলো।"

আমি শুনছি, সায়েব বলছেন—

তখন আমরা কেমব্রিজে পড়ি। ওখানকার কয়েকজন দুষ্টু ছাত্র বুলডগ নামে যতো রাজ্যের গোলমেলে খবরে বোঝাই এক পত্রিকা বার করতো। কাগজটিকে ভয় করতো না, এমন লোক কেমব্রিজে ছিল না। মাসের তিন তারিখে ছাত্র শিক্ষক সকলে তটস্থ; বুলডগ কাকে কামড় দিয়েছে, কে জানে।

আমাদের নিজেদের ছোট্ট একটি সাহিত্য-আসর ছিল। বুলডগের নজর সেটির উপরও পড়লো। আসরের কীর্তিকাহিনী ব্যঙ্গ করে বুলডগে যে লেখা প্রকাশিত হলো তাতে ছাত্রসমাজে আমাদের মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠলো। এমন কি আসর ভাঙবার দাখিল। ভয়ঙ্কর রেগে একদিন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। সম্পাদক জন ক্রফোর্ড আমাদের পাশের কিংস কলেজের ছাত্র। উত্তেজনার মাথায় বেশ কিছু শুনিয়ে দিলাম তাকে। ক্রফোর্ড হেসে বললে, "প্রবন্ধটি বিশেষ-প্রতিনিধি লিখিত। একটু অপেক্ষা করলেই লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ পরে এক সুদর্শন যুবক ঘরে প্রবেশ করলো। মিষ্টি হাসিতে সারা মুখখানি ভরে আছে। গৌরকান্তি। কালো কুচকুচে চুল। নিখুঁত বেশবাস। হাতের চওড়া কব্জি দেখলেই বোঝা যায় স্পোর্টসম্যান।

ক্রফোর্ড পরিচয় করিয়ে দিলে, "এই নিন আপনার লেখক। যা-কিছু বলার এঁকেই বলুন। মিস্টার বোস, সেণ্ট জনের ছাত্র। ইণ্ডিয়া থেকে পড়তে এসেছেন।"

আমি স্তম্ভিত। ইংরিজী যার মাতৃভাষা নয়, সে এমন সুন্দর লিখতে পারে। বিদেশে পড়তে এসে মাথায় এতো দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে!

রাগ দেখানোর সুযোগই দিলে না বোস। বললে, "বদ্ধ ঘরের মধ্যে ঝগড়া করা আমার পোষায় না। এসব খোলা মাঠে জমে ভালো।"

সম্মোহনী শক্তি আছে বোসের। প্রতিবাদ করতে পারলাম না। ক্রফোর্ডের ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে 'বায়রনস্ পুলে'র ধারে হাজির হলাম আমরা। কতদিনের প্রাচীন স্মৃতি। ছাত্রাবস্থায় লর্ড বায়রন এই পুকুরের সামনে বসতেন, কখনো ছেলেমানুষের মতো ক্রীড়াচ্ছলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন জলে।

পুকুরপাড়ে বসে আমরা বায়রনের দিনের কথা ভাবছিলাম। বোস বক্তা, আমি শ্রোতা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আমরা উঠে পড়লাম। হঠাৎ মনে পড়লো, ঝগড়া করার জন্য এসেছিলাম আমরা।

বোস নিজেই বললে। "বাক্‌যুদ্ধটা আজ হলো না। ঠিক আছে, তোলা রইলো। আর একদিন আসুন, সুদে আসলে ঝগড়া করা যাবে।"

ঝগড়ার দিনটা ক্রমশঃ পিছিয়ে গিয়েছে, এবং শেষপর্যন্ত তামাদি। হাতাহাতি করতে এসে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। বোসের আড্ডা-সভার আমি অন্যতম মেম্বর।

বাবার একমাত্র সন্তান বীরেন বোস, বন্ধুবান্ধবের পিছনে দু'হাতে টাকা খরচ করে। একা কিছু খাওয়া, একা থিয়েটারে যাওয়া বোসের কল্পনার অতীত। কোথাও পিকনিক হবে, খাবারের দায়িত্ব সে জোর করে নিজের উপর নেবে। পাঁচটা কি দশটা টাকা আজ তার কাছে কত মূল্যবান অথচ একদিন কথায়-কথায় সে দু'-তিন পাউণ্ড খরচ করেছে।

বোস ছবি আঁকে, ঘোড়ায় চড়ে। ছুটির দিনে বন্দুক কাঁধে শিকারে বার হয়। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। সারাদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে সন্ধ্যার আগে যখন সে ফেরে, তার ঝুলিতে তখন বেশ কয়েকটা বন্য পাখি। গুন-গুন করে সে নিজের ভাষায় গান গাইতো। আমরা বুঝতাম না, তবু ভালো লাগতো। বোসের হস্টেলে ঘরের এক কোণে একটা ছোট্ট কটেজ-পিয়ানো ছিল। কত সন্ধ্যায় তার বাজনা শুনেছি। সে উঠে এসেছে, আমি বাজাতে আরম্ভ করেছি। বাজনায় বিভোর হয়ে সময় ভুলে গিয়েছি। তারপর হঠাৎ দূরে ট্রিনিটি কলেজের ভারী পুরুষালী স্বরের ঘণ্টা শুনে চমকে উঠেছি, রাত অনেক। বোস তখনো বিভোর, সুরের মূর্ছনায় সম্পূর্ণ মগ্ন। কোনোদিন বা কাব্যচর্চা—বায়রন, শেলী কিংবা কীটস্।

বীরেন বোসের আর এক রূপ ছিল। কলেজের পড়াশুনার বাইরে যতো রাজ্যের দুষ্টুমি বুদ্ধি তার মাথায় খেলে যায়। কোনো মতলবের প্রয়োজন হলে বন্ধুবান্ধবরা তার পরামর্শ নিতে ছুটে আসে। বোস বলতো, "ভেবেছিলাম বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি শিখে দেশে প্র্যাক্‌টিস্ করবো। এখন দেখছি ইচ্ছে করলে এখানেই ব্যবসা ফাঁদতে পারি।"

বোসের বহু কীর্তির মধ্যে একটি আজও বেশ মনে পড়ে। ডক্টর ডেভিস ছিলেন ল্যাটিনের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর পাণ্ডিত্যের

খ্যাতি জগৎ-জোড়া। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যা হয়, অধ্যাপক হিসাবে তিনি একেবারে ব্যর্থ। মানুষ হিসাবে কিন্তু তাঁর তুলনা হয় না। অবিবাহিত অধ্যাপকের সংসারে কোনো আকর্ষণ নেই। ছাত্রদের কিসে উপকার হয়, কিভাবে তাদের সাহায্য করা যায়, এই চিন্তায় তিনি ডুবে থাকেন। ছাত্রমঙ্গলের অদম্য আগ্রহে অধ্যাপক ডেভিস মাঝে মাঝে উদ্ভট কিছু করে বসতেন।

একবার ডক্টর ডেভিসের মাথায় ঢুকলো যে, তাঁর ছাত্রদের জ্যাম ও জেলির পিছনে অনেক খরচ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির। সুলভ মূল্যে জেলি তৈরি করতে হবে। ল্যাটিনের অধ্যাপক আহার নিদ্রা ত্যাগ করে জেলি তৈরির বিভিন্ন মসলা নিয়ে রান্নাঘরে রাতের পর রাত কাটাতে লাগলেন। কটু গন্ধে চার দিক ভরপুর হয়ে উঠলো। অধ্যাপকের কিন্তু খেয়াল নেই। মোটা মোটা বই নিয়ে তিনি রান্নাঘরে বসে আছেন, আর সামনের কড়াইয়ে জেলি তৈরি হচ্ছে। কোনো বাধা তিনি মানবেন না। বাজারের জেলির পিছনে ছাত্রদের অপচয় বন্ধ করতেই হবে।

অবশেষে অধ্যাপক ডেভিসের জেলি আণ্ডার-গ্রাজুয়েট বাজারে বেরুলো। অতি সুলভ মূল্য, মাত্র এক পেনীতে এক শিশি। তিনি নিজে প্রত্যেক হস্টেল ঘুরে দেখতে লাগলেন ছাত্ররা এখনও অন্য জেলি কিনে পয়সা নষ্ট করছে কিনা।

অধ্যাপক ডেভিসের জেলি স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়! মুখে দিলে বমি হওয়ার উপক্রম। প্রতিবাদে ফল নেই, কারণ অধ্যাপক ডেভিসের জেলি 'হাইজিনিক', রসনা তৃপ্ত না হলেও আখেরে ফল দেবে।

জেলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন ছাত্র অবশেষে বোসের শরণাপন্ন হলো।

মন্ত্রণাপরিষদের বৈঠক বসতো গোপনে। আমরা কিছু জানতে পারিনি।

দিন দশেক পরে সমস্ত কেমব্রিজ শহর সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রে অবাক হয়ে এই বিজ্ঞাপনটি পড়লো ঃ

"কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিনের প্রধান অধ্যাপক আমি, ডক্টর জন ডেভিস এতদ্দ্বারা সর্বসমক্ষে বিখ্যাত

জেলি প্রস্তুতকারক মেসার্স কাইলার এণ্ড কোম্পানির নিকট উক্ত কোম্পানির ছাপমারা শিশিতে নকল জেলি বিক্রয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে কখনও এরূপ কাজ করিব না।"

পরে অনুসন্ধান করে সমস্ত জানলাম। অধ্যাপক ডেভিস জেলি তৈরির পর খেয়াল করলেন যে, জেলি রাখার জন্য কোনো শিশি আনা হয়নি। তাঁর ঝি তখন কাছাকাছি হস্টেলে যতো খালি শিশি ছিল নিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিশিগুলো কাইলার এণ্ড কোম্পানির নামাঙ্কিত। এই খবরটুকুই কাইলার এণ্ড কোম্পানিকে জানিয়ে দেওয়ার বুদ্ধি বোস সেদিন দিয়েছিল।

কেমব্রিজের পাঠ শেষ করে আমরা দু'জনেই ব্যারিস্টারি পড়তে লণ্ডনে এলাম। আমি গেলাম ইনার টেম্পলে, বোস লিঙ্কনস্ ইনে। বেশিরভাগ ভারতীয় ছাত্র লিঙ্কনস্ ইনে যেতো সেই সময়।

বোসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমে এল, তবে একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ নয়। পত্রালাপ তো ছিলই, তাছাড়া ছুটি-ছাটায় সে আমার ফ্ল্যাটে আসতো। আমিও মাঝে-মাঝে তার কাছে যেতাম। বোস আতিথ্যের কোনো ত্রুটি রাখতো না। খাওয়া-দাওয়া, এমন কি প্রায়ই থিয়েটারের টিকিট কাটা। কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি— সেই চিরপরিচিত সদাহাস্যময় আনন্দের প্রস্রবণ। আমরা গল্প করেছি, কবিতা পড়েছি, আর শুনেছি সুন্দরবনের জঙ্গলে বোসের বাবার শিকার কাহিনী।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির কাজ পেয়ে এক ছুটির সময় আমাকে জার্মানী যেতে হলো। সমস্ত জার্মানী পরিভ্রমণ করে মাস কয়েক পরে লণ্ডনে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে বোসের সংবাদ রাখতে পারিনি, তাই সুযোগ পেয়েই দেখা করতে গেলাম। প্রথম দর্শনেই চমকে উঠলাম। বোসকে একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে। আগেকার মতো আমাকে দেখে সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো না। মুখে চোখে অত্যধিক গাম্ভীর্যের ছাপ। বেশ অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। মামুলি কথাবার্তার পর সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

সপ্তাহখানেক পরেই এক সন্ধ্যায় বোস আমার ফ্ল্যাটে দর্শন

দিলো। রাতের মতো তাকে থেকে যেতে বললাম। বোস আপত্তি করলো না।

ইতিমধ্যে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় তু'জনেই সাফল্য লাভ করেছি। ডিনার সেরে আমরা ফায়ার প্লেসের সামনে এসে বসলাম। তু'জনের মুখে পাইপ। প্রথমে কোনো কথা নেই। শুধু পাইপের ধোঁয়ায় ড্রইং-রুমের আলোটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বাইরে বেজায় শীত, ফায়ার প্লেসে আগুন গন গন করছে। বোস অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কী প্ল্যান করছি। বললাম, এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, খুব সম্ভবত ব্যারিস্টারি করবো না।

আলোচনা জমে উঠলো। বিষয় অনেক—কেমব্রিজের ছাত্রজীবন, আমার জার্মানী ভ্রমণ, ইত্যাদি। হঠাৎ বোস বলে উঠলো, "আজ কেন এলাম জানো ?"

"না, কেন ?"

বোস গম্ভীর হয়ে উঠলো। একটু থেমে বুকপকেট থেকে একটা ছবি বার করে আমার সামনে ধরলো, "চিনতে পারো ?"

চিনতে না পারার কারণ নেই। বোস যাঁদের বাড়িতে পেইং গেস্ট সেই মিস্টার এণ্ড মিসেস ডেবেনহামের মেয়ে এমিলি।

বোসের পকেটে এমিলি ডেবেনহামের ছবি! আমি অবাক।

আরও অবাক হলাম, যখন আমার পিঠে একটা হাত রেখে বোস বললো, "এমিলিকে বিয়ে করছি।"

"কংগ্রাচুলেশনস্। এই তো বীরোচিত কার্য।" করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম।

নিতান্ত ঠাণ্ডাভাবে বোস তার হাতটা এগিয়ে দিলো। পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "আমাদের দেশে বাপ-মায়ের অমতে বিয়ে করাটা রীতি নয়। হয়তো অনেক গঞ্জনা সইতে হবে। মা বেঁচে থাকলে কান্নাকাটি করতেন, কিন্তু তিনি অনেককাল চোখ বুজেছেন। বাবা ? সে যা হয় হবে।"

"হোস্টের মেয়েকে ভালোবাসার মধ্যে থ্রিল আছে।" আমি বোসকে উৎসাহ দিলাম।

"সত্য কথা।" এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো বোস। "আমাদের মতো গোঁড়া দেশেও এমন ঘটনা ঘটেছিল।"

সেদিন বোসের মুখে তোমাদের কচ ও দেবযানীর গল্প শুনেছিলাম। সুন্দর কাহিনী। সর্বদেশের শিষ্য ও গুরুকন্যাদের কাহিনী। গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদায় নেবার কাল সমাগত। কচ গুরুকন্যা দেবযানীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলেন। "দেবযানী আমার যাবার সময় হয়েছে, তাই দেখা করতে এলাম।" মধুকণ্ঠে দেবযানী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে তো? প্রশ্নের ইঙ্গিত কচ ধরতে পারলেন না। তাই বললেন, "হ্যাঁ সুন্দরী, আমার জীবন কৃতার্থ। আমার সকল আশা চরিতার্থ।" অভিমানিনী গুরুকন্যা তখন মনে করিয়ে দিলেন, "হে উদারদর্শন যুবক ভেবে দেখো কত ঊষায়, কত জ্যোৎস্নায়, কত অমানিশায় এই পুষ্পগন্ধঘন বনে তুমি আমার প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি হেনেছো। সে কি আমি দেখিনি? আমার হৃদয়ও কি সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠেনি?

পৃথিবীর সকল কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান অভিশাপ বর্ষণে শেষ হয় না। কচের প্রশস্ত ও উষ্ণ বক্ষে ব্রীড়াবিধুরা দেবযানীরা অনেক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্ততঃ বীরেন বোস ও এমিলি ডেভেনহামের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

তবুও আমার কেমন আশ্চর্য মনে হয়েছে। এমিলি ডেভেনহাম কুৎসিত না হলেও সুন্দরী নন। একদা কেমব্রিজে এই বীরেন বোস অনেক সুন্দরী ইংরেজ তরুণীর জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে এসেছে। আমি অন্ততঃ ছ'জনের কথা নিশ্চিত জানি। নিউনহাম কলেজের বেরিল ও ভেরনিকার পাশে এমিলি সৌন্দর্য ও বংশ-গৌরব কোনোটাতেই দাঁড়াতে পারে না। আগুনের দিকে পতঙ্গের মতো তারা ছ'জনে বোসের দিকে ছুটে এসেছে। বোস বাধা দেয়নি। একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, কাফেতে মুখোমুখি বসে গল্প করেছে, বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছে। তারপর বেরিল হিউম তাকে মনের কথা জানিয়েছে। বীরেন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভেরনিকা সাদারল্যাণ্ডও একই ভুল করেছিল। মরমে আঘাত পেয়েছে সে বীরেনের কাছে। চোখের জলে রুমাল সিক্ত করেছে ভেরনিকা। নির্বিকার চিত্তে বীরেন বলেছে, জীবনটা

স্পোর্টসম্যানের মতো নিতে হবে, সেন্টিমেন্টাল হয়ে লাভ নেই।

কেমব্রিজের প্রত্যাখ্যান ও আজকের আকস্মিক আত্মসমর্পণের কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। কারণ অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়েছি ব্যর্থ হয়ে। প্রবোধ দিয়েছি মনকে, বোসের ভালো লেগেছে এমিলিকে, সেই যথেষ্ট। গিয়েছি বীরেন বোস ও এমিলি ডেভেনহামের বিয়েতে।

কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক বীরেন বোস ভারতবর্ষের পথে রওনা হলো। বোম্বাই থেকে বীরেন আমাকে শেষ চিঠি লিখেছিল, জানিয়েছিল কলকাতায় পেঁ াছে আবার চিঠি লিখবে।

ব্যারিস্টারি ও সাংবাদিকতার মধ্যে টানা-পোড়েন চলছিল, কোন পথে যাবো তখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। পাকাপাকি কোনো ব্যবস্থার আগেই মহাযুদ্ধ বেধে গেল। অন্য অনেকের মতো কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতে হলো আমাকে। ফলে বোসের কোনো সংবাদ নেওয়া হয়নি।

যুদ্ধজীবনের অনেক কথা। কিন্তু সে-সব এখন থাক। যুদ্ধ শেষে অক্সফোর্ড ও বাকিংহামশায়ার রেজিমেন্টের কর্নেলরূপে ভারতবর্ষে পাড়ি দেবার হুকুম হলো। এক সপ্তাহের নোটিশে লণ্ডন থেকে বোম্বাই।

টিলবেরী ডক থেকে যে জাহাজে চড়েছিলাম সেটি আমাদের একদিন বোম্বাইয়ে নামিয়ে দিল।

তারপর বোম্বাই থেকে ফৈজাবাদ। কয়েক বছর সেখানে কাটিয়ে কলকাতা। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে হাইকোর্ট এমন কিছু দূর নয়। মাঝে মাঝে আসতাম এই পাড়ায়, দর্শক হিসেবে। ভাগ্যের লিখন, কয়েকজন বিচারক বন্ধুর উপদেশে সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে, ব্যারিস্টারি আরম্ভ করলাম এখানে।

ভুলেই গিয়েছিলাম বোসকে।

হাইকোর্টের করিডরে একদিন কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো, "হ্যাল্লো কেমন আছো ? সারপ্রাইজিং তোমার আবির্ভাব !" চেহারা দেখে চিনতে পারিনি, গলার স্বরে বুঝতে পারলাম, বীরেন বোস। আমার দোষ নেই। কেমব্রিজের বীরেনের সঙ্গে আজকের

বীরেনের একটুও সাদৃশ্য নেই। শরীর শুকিয়ে কাঠ, কাঁচা সোনার ও তামার মতো ম্যাড়ম্যাড় করছে। অস্বাভাবিক ক্লান্তিময় মুখচ্ছবি!

আনন্দে জড়িয়ে ধরলাম বোসকে। "হ্যাল্লো। সত্যি সারপ্রাইজিং। কলকাতা থেকে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি রাখোনি তুমি। কেমন আছো? এমিলি কেমন? অসুখ হয়েছিল নাকি? এক ঝাঁক প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম তার দিকে।

"না, অসুখ করেনি।" অন্য প্রশ্নের উত্তর দিলো না সে। কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে বললে, "আজ খুব ব্যস্ত আছি, চললাম।"

পুরনো বন্ধু, কতদিন পরে দেখা। এমন কী তাড়াতাড়ি থাকতে পারে যে পাঁচমিনিট কথা বলা চলে না। ভালো লাগলো না আমার। সত্য বলতে আপত্তি নেই, নিজেকে অপমানিত মনে হচ্ছিলো।

সময়মতো খোঁজ নিলাম বোস সম্বন্ধে। কিন্তু যা শুনলাম তাতে আমার রাগ করবার কিছু রইলো না। একটা পয়সা রোজকার করতে পারে না বোস। কোন পসার নেই তার। তোমরা যাকে বলো ব্রীফহীন ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার বোসের নাম শুনলে এটর্নিরা মুখ টিপে হাসে।

বোসের মতো প্রতিভাবান ছাত্র আদালতে ব্যর্থ; এ এক রহস্য। রহস্যমোচনের উপায় খুঁজে পেলাম না। লোককে জিজ্ঞাসা করলে বলে, "বীরেন বোস? রাবিশ। অকম্মা।"

চিঠি লিখলাম বোসকে। একদিন ডিনারে এসো। কোনো উত্তর দিলো না। অসৌজন্যে আঘাত পেলেও, কিছুদিন পরে আবার চিঠি লিখেছি। উত্তর নেই।

একদিন বিকেলে টাউন হলের সামনে হঠাৎ বোসকে দেখতে পেলাম। ধরলাম তাকে। "আজ ছাড়ছি না। সঙ্গে চলো।"

বোস বললে, "কাজ আছে। এখন যেতে পারবো না।

প্রতিবাদে কান না দিয়ে একপ্রকার জোর করেই তাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। "ডিনারের আগে ছাড়ছি না," বোসকে বলে দিলাম।

চা পর্ব শেষ না হতেই সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘরে কেবল আমরা দুটি প্রাণী বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছি। কোনো কথা নেই। মনে পড়ছিল অনেকদিন আগে লণ্ডনের এমনি এক

সন্ধ্যার কথা। সেদিন আমাদের আলোচনায় প্রাণ ছিল। প্রাণের আনন্দে ত্ব'জনে কথা চলেছিল। আজ আমাকে জেরা করে উত্তর বার করতে হচ্ছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বোস কিছুই বলবে না।

ডিনার শেষে আমরা খোলা বারান্দায় এসে বসলাম। আধো অন্ধকারে সামনে টবের ফুলগাছগুলো ভালো দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের স্তিমিত আলো এসে পড়েছে বারান্দার এক কোণে। বোস বায়রন থেকে আবৃত্তি করছিল। তারপর ধীরে ধীরে তার জীবনের অনধিত অধ্যায়টি আমাকে শোনাতে আরম্ভ করলো।

বৈচিত্রপূর্ণ জীবন অধ্যায়, কয়েকঘণ্টা লেগেছিল শুনতে।

বিলাতফেরত মেম-বিয়ে-করা ছেলেকে বীরেন বোসের বাবা বাড়িতে স্থান দেননি, তবে বলেছিলেন, "অন্য কোথাও থাকো, যা খরচ লাগে দেবো।"

বুঝে-সুঝে চলতে হয় বীরেন বোসকে। তার বাবা খরচ দিতে প্রতিশ্রুত হলেও, পরিমাণটা বেঁধে দিয়েছেন। মোটেই ভালো লাগছে না এমিলির। টাকা আনা পাই-এর সূক্ষ্ম হিসেব করে জীবনটাকে নষ্ট করার জন্য সে লণ্ডন ছেড়ে আসেনি।

এর নাম কলকাতা! লণ্ডনের এমিলি কলকাতা দেখে একেবারে হতাশ। রঙীন স্বপ্নজাল বুনেছিল সে ইণ্ডিয়ার জীবন সম্বন্ধে। এমিলি ভেবেছিল স্বামী তাকে রাজপ্রাসাদে রাখবেন, দামী মোটরে রোজ রেড রোডে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবেন, ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে গোপালপুরে সমুদ্র তীরে তারা রঙীন ছাতার তলায় শুয়ে থাকবে, কিংবা লুকোচুরি খেলবে মুসৌরী বা ডালহৌসি পাহাড়ের কোণে কোণে।

স্বপ্নভঙ্গজনিত আঘাতটা কাটাবার জন্যই ক্লাবে যেতো এমিলি। প্রথমদিকে আটটার মধ্যে এমিলি বাড়ি ফিরতো। একঘণ্টা এগিয়ে ফেরার সময় ন'টায় দাঁড়ালো। তারপর দশটা। এগারোটা। অনেকরাতে যখন সে ক্লাব থেকে ফেরে মদে বেহুঁশ, শিথিল বস্ত্রবাসে ট্যাক্সি থেকে ঘর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না।

উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিচ্ছে এমিলি। বোস বাধা দিতে অনেক চেষ্টা করে। আদর করে বুঝিয়ে বলে,

"ক্লাবে যেও না, আর গেলেও সকাল সকাল ফিরবে।" এমিলি মুখ বেঁকায়—"আমি কি তোমার হিন্দু ওয়াইফ যে, ঘরের কোণে প্যাকিং বাক্সের মতো পড়ে থাকবো?"

তবুও বোস হতাশ হয় না; এমিলির কটূক্তি অসুস্থ প্রিয়জনের প্রলাপ মনে করার চেষ্টা করে।

দিন কাটে। বোসেরও জীবনের শ্যামলতা, সরসতা শুকিয়ে আসে। বোসের মনে হয় সব মেকি, সব নিরর্থক। এমিলির ক্লাব-বিল ও ফ্ল্যাসের টাকা মেটাতেই তার শোচনীয় অবস্থা। এমিলি আরও টাকা চায়। টাকা ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ নেই স্বামীর সঙ্গে।

গল্প উপন্যাসে যা পড়া যায়, এক্ষেত্রেও প্রায় সেইরকম ঘটলো। অশান্তিক্লিষ্ট বীরেন বোসও অন্য পাঁচজনের মতো ধ্বংসের পথে পা বাড়ালো। নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা না পেয়ে সে মিতালি পাতালো মদের পেয়ালার সঙ্গে।

বড়ো ব্যারিস্টার হবার সকল গুণই ছিল তার। তবুও কিছু হলো না। সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন একাগ্র সাধনা, একনিষ্ঠ পরিশ্রম। সেই কারণেই সংসারে শান্তি পুরুষের পক্ষে অপরিহার্য। বাইরে জীবনদেবতার সঙ্গে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা ও উদ্যম অন্দরমহল থেকে আসা চাই, নচেৎ বীরেন বোসের মতো অবস্থা। নিম্নতর প্রতিভা নিয়ে বোসের সমসাময়িক অনেকে কোর্টে সুনাম ও অর্থের অধিকারী হলেন। তাঁরা যখন মক্কেলের মামলা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ব্রীফের পাতায় লাল ও নীল পেন্সিলের দাগ দেন, বোস তখন মদের ঝোঁকে লাল ও নীল রঙের খেলা দেখে। তাঁরা যখন প্রয়োজনীয় নজিরের সন্ধানে কিংসবেঞ্চ, কুইন্সবেঞ্চ ও এ-আই-আরের পাতা তল্লাশী করেন, বোস তখন বায়রনের পাতা ওল্টায়।

প্রথমদিকে বোস ব্রীফ পায়নি এমন নয়। কিন্তু সেদিকে মোটেই খেয়াল ছিল না তার। কোর্টেই যায় না অর্ধেক দিন। এটর্নিরা ঠেকে শিখেছেন। কোর্টে ডাক হয়েছে অথচ ব্যারিস্টার বোসের দেখা নেই। এটর্নি মহলে এসব খবর চাপা থাকে না। অন্য এটর্নিরা সাবধান হয়ে গিয়েছেন।

থোড়াই তোয়াক্কা করে বোস, মদ নিয়ে ব্যস্ত সে। এমিলির অন্তরে সামান্যতম দায়িত্বজ্ঞানের উদয় বোসকে নিশ্চিত পতন থেকে

রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু তা হবার নয়। বোসের বাবা ভাগ্যবান, ছেলের অধঃপতন চোখে দেখার আগেই, তিনি চোখ বুজেছেন।

এমিলি ও বীরেন কেউ কারুর খবর রাখে না। লাট্টুর মতো এমিলি ও বীরেন নিজকে কেন্দ্র করেই পাক খাচ্ছে। এমিলি কখনও ফেরে গভীর রাতে, কখনও বা রাত কাটিয়ে ভোরবেলায়। বীরেন বোস ড্রইংরুমের সোফায় পড়ে থাকে। খালি মদের বোতল মেঝেতে গড়াগড়ি যায়।

অনেক আগে যা ঘটা উচিত ছিল তা ঘটলো দেরিতে। কলতাতার কাছাকাছি এক পাটকলের জনৈক ইংরাজ-নন্দনের কণ্ঠলগ্না হলো এমিলি। এবং যথাসময়ে তাঁরই অঙ্কশায়িনী হয়ে প্রস্থান করলো স্বদেশে।

সময়ের গতিতে বোসও একদিন সম্বিত ফিরে পেলো। নেশার ঘোর কেটে গিয়েছে। চোখ খুলে দেখলো, সর্বস্বান্ত সে। পৈতৃক বাড়িটি ছাড়া সবই লোকসানের অঙ্কে। কেবল লাভ হয়েছে যকৃতের ব্যাধি। অনুতপ্ত বোস নতুন জীবনযাপন করতে মনস্থ করলো। পূর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে ব্যারিস্টারি করার সঙ্কল্প এবার। কিন্তু ইতিমধ্যে সঙ্কল্প ও সিদ্ধির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান রচিত হয়েছে। ব্রীফবিহীন ব্যারিস্টারদের পাকা খাতায় বীরেন বোসের নাম ইতিপূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছে। অপ্রকৃতিস্থ মদ্যপকে কোনো এটর্নি কেস দিতে চান না। মক্কেলের স্বার্থ তাঁকে দেখতে হবে তো। ফলে এগারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত বার-লাইব্রেরীতে দিবানিদ্রা ছাড়া বোসের আর কিছু করার রইলো না। বন্ধ্যা নারীর সন্তানলাভের মতো বীরেন বোসের ব্রীফ লাভ স্বপ্নেই রয়ে গেল।

পত্রপুষ্পেভরা বৃক্ষে শীতের আগমনে ক্ষয় শুরু হয়, একে একে ঝরে পড়ে প্রতিটি পাতা। শুধু শাখাপ্রশাখার দল কঙ্কালের মতো বীভৎস রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীরেন বোসেরও তাই। তার জীবনযাত্রার ব্যারোমিটারের পারা ক্রমশঃ নিচের দিকে নামতে লাগলো। র‍্যাঙ্কিনের তৈরি স্যুট ছাড়া পরতো না বীরেন। র‍্যাঙ্কিন ছেড়ে ওয়াছেল মোল্লা। সেখান থেকে হাওড়া হাটের জামা। সে জামাতেও তালি পড়তে লাগলো একের পর এক। মোটর ছেড়ে ট্যাক্সি ধরলো বীরেন বোস। ট্যাক্সি ছেড়ে বাস্।

একটানা বলে যাচ্ছিলেন সায়েব। আমি শুনে যাচ্ছিলাম নীরবে। একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করিনি। ডুবেছিলাম কাহিনীর অতলে। সায়েব থামতে, আমিও যেন জেগে উঠে নড়ে চড়ে বসলাম। মাথার ভিতর অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা তালগোল পাকাচ্ছে। জানতে পেরেছি একটা বিচিত্র জীবনকে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বীরেন বোস যেন একটা নয়। ছেঁড়া ও নোংড়া জামাকাপড় পরা বীরেন বোস, কেমব্রিজের বীরেন বোস একটা সারির তুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যিখানে আরও অনেকগুলো বীরেন বোস, বিভিন্ন রূপ ও বয়স তাদের।

সায়েব আবার বললেন, "বোস কিন্তু কখনও আমার কাছে হাত পাতেনি। প্রকারান্তরে বুঝতে পেরে আমিই কিছু কিছু দিয়েছি।"

"তাই নাকি? ভিক্ষা চায়নি বীরেন বোস!"

"বোসকে আমি জানি। আর কখনও সে আসবে না।" সায়েব উঠে পড়লেন।

বেশ মনে আছে, সেদিন বিকেলে চেম্বার থেকে ডালহৌসি যাচ্ছিলাম, ওখান থেকে বাড়ি ফিরবার বাস মিলবে। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে পড়েই দেখি যে, আমার কয়েকগজ সামনে বোস শাল-পাতার ঠোঙা হাতে ছোলামটরসিদ্ধ চিবোতে চিবোতে চলেছেন। ভাবলাম ছুটে গিয়ে ক্ষমা চাই। বলি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

না যাবো না। হয়তো লজ্জা পাবেন। চলার বেগ কমিয়ে দিয়ে তু'জনের দূরত্ব আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলাম। একমনে ছোলা চিবোচ্ছেন তিনি, আমি পিছন থেকে দেখছি। ডালহৌসির মোড়ে হাজির হলাম আমরা। সেখানে শালপাতাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে, ব্রীফের বাণ্ডিল বাঁ বগলে চেপে ধরে একটা চলন্ত ধর্মতলামুখো সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামের কামরায় উঠে পড়লেন ব্যারিষ্টার বোস।

বয়স তখনও কম, অনুভূতি তীক্ষ্ণ। অভিভূত হওয়াটা আশ্চর্য নয়। ব্যারিস্টার বোস স্মৃতিপটে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিলেন। অনুতাপে দগ্ধ হয়েছি। কেন আমি স্লিপ লিখতে বলেছিলাম

তাঁকে। অযথা চিন্তায় অনেক সময় নষ্ট করেছি। দোলা বেশি লাগার কারণ আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিবেশ থেকে এসে পড়েছি বিশাল জগতে। আচমকা সমুদ্রে পড়লে খালের নৌকার যে অবস্থা হয়।

নিজের উপড় শ্রদ্ধা বাড়ছিল। সওদাগরী কিংবা সরকারী আপিসে গতানুগতিক কলম-পেশা নয়। সাক্ষাৎ জীবনের সঙ্গে আমার কাজ কারবার। গতিময়, বৈচিত্র্যময়, অনিশ্চয়তায় পূর্ণ জীবনকে অতি নিকট থেকে দেখতে পাচ্ছি।

দেখে দেখে শক্ত হয়ে যাবো। কারণ অকারণে অনুভূতির তন্ত্রীতে আলোড়ন সৃষ্টি হবে না। আজ যখন লিখছি, ব্যারিস্টার বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, শান্ত মেজাজে গ্রহণ করতাম তাঁর কাহিনী। অতি সাধারণ একটি ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন, করুণ হলেও বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু অনভিজ্ঞ কাঁচা মনের কথা আলাদা। অসংখ্য প্রশ্নের আগাছা যেখানে গজিয়ে উঠেছে। বিলেত-ফেরত বোস ব্যারিস্টারিতে কিছু পান না। বার লাইব্রেরীতে দিবানিদ্রায় সময় না কাটিয়ে চাকরি করলে পারেন, অন্ততঃ নিজের খরচ চলে যাবে।

সায়েবের কাছে এ প্রশ্ন তোলবার সাহস হয়নি। কিন্তু সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মনের অশান্তি কাটছে না।

হাইকোর্টে বাবুদের বেঞ্চিতে ছোকাদা বসেছিলেন। ব্যারিস্টার বোসকে চিনলেও, তাঁর অতীত জীবনের ইতিহাস ছোকাদা জানতেন না। বলে গেলাম তাঁকে গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত। অর্জুনবাবু পাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন, "এ নদীতে যে ডুবেছে সেই মজেছে। চুনো পুঁটি থেকে রুই-কাতলা সব এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, মরলেও যাবে না।"

দার্শনিকের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ছোকাদা। "কালো গাউন একবার ঘাড়ে চাপলে আর ছাড়ান নেই।"

ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ের বাবু পাঁচুগোপাল হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। প্রকৃতিতে গম্ভীর হলেও তাঁর রসবোধের অভাব নেই।

"কি দাদা কিসের গল্প হচ্ছে?" পাঁচুবাবু ছোকাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"নতুন এসেছে ছেলেটি, কিছুই জানে না। তাই এই কালো গাউনের রহস্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছি," ছোকাদা উত্তর দিলেন।

"দিন দাদা, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিন।" পাঁচুবাবু উঠে গেলেন।

ছোকাদা আমাকে বললেন, "ছাখো বাপু, মাঝামাঝি পথে থাকাই ভালো। অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে, অতি ছোটো হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে। ব্যারিস্টার বোসের না হয় কষ্টের শেষ নেই। কিন্তু ওই যে পাঁচুর সাহেব সুব্রত রায়, তাঁরও কি সুখ আছে!"

বিশ্বাস হয়নি আমার। ব্যারিস্টার সুব্রত রায়, হাইকোর্টের অন্যতম সেরা ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ের কী অভাব থাকতে পারে? কিন্তু যখন তাঁর সমগ্র জীবনটি আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তখন মত পরিবর্তন করেছি। বিচিত্র জীবন কথা!

জীবনের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে ব্যারিস্টার সুব্রত রায় মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকান। এ বয়সে সামনে দৃষ্টিপাত করে লাভ নেই। তাতে শুধু শেষের দিনগুলির পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠে, জীবনের ক্ষণিক অবকাশ-মুহূর্তগুলোকে বিষাদপূর্ণ করে তোলে। ক্যালকাটা ক্লাবের ব্যালকনিতে বসে ব্যারিস্টার সুব্রত রায় সামনে সবুজ ঘাসের মখমলে মোড়া লনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ফিরে যান তাঁর পুরনো দিনে। বেশ লাগে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি। মামলার চিন্তা নেই, কেস্-ল নেই, ব্যারিস্টার এইচ. স্যানিয়েলের সওয়ালের উত্তর দেওয়ার ভাবনা নেই। একেবারে মুক্ত, ভাবনালেশহীন আত্মসমাধি।

সুব্রত রায়ের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। ব্রীফের পাহাড়। একটা মাথা, কত কেস্ নেওয়া সম্ভব? কিন্তু কেউ শুনতে চায় না। দুরূহ কেস্, জটিল আইন? সুব্রত রায়ের কাছে সে ব্রীফ আসবেই। কাজ কমানোর জন্য তিনি পাঁচুগোপালকে বলছেন, "পাঁচু, ষাট মোহরের কমে কেস্ নেবো না।" পাঁচু ঘাড় নেড়েছে। কিছুদিন পরে মনে পড়লো কই কাজ তো কমেনি। "পাঁচুগোপাল, কী ব্যাপার?" পাঁচুগোপাল হাসে, "স্যার, একশ' মোহর চাইলেও এটর্নিরা এখানে লাইন দেবে।"

সুব্রত রায়ের হাসি আসে। "ওদের ধারণা আমি কেস্ নিলেই জয় সুনিশ্চিত—যতো খারাপ মামলাই হোক। কিন্তু দিনকে রাত করা সম্ভব নয়। সত্যের নিজস্ব গতি আছে, আইনের যাদুতে তাকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা বুঝেও বোঝে না।"

এটর্নিরা আড়ালে বলে, লোকটা অর্থপিশাচ। এক পয়সা ফী কম নেবে না। সুব্রত রায় ভাবেন, কেন তিনি মোটা ফী নেবেন না? ব্রীফের খোঁজে একদিন তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন—একটা কেস্, জুনিয়র ব্রীফ কিংবা আনডিফেণ্ডেড ম্যাটার। তখন কোনো এটর্নি মুখ তোলেননি; বলেছেন কাজ কোথায় মশায়?

আজ সারা হাইকোর্টে তাঁর যশ। সুব্রত রায় অমুক কোর্টে কেস্ করবেন, ছোকরা এডভোকেট ও ব্যারিষ্টাররা সেখানে ছোটে। ব্যারিস্টার রায় কি ভাবে প্লিড করেন দেখতে হবে। অনেকদিনের অভিজ্ঞ যোদ্ধা তিনি। ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসেন। জজ সায়েব মৃদু হাসিতে তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি বুঝতে পারেন, সোজা মামলা নয়। একমনে সুব্রত অন্যপক্ষের বক্তৃতা শুনে যান। জুনিয়রকে ফিসফিস করে কিছু হয়তো বলেন। জুনিয়র সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে একটি বই-এর মধ্যে কি যেন খুঁজতে থাকে, তারপর বইটা এগিয়ে দেয় তাঁর সামনে। পড়া শেষে আত্মপ্রসাদের হাসি দেখা যায় তাঁর মুখে। বই-এর পাতার নম্বর কাগজে লিখে রাখেন। অন্যপক্ষ কোনো অস্ত্র ছাড়লে একমুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ বুজে যায়। মনের গহনে কিসের অনুসন্ধান চলে। অনেক যুক্তির অস্ত্র সেখানে থরে-থরে সাজানো। সুব্রত রায় তারই একটি তুলে নেন।

দিনের শেষে হাতে মোটা অঙ্কের চেক আসে। এটর্নি ধন্যবাদ দেয়, মক্কেল কৃতজ্ঞতায় হাত চেপে ধরে। ব্যারিষ্টার রায় হাত ছাড়িয়ে নেন। না না, এসব তাঁর ভালো লাগে না। মক্কেলের জন্য নয়, নিজের জন্যই তিনি পরিশ্রম করেন, কেমন একটা অদ্ভুত জিদ চেপে বসে? ন্যায় অন্যায় যাই হোক, জিততে হবে।

রেম্পিনি সায়েবও তাই বলতেন, তখন বিশ্বাস হয়নি। আমাদের পেশা ষাঁড়ের লড়াই-এর মতন। গোঁ চাই। বেপরোয়া হতে হবে। টাকা নিয়ে তুমি অপরের হয়ে লড়াই-এ নেমেছো;

চোখ বন্ধ করে শিং উঁচিয়ে সামনে ছুটে যাও, আঘাত করো। জিতলে ধন্য-ধন্য পড়ে যাবে, হারলে কেউ চেয়ে দেখবে না।”

ব্যারিস্টার রায় ক্লান্তি অনুভব করেন। সারাজীবন তাঁকে শুধু জিততে হবে, একের পর এক হারাতে হবে বিপক্ষকে। কেস্-ল খুঁজতে হবে, যুক্তির শানিত অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করতে হবে অপরপক্ষকে। বিশ্রাম নেই, মুক্তি নেই। জ্ঞানদা সুন্দরী দাসী ভারসেস চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদা সুন্দরীকে জেতাতে হবে। পরেই মোহনলাল ভারসেস ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া। প্রমাণ করতে হবে ভারত সরকার সংবিধানের অমুক উপধারার বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

সব কিছু মনে রাখতে হলে ব্যারিস্টার রায় এতোদিন উন্মাদ হয়ে যেতেন। সে-কথা রেম্পিনি সায়েব অনেক আগেই বলেছিলেন? “সুব্রত, এ-লাইনে বড়ো হতে হলে অনেক কিছু মনে রাখতে হবে। অনেক কিছু নখাগ্রে চাই। কিন্তু ভুলতেও হবে অনেক কিছু। ভুলবার জন্য সাধনা করতে হবে। যা কিছু অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক, স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে হবে।”

তখন সুব্রত রায়ের বয়স অনেক কম। এই হাইকোর্টের বারান্দা দিয়ে রেম্পিনি কোর্টঘরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পুরনো মক্কেলের সঙ্গে দেখা। “গুড্ মর্নিং মিস্টার রেম্পিনি। সেবার শুধু আপনার জন্যে আমাদের জমিদারি রক্ষে পেয়েছিল। সাতদিন ধরে যে আশ্চর্য যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোনোদিন ভুলবো না।”

“না না, ও-সব বলে লজ্জা দেবেন না।” রেম্পিনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

কৌতূহলী সুব্রত রায়ের ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা হয়। “কোন্ কেস্‌টা স্যার?”

“মনে নেই!” রেম্পিনি নিস্পৃহভাবে বললেন।

“সে কি? সাতদিন ধরে কেস করেছিলেন, তার কিছু মনে নেই?”

“একটুও মনে নেই। মামলার রায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সব ভুলে যাই—নাম-ধাম, ঘটনা কিছুই মনে থাকে না, শুধু আইনের পয়েণ্টটি ছাড়া।” রেম্পিনি সায়েব পিছনে ফিরে সুব্রতকে

আরও বলেছিলেন, "তোমাকেও ভুলতে হবে। না ভুলতে পারলে বড়ো হতে পারবে না।"

ভুলতে-ভুলতে সুব্রত রায় আজ জীবনের সকল আনন্দই ভুলতে বসেছেন। কী আছে সুব্রত রায়ের জীবনে? সুব্রত রায় ব্যারিস্টার—কিন্তু শুধুই ব্যারিস্টার, অপর পাঁচজনের মতো মানুষ নয়। সংসারের কর্তা নয়, প্রেমময় স্বামী নয়, স্নেহময় পিতা নয়। শুধু অর্থোপার্জনের যন্ত্র মাত্র। সুব্রত রায় ভাবেন এর থেকে সাধারণ চাকরি অনেক ভালো, দশটা-পাঁচটার বাইরে তারা মানুষকে গিলতে আসে না।

•

ভোর পাঁচটায় ব্যারিস্টার রায়ের দিনের শুরু। সাড়ে পাঁচটায় চাকর যখন স্টোভ জ্বালিয়ে চা দিয়ে যায় মেয়েরা তখনও বিছানায়, দীপালিও ঘুমে অচেতন। নিদ্রাপর্ব শেষ করে দীপালি যখন দৈনন্দিন জগতের কাজে হাজিরা দেন, সুব্রত রায় তখন অন্য জগতে। লাইব্রেরী-রুমে বই-এর অতলে তখন তাঁর সকল সত্তা নিমজ্জিত। আটটায় জুনিয়র আলোক সেনের গলার আওয়াজ শোনা যায়। তু'জনে আলোচনা চলে—সেকশন টোয়েন্টিথ্রি-এ, ইণ্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। পাশের র‍্যাক থেকে তিনি বই টেনে নেন।

ঠিক ন'টায় চাকর সামনে এসে দাঁড়ায়। একটু বিরক্ত হয়েই সুব্রত রায় তার মুখের দিকে তাকান। ইঙ্গিতে তাকে অপেক্ষা করতে বলে, তিনি আরও খানিকটা পড়ে যান। চাকরের হাতে ইট-রঙের তুটো ট্যাবলেট ও এক গ্লাশ জল। চাকর অধৈর্য হয়ে ওঠে। "আপকা ট্যাবলেট হুজুর"। ওষুধের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন সুব্রত রায়। মুখে জল নিয়ে ট্যাবলেট তুটো গলাধঃকরণ করতে করতেই তিনি ইলেট্রিক বেলে মৃত্থ চাপ দেন। আওয়াজ শুনেই পাঁচু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। পাঁচুকে বলেন, "ফাউলার ব্রাদার্সের মিস্টার মল্লিককে ডাকো।" ব্রীফের বাণ্ডিল হাতে মিস্টার মল্লিক এসে চেয়ারে বসেন। আলোচনা আরম্ভ হয়। কথাবার্তা জুনিয়র কাগজে ..ট করে। মিস্টার মল্লিক বিদায় নেন। অন্য এটর্নি আসে, কনসাল্টেশন চলে।

তারপর একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে চেয়ার থেকে উঠে পড়েন। কোর্টের সময় হয়ে গিয়েছে। অন্দরমহলে ছোটেন সুব্রত রায়। কোনো কথাবার্তা নয়। সোজা বাথরুম। সেখান থেকে খাবার ঘর। খুব সামান্য খেতে হয়, যতো সামান্য সম্ভব। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ—তেল নয়, ঘি নয়, মাংস বিষবৎ, চিনির সম্বন্ধ নেই। দীপালি সামনে দাঁড়ান, দু'-একটা কথা বলবার ছিল। কিন্তু এখন ওসব নয়, একটুও সময় নেই। মাথার মধ্যে আজকের কেস্‌টা গজগজ করছে, অন্য কিছু সেখানে ঢুকবে না। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দীপালি সাদা ব্যাণ্ডটা গলায় বেঁধে দেন। "একটু যেন বেঁকে রইলো," সুব্রত বলেন। দীপালি হেসে ফেলেন। আজ নয়, পঁয়ত্রিশ বছরে একদিনও সুব্রতর ব্যাণ্ডবাঁধা মনঃপুত হয়নি। দীপালির হাসি কিন্তু সুব্রতর নজরে পড়ে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই তিনি বলেন, "স্যরি অন্য সময় কথা কইবো। আজকে ফার্স্ট আওয়ারেই কেস্‌। পার্ট হার্ড ম্যাটার।" তারপর দ্রুতবেগে একতলায় নেমে আসেন।

রোভার গাড়িটা হাইকোর্টের ভিতর ঢুকে যায়। লিফ্‌ট-এ সোজা দোতলায় বার-লাইব্রেরী। ডেলি লিস্টে চার-পাঁচটা লাল দাগ দিয়ে রেখেছে পাঁচুগোপাল।

"গুড্‌ মর্নিং ব্রাদার," ব্যারিস্টার সুকান্ত সেন আসছেন।

"গুড্‌ মর্নিং।"

"তোমার ওই স্ত্রী-ধনের কেস্‌টা সুপ্রীম কোর্টে ঠেলছি।" সুকান্ত বললেন।

"তাই নাকি? মোস্ট ইণ্টারেস্টিং। দেখা যাক স্পেশাল বেঞ্চের ডিসিশন আপহেল্ড হয় কি না।"

সুকান্ত সেন সুব্রতর কলেজ-জীবনের বন্ধু। এক জাহাজে দু'জনে বিলেত গিয়েছিলেন। সুকান্ত গেল কেমব্রিজে, সুব্রত অক্সফোর্ডে। তারপর আবার দেখা লিঙ্কন্স ইন-এ। পাশ করে দু'জনে প্রায় একই সময়ে দেশে ফিরেছিল। সুব্রত একা, সুকান্ত স্ত্রীকে নিয়ে। মিসেস আগাথা সেন। আগাথার রূপ ও যৌবন দু'ই ছিল। সেদিন এক পার্টিতে আগাথার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কে বলবে এই আগাথাকে সুকান্ত বিয়ে করেছিল। কোথায় গেল সেই সোনালী চুল, দুরন্ত যৌবন আর চঞ্চল চোখের চাহনি।

পরে লজ্জা পেয়েছেন সুব্রত। বয়স কি তাঁদের কম হলো? পঁয়ত্রিশ বছর আগের আগাথা সেন আজও সেরকম থাকবে কী করে?

এই আগাথা একদিন লণ্ডন-প্রবাসী সুব্রতর মনেও দোলা লাগিয়েছিল। কিন্তু সুব্রত বিচক্ষণ তাই নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিল, দীপালির বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না। প্রতি সপ্তাহে যে দীপালির চিঠি এসেছে।

রেম্পিনি সায়েব প্রথমে শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন, "হোয়াট? তোমারও চাইল্ড ম্যারেজ?"

"না না স্যার, চাইল্ড ম্যারেজ নয়। বিলেতে যাবার ঠিক আগে আমাদের বিয়ে হয়।"

রেম্পিনি যেন আরও আশ্চর্য হলেন। "সার্টেনলি, ইউ ওয়ার নাথিং বাট এ চাইল্ড দেন।"

সুব্রত রায়ের আজও কেমন আশ্চর্য লাগে, লোকটাকে বাইরে থেকে একটুও বোঝা যেতো না।

সুকান্তর বাবা রায়বাহাদুর অবনী সেন এলিস অ্যাণ্ড সেন সলিসিটরের ছয় আনা অংশীদার। বিরাট আপিস, অনেক কাজ। এলিস সায়েবও কিছু চিরকাল থাকবেন না, তখন সব কিছু তাঁর। সুকান্ত সেনের কাজের ভাবনা! প্রথম থেকেই মাসিক হাজার টাকার ব্রীফের ব্যবস্থা।

সুব্রত রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে, বিলেত যাওয়াটাই সৌভাগ্য। ব্যারিস্টারি পাশ করেছে এই যথেষ্ট। বাবা আর কিছু পারবেন না। সেকেলে পরিবার, উপার্জনের আগেই সংসারের দায়িত্ব চাপিয়েছে। দীপালিকে যত্নে রাখতে হবে। দীপালি আলোকপ্রাপ্তা, বেথুনের ভালো মেয়ে। তবুও সে কেমন সেকেলে। আচার ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মায়ের মতন, আগাথা সেনের মতো নয়। দীপালির অনেক আশা, স্বামী ব্যারিস্টার। অথচ বেচারা জানে না, ওখানে দাঁড়ানো কত কঠিন, সাফল্য কত অনিশ্চিত।

তিন বছর সুব্রত রোজ কোর্টে এসেছে। দিনের শেষে ক্লান্ত

পদক্ষেপে বাড়ি ফিরলে দীপালি পায়ের মোজা খুলে, কোট নামিয়ে নিয়েছে। নরম হাতে গলার ব্যাণ্ড খোলার সময় চুড়ির আওয়াজে সুব্রতর চোখ বুজতে ইচ্ছা করে। মিঠে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার জাগে। কেমন করে দীপালিকে বলবে কোনো কাজ নেই, একটা ব্রীফও পাওয়া যায় না। দীপালি বুঝতে পেরে নিজেই বলে—"এই তো শুরু, ক্রমশঃ সব হবে। এখন থেকে ঝিমিয়ে পড়তে আছে নাকি?"

বেরোবার আগে লাল ব্যাগটাতে সে সব কিছু গুছিয়ে দেয় নিজের হাতে। ফ্লাস্কে গরম চা, কোনোদিন কফি, টফির কৌটায় খাবার। ব্যাগের এক কোণে সিগারেটের টিন। শাসনের সুরে দীপালি বলে, "গোনা ছ'টি সিগারেট আছে, তার বেশি খাওয়া চলবে না। সিগারেট খেয়ে কী যে আনন্দ পাও বুঝি না; আমার তো গন্ধেই গা ঘুলিয়ে ওঠে।"

সুব্রত আনন্দ পায়। কাছে ডেকে বলে, "একটা খেয়ে দেখো না। তখন আর বকতে ইচ্ছা করবে না।"

দীপালি রেগে যায়, "ভারি অসভ্য। মেয়েরা আবার সিগারেট খায় নাকি।"

"কেন খাবে না। সুকান্তর বৌ আগাথার রোজ একটা টিন লাগে।"

"বাঃ, উনি যে মেম।"

সুব্রত হাসিতে ফেটে পড়ে। "কী বুদ্ধি, মেমরা মেয়েমানুষ নয়!" রাস্তায় বেরিয়ে সুব্রত বিষণ্ণ হয়ে যায়। রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, সময় সব আছে, তবুও কিছু নেই। টাকা চাই। দীপালিকে ভালো ভালো কাপড় কিনে দেবে, নিজে ট্রাম ছেড়ে মোটরে যাবে। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে?

কৃতী ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ের আজ হাসি লাগে। টাকা! টাকা আছে যথেষ্ট। কিন্তু কোথায় গেল সে-সব দিন। আজকের সুব্রতর মাথায় অন্য কিছু নেই, শুধু প্লেন্ট, রিটন-স্টেটমেণ্ট, স্পেশাল বেঞ্চ, ফুল বেঞ্চ। দিনের শেষে যখন বাড়ি ফেরেন তখন ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। দীপালি আজও ব্যাণ্ড খুলে দেন। মেয়েদের দেখা নেই, তারা বাবার কাছে আসে না। বাবাকে ভয় করে দূরে

সরে থাকে। দীপালিকেও আজ অনেক দূরের দীপালি মনে হয়, গম্ভীর, নির্লিপ্ত।

"মীনার অনার্স পরীক্ষা আজ শেষ হলো," দীপালি বলেন।

"তাই নাকি? কবে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল?" এখানেই থেমে যেতে হয়। মীনার কোন্ বিষয়ে অনার্স তাও জানেন না তিনি। অভিনয় ধরা পড়ে যেতে পারে। সত্যি অন্যায়—সুব্রত রায়ের কপালের কুঞ্চন গভীর হয়। রেম্পিনি সায়েব ঠিকই বলেছিলেন, "এ-লাইনে সাধনার প্রয়োজন, সংসার পাতাও ঠিক নয়। তাতে হয় সংসার, না হয় তোমার প্রফেশন অবহেলিত হবে।" তখন সুব্রত হেসেছিল। আজ মনে হয় রেম্পিনি সায়েব বিয়ে না করে ভালোই করেছিলেন।

লাইব্রেরীতে যেতে হবে এখনি। সেখানে প্রবেশমাত্র সুব্রত সব ভুলে যাবেন। লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মতো তখন কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি। অপ্রাসঙ্গিক কিছু চোখে পড়ে না—গাছ নয়, গাছের ডাল নয়, এমন কি পাখির সর্বদেহ নয়, শুধু চোখ! বাড়ি নয়, গাড়ি নয়, দীপালি নয়, খোকন নয়, মীনা নয়, সুব্রতর সমস্ত মনোজগৎ ব্যাপ্ত করে কেবল কেস্ নম্বর ত্রিশ, অর্ডিনারি অরিজিন্যাল সিভিল জুরিসডিকশন।

রেম্পিনি সায়েবের নজরে পড়াটা ভাগ্যের লিখন। তিন বছরের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তিন বছরের মোট আয় একশ' পনেরো টাকা। লাইব্রেরীতে বই পড়ছিল ব্রীফলেস সুব্রত রায়। কাঁধে একটা হাত পড়লো, সুব্রত চমকে তাকায়। মিস্টার উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনি, দোর্দণ্ড ব্যারিস্টার। রেম্পিনি তাকে চেম্বারে দেখা করতে বলে চলে গেলেন।

রেম্পিনির চেম্বারে। তিনি সুব্রতকে বলেছিলেন, "যখনই লাইব্রেরীতে যাই, দেখি তুমি পড়ছো। আমার খুব পছন্দ। আমার চেম্বারে কাজ করবে?"

"এ আমার পরম সৌভাগ্য," সুব্রত উত্তর দিলো।

"ইয়ংম্যান, সৌভাগ্য বলে কোন কথা আমার ডিকশনারিতে নেই। পরিশ্রম ও একাগ্রতাই সব।"

টেম্পল চেম্বারের দোতলা। ঘরের বাইরে লেখা ডব্লিউ.

ডি· রেম্পিনি, বার-এট-ল। ভিতরে দেওয়াল দেখা যায় না, অসংখ্য বই-এর সারি। মধ্যিখানের বিরাট টেবিলেও ডজনখানেক বই ছড়ানো। একদিকে মস্ত চেয়ার, কোন যুগের কে বলবে। রেম্পিনি সায়েব বলেন, "এটি লাইব্রেরী নয়, আমার গবেষণাগার।"

রেম্পিনির কাজ নয়তো, সাধনা। খ্যাতি ও অর্থ সে সাধনায় শৈথিল্য আনেনি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মামলায় জিততে হবে। বই-এর পর বই পড়ে যান তিনি। নথিপত্রের প্রতিটি লাইনে স্বপক্ষে যুক্তির অনুসন্ধান চলে।

সুব্রত রেম্পিনির সামনে বসে থাকে। রেম্পিনি বলে যান, সুব্রত লিখে চলে। টাইপিস্ট দিয়েও কাজ হয়, কিন্তু রেম্পিনি বলেন, "কাজ শিখতে হলে একেবারে নিচু থেকে শুরু করা প্রয়োজন।"

বই-এর ভিতর মুখ রেখে রেম্পিনি বলেন, "ফিফটিন হলসবেরী।" সুব্রত আলমারি থেকে বই বার করে, দু'বার ফুঁ দিয়ে কিছুটা ধুলো তাড়িয়ে সেটা এগিয়ে দেয়। অতি সাবধানে রেম্পিনির হাত থেকে অন্য বইটি বার করে নিতে হয়। রেম্পিনি যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়া চলেছে। কখনও চোখে ক্লান্তি নামে। চশমা মুছতে-মুছতে তিনি বলেন, "সুব্রত···।" সুব্রত বুঝতে পারে। রেম্পিনির হাত থেকে বই নিয়ে নিজেই পড়তে আরম্ভ করে। রেম্পিনি চোখ বুজে শোনেন, আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয় সুব্রতর। বেচারা দীপালিকে একলা থাকতে হয়। পায়ের শব্দে দীপালি ছুটে আসে, কিন্তু কোনো কথা বলে না।

কিন্তু রেম্পিনি সায়েব কি পাগল ? বলেন, কোর্টে যেতে হবে না, শুধু চেম্বারে বসে কাজ করো। তিনবছর কেস্ নিতে পারবে না, এটর্নি হাতে ব্রীফ গুঁজে দিলেও না। সাধনায় নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে প্রথমে।

"কিন্তু সংসার চলবে কেমন করে ?"

"চাইল্ড ম্যারেজ বুঝি ? যা হোক, সে ভাবনা আমার। প্রতি মাসে একশ' টাকা পাবে। অনুগ্রহ নয়, চেম্বারে আমার কাজের পারিশ্রমিকরূপে।"

একদিন লাঞ্চের সময় রেম্পিনি বললেন, সুব্রত, তোমাকে যেন রোগা রোগা দেখাচ্ছে।"

"না, কই ?

"আমার নজর এড়ায় না। যুদ্ধ করতে হলে ভালো শরীরের প্রয়োজন, বুঝেছো ইয়ংম্যান।" রেম্পিনি নিজের লাঞ্চ দু'ভাগ করেন।

"না না, সে হয় না। আপনার খাবার···"

"বুড়োদের কম খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবাধ্য হতে নেই।"

গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিয়ে যান যতো গোপন অস্ত্র। আইনের রহস্য খুলে ধরেন সুব্রতর সামনে।

একদিনের কথা। রাত হয়ে গিয়েছে, বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে। টাউন হলের দিকে বড়ো জানলা দিয়ে গড়ের মাঠের হিমেল হাওয়া বয়ে আসছে। রেম্পিনি কেস্-ল খুঁজছেন। ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান মিলছে না। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সুব্রতর ভালো লাগে না। বেচারী দীপালি তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছে। গোলাপী মুখটি হয়তো শুকিয়ে গিয়েছে। একা হয়তো ভয় লাগছে। কয়েক গাছি অবাধ্য দুষ্টু চুল হয়তো মুখের ওপর এসে পড়েছে। মনে হয়, পাগলা সায়েবটাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু দীপালি বারণ করবে, মনের দুঃখ চেপে রেখে বলবে, "তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। আমি কি আর সেই ছোটো খুকীটি আছি যে, ভয় পাবো।"

রেম্পিনি মোটা-মোটা বই-এর ভিতর কেস্-ল খুঁজছেন। সুব্রতকেও কয়েকটা বই দিয়েছেন, কিন্তু তার মন বসছে না কিছুতেই। দীপালি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত ন'টা। রেম্পিনি বললেন, আর খুঁজতে হবে না। পেয়ে গিয়েছি। মোস্ট্ ইম্পর্টাণ্ট ডিসিশন।"

ভালো লাগছিল না সুব্রতর। খুঁজে না পেলে রেম্পিনি হয়তো সারারাত বই-এর পাতা উল্টাতেন। কাজের নেশা ঘুমের বালাই থাকে না লোকটার।

বই-এর নম্বরটা কাগজে লিখতে-লিখতে রেম্পিনি বললেন, "অনেক দেরি হলো, আই এম স্যরি। কিন্তু এইভাবেই নজির খুঁজতে হয়।"

"খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতন অবস্থা।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুব্রতর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো।

হঠাৎ কেমন যেন হয়ে পড়লেন রেম্পিনি। সুব্রতর মুখের দিকে তাকালেন। পাইপ ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঘরের সিলিঙের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, "তা সত্য। কিন্তু পেয়েছিলাম। খড়ের গাদা থেকেই খুঁজে পেয়েছিলাম হারিয়ে যাওয়া ছুচ।"

সুব্রতর কাঁধে হাত রাখলেন রেম্পিনি। "সেইদিন আমার অন্ধকার জীবনে সূর্যের উদয় হলো। ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিলেন।

"স্যার হেনরী লং-এর দীর্ঘ দেহ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।" পাইপটা টেবিল রাখলেন রেম্পিনি। "অনেক নিচু থেকে আমি এসেছি।"

চোদ্দ বছরের ছেলে উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনি বেয়ারার কাজ করে স্যার হেনরী লং-এর চেম্বারে। চা আনা, টেবিল মোছা, বই-এর ধুলো ঝাড়ার কাজ। স্যার হেনরী লণ্ডনের প্রখ্যাতনামা ব্যারিস্টার। তাঁর পাঠাগারে অসংখ্য বই। কিশোর রেম্পিনির অসীম কৌতূহল। বই পড়তে বড়ো ভালো লাগে।

সকলের আগে চেম্বারে যায় সে। স্যার হেনরী আসবার আগেই টেবিল চেয়ার মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। ঢেকে রাখতে হয় এক গ্লাশ জল। মনের আনন্দে বই পড়ার এই সুযোগ। ধুলো ঝাড়ার সময় মোটা-মোটা আইন বই-এর পাতায় সে চোখ বোলায়। পায়ের আওয়াজ হলেই সভয়ে বই বন্ধ করে আবার ধুলো ঝাড়তে আরম্ভ করে। প্রতিমাসে অনেকগুলো আইন পত্রিকা আসে! খাম ছিঁড়ে মলাটের উপর রবারস্ট্যাম্প তাকেই বসাতে হয়। স্যার হেনরীর টেবিলে সেগুলো দেবার আগে সে নিজের কৌতূহলের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়। যখন স্যার হেনরী এটর্নি ও মক্কেলদের সঙ্গে কেসের আলোচনা করেন, সুইং ডোরের আড়াল থেকে রেম্পিনি আগ্রহে কান পেতে থাকে। অনেক অজানা শব্দ ভেসে আসে, না বুঝলেও ভালো লাগে।

সেদিন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। স্যার হেনরী তখনও চেম্বারে কি যেন খুঁজছেন। সাধারণতঃ যেতে এতো দেরি করেন না তিনি। বাইরে টুলে বসে রেম্পিনি সময় গুনছে। দূরে ঘড়িটা রাতের বার্ধক্য ঘোষণা করলো। রেম্পিনি ভিতরে তাকিয়ে দেখলো, স্যার হেনরী তখনও বই খুঁজছেন। দু'জন জুনিয়র সন্ত্রস্ত হয়ে বই ঘাঁটছেন। একের পর এক বই টেনে অনুসন্ধান চলছে। নাঃ, কোথায় সেই নজির। স্যার হেনরী পাগলের মতো বই-এর পাতায় খোঁজ করছেন। পরমুহূর্তে হতাশ হয়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন বইটা। কত দেরি হবে কে জানে? রাত আরও বাড়ে।

জুনিয়র অবশেষে বললে, "স্যার, আমার মনে হয় এ-বিষয়ে আমাদের স্বপক্ষে কোনো নজির নেই।"

"নিশ্চয় আছে! আমার বেশ মনে আছে কোথাও পড়েছি।" স্যার হেনরী মাথার চুল টানতে-টানতে অভীষ্ট নজির বিষয়টা বিড়-বিড় করে বলতে লাগলেন।

হঠাৎ রেম্পিনির বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠলো। ভিতরে ঢুকে গেল সে। ভয়ে পা চলছে না। কয়েক পা পিছিয়ে এল সে। সাহস সঞ্চয় করে স্যার হেনরীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। উত্তেজনায় সর্ব শরীর কাঁপছে। তার দেহের ছায়া স্যার হেনরীর হাতের বই-এর উপর পড়েছে।

বিরক্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন স্যার হেনরী। "বাড়ি যেতে চাও? একদিনের সামান্য দেরি সহ্য হয় না।"

"না, না স্যার।"

"তবে কী জন্য আমার সময় নষ্ট করছো?"

রেম্পিনি রুদ্ধবাক।। দূরে র‍্যাকের লাল কাপড়ে বাঁধানো একখানি বই তাকে ডাকছে। কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে আকর্ষণ করছে ওই বইটার কাছে। এগিয়ে গিয়ে রেম্পিনি বইটা টেনে নিলো—টাইমস ল' রিপোর্টার।

"বলবো? বলবো স্যার?" রেম্পিনির কম্পিত হাতে বই-এর পাতা খুলে যায়। "এইটা—এইটা কি?"

"ইউরেকা, ইউরেকা" স্যার হেনরী চিৎকার করে উঠলেন। "এরই নিষ্ফল সন্ধানে চারঘণ্টা কেটে গিয়েছে।"

বেশ কিছুক্ষণ স্যার হেনরী কিশোর রেম্পিনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

স্যার হেনরীর ক্যাব লণ্ডনের অন্ধকারে মিশে গেল। রেম্পিনি অবাক। কিছু বকশিশ আশা করেছিল সে ; মনের সুখে ডিনার খাওয়া যেতো। কিন্তু বকশিশ তো দূরের কথা, একটা মিষ্টি কথাও নয়। মনটা তিক্ত হয়ে উঠলো।

পরের দিন স্যার হেনরী ডাকলেন, "উইলমট, তোমাকে এখনি একবার দর্জির দোকানে যেতে হবে।"

"আপনার কোনো সুট তৈরি করতে দেওয়া আছে কি ?"

"না না, আমার নয়, তোমার নিজের।"

"এ্যাঁ ?"

"দেরি নয়, এখনি চলো ! অনেক কাজ বাকী। আজই সব শেষ করে রাখতে চাই। টেবিল মোছা তোমার কাজ নয়, তুমি ব্যারিস্টার হবে।"

নিদারুণ কর্মব্যস্ততার মাঝেও জীবনের সেই পরম পুণ্য লগ্নটি আজও রেম্পিনিকে নাড়া দেয়। কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলির মাঝে। বহুবর্ষ আগের অফিস-বয় রেম্পিনি তাঁকে ডাকে, তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। এমন এক স্মৃতি-সলিলে অবগাহন মুহূর্তে রেম্পিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন সুব্রতর কাছে।

একনিষ্ঠ সাধনাই রেম্পিনিকে সাফল্যের সিংহদ্বারে বহন করে এনেছে, সে-কথা জেনেও সুব্রত নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে উৎসর্গ করতে পারে না। রেম্পিনি বলেন, "সংসার, সমাজ সব ভুলে কাজ করে যেতে হবে।"

ছুটির দিনেও নিষ্কৃতি নেই। খুব ভোরে বাড়িতে ডেকে পাঠান। কেসের আলোচনা, কিংবা কিভাবে জেরা হবে, সে বিষয় চিন্তা চলে। সুব্রতর যেতে ইচ্ছা হয় না। ছুটিতেও কাজ ? দীপালিকে কাছে বসিয়ে একটা দিন গল্প করাও চলবে না ?

ওই তো সুকান্ত সেন। কত মামলা তার হাতে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে নষ্ট হতে দেয়নি। আগাথা সেন দীপালিকে সেই কথাই বলে গেল গত রাতে। ডিনারে সুকান্ত ও আগাথা কত গল্প করলো।

পাহাড়ী ঝরনার মতো মেয়ে। বন্য স্বাস্থ্য, অদম্য জীবনীশক্তি। আগাথা বলে, "টাকার প্রয়োজন কেবল জীবনকে উপভোগের জন্য। সুকান্তর প্রাইভেট ও প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে একটা সরলরেখা টেনে ভাগ করে দিয়েছি।"

সুকান্ত বাড়ি ফিরে আগাথার সঙ্গে চায়ে বসে, গল্প হয়। রাত আটটার পর কোনো কাজ নয়। ঘড়ির বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত ভিতরে চলে যায়। এক জগৎ থেকে ফিরে আসে অন্য জগতে। রবিবারে আগাথাকে পাশে বসিয়ে সে মোটর চালায়। পিছনের সিটে টিফিন কেরিয়ারে খাবার, স্বামী-স্ত্রীর পিকনিক। মাঝে মাঝে আগাথা স্টিয়ারিং-এ বসে। স্পিডোমিটারে কাঁটার কম্পন ওকে ছেলেমানুষ করে তোলে। জোরে, আরও জোরে। হাওয়ায় আগাথার সোনালী চুলগুলো নাচছে। দু'জনে সিগারেট ধরায়, সঙ্গে মিহি সুরে কোন ইংরেজী গানের কলি। কলকাতা শহর পিছনে ফেলে ওরা ছুটে চলে যশোর রোড ধরে। বেলা এগোয়। গাড়ি থামে। লাল রঙের চাদর হাতে ওরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে। বন-বালিকার মতো আগাথা ছুটতে থাকে। দূরে পাখির ডাকের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় তার কলহাস্য। দু'জনে লুকোচুরি খেলে। ক্যামেরায় আগাথা ছবি তোলে। তারপর টিফিন কেরিয়ারের খোঁজ পড়ে। দু'জনে কাড়াকাড়ি করে খায়। সান গ্লাশের কাঁচ মুছতে-মুছতে আগাথা বলে, "বাব্বা, খেতে পারো বটে।" সুকান্ত উত্তর দেয়, "তুমিও কম যাও না।" "বটে? তিন ডজন স্যাণ্ডউইচ বুঝি আমি খেলাম?" দু'জনে হেসে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

আগাথার মুখ থেকেই দীপালি অবাক হয়ে শোনে। সুব্রত চুপ করে বসে থাকে। মনের ভিতর বাঁধন ছিঁড়ে আগাথাদের মতো বেরিয়ে পড়ার আহ্বানকে সজোরে দমন করতে হয়।

রেম্পিনি এসবের কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, "জানো হে সুব্রত, মোস্ট ইন্টারেস্টিং অ্যাফেয়ার।" সুব্রত ভাবে, কোনো মজার কথা নিশ্চয়, তাই আগ্রহে তাকায়। রেম্পিনি বলেন, "ট্রেডমার্ক অ্যাক্টের বাইশ ধারা সম্বন্ধে লর্ড ডানেডিনের……"

বেশ কিছুদিন কাটে। সুব্রতকে রেম্পিনি কোর্টে নিয়ে যেতে

আরম্ভ করলেন। পাশে বসে জুনিয়র সুব্রত রায় রেম্পিনিকে কাগজ এগিয়ে দেয়। কখনও সুব্রতর গাউন টেনে রেম্পিনি কানে কানে বলেন, "ব্যারিস্টার দাসের জেরা মন দিয়ে শোনো।" কখনও কোর্টে যাবার আগে জিজ্ঞাসা করেন, "বলো, এই কেসে আমাদের আর্গুমেণ্ট কোন্ লাইনে হবে।" সুব্রত তার বক্তব্য বলে যায়, তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তারপর মৃদু হেসে বলেন, "চলো কোর্টে যাই। আমার বক্তব্য সেইখানে শুনতে পাবে।"

আরও দিন যায়। রেম্পিনি নিজে না উঠে সুব্রতকে তুলে দেন। "জেরা করো।" সুব্রতর ভয় লাগে, গলা কেঁপে ওঠে। রেম্পিনি সাহস দেন। আস্তে আস্তে বলেন, "চমৎকার হচ্ছে। মোস্ট ইণ্টেলিজেণ্ট কোশ্চেন। এবার এইটা জিজ্ঞাসা করো।" কিছু পরে রেম্পিনি নিজেই হাল ধরলেন। অনভ্যস্ত সুব্রত স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

দিনের শেষেও ছুটি নেই, টেম্পল চেম্বারে বসে ব্রীফ পড়তে হয়। দীপালির নরম মুখটি তখন সুব্রতর মানস পটে ভেসে ওঠে। কিন্তু মোটা-মোটা আইন বইগুলোর হুমকিতে সে যেন ভয় পেয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো সুব্রতর মন থেকে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে একান্তে দীপালির পিঠে হাত রেখে সুব্রত খুব সহজ হবার চেষ্টা করে। সিনেমা থিয়েটারের সংবাদ নেয়, মিনি মাসি কেমন আছেন, দীপালির বান্ধবী অনুরূপা কবে আসছেন দিল্লী থেকে, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে।

দীপালি উৎসাহ পায়। "শুনছো, আজ আগাথা সেন ফোন করেছিল। ওরা বড়দিনে মোটরে নৈনিতাল যাবে, ফিরবে নববর্ষে।" দীপালি আর কথা বলে না, জিজ্ঞাসাও করে না কিছু। তবু সুব্রতর মনে হয়, দীপালি প্রশ্ন করেছে। ওর মুখের প্রতিটি রেখা সুব্রতর কাছে উত্তর চাইছে। আস্তে আস্তে সে বলে, "এবার কোথায় যাওয়া হবে না। রেম্পিনি সায়েবের বিপক্ষে একটা কেস্ পেয়েছি। ভালো করে তৈরি হতে হবে।"

বড়দিনে রেম্পিনি উপহার পাঠিয়েছেন। রঙিন সেলাফোন কাগজে মোড়া সুদৃশ্য বাক্স। দীপালিও ছুটে আসে, সায়েব কী দিয়েছেন? কাপড়? ড্রেসিং সেট? প্যাকেট খুলে দীপালি

মুখ কুঞ্চিত করে। বই। তাও আইন বই। সঙ্গের স্লিপে লেখা বইটি খুব মন দিয়ে পড়বে।

নতুন বছরে একই কোর্টে ছু'জন ব্যারিস্টার ঢুকলেন। একদিকে উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনি, অন্যদিকে সুব্রত রায়। রেম্পিনি সুব্রতকে দেখেও দেখতে পেলেন না। যেন কোনো পরিচয় নেই। কেসে সুব্রতকে প্রতি পদে বাধা দিলেন রেম্পিনি। বহু রাত্রি জাগরণে সুব্রত যে সব যুক্তি সংগ্রহ করেছিল নিষ্ঠুরভাবে তার প্রতিটি খণ্ডন করলেন তিনি। তারপর আপন যুক্তির শানিত বজ্রে আক্রমণ করলেন আপন শিষ্যকে। সে অগ্নিবর্ষণ প্রতিরোধের সাধ্য কি সুব্রত রায়ের। পরাজয় হলো সুব্রত রায়ের।· শোচনীয় পরাজয়।

দিনের শেষে ক্লান্ত সুব্রত টেম্পল চেম্বারে ফিরলো। রেম্পিনি পায়চারি করছেন। "সুব্রত, এমন সুন্দর কেসটা নষ্ট করলে? তোমার 'লিমিটেশন' পয়েণ্টটা নেওয়া উচিত ছিল, তাহলেই আমার কোনো পয়েণ্টই টিকতো না! ফাইভ কিংস বেঞ্চটা পড়লেই বুঝবে।" রেম্পিনি সম্পূর্ণ কেসটি আলোচনা করলেন। বললেন, "ভবিষ্যতে আরও সাবধানে কেস করবে।"

তারপরও কত মামলা হলো, যার একদিকে সুব্রত অন্যদিকে রেম্পিনি। প্রতিবার পরাজিত সুব্রত অবসন্ন মনে চেম্বারে ফিরে এসেছে। আর প্রতিবারই রেম্পিনি রেগে বলেছেন, "সুব্রত, হারা উচিত হয়নি।" কেস্-ল দেখিয়েছেন তিনি। সুব্রত চুপ করে শুনছে।

গোঁ চেপে গিয়েছে সুব্রতর। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে আসতে চায়। বারবার হারলে চলবে না। জিততেই হবে তাকে! দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজ করে যায়। মামলার গভীরে যাবার চেষ্টা করে। মনে এখন অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। দীপালিরও নয়।

কোর্ট থেকে ফিরে ব্রীফ নিয়ে বসে সুব্রত; দীপালি পাশে এসে দাঁড়ায়। সুব্রত ব্রীফের পাতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়।

"ওগো শুনছো।"

জীবনে এই প্রথম দীপালির উপস্থিতি অস্বস্তিকর মনে হয়। সান্ধ্য-স্নানের পর দীপালির দেহে মোহময় সৌগন্ধও সুব্রতর প্রাণে সাড়া জাগায় না।

"চলো না, শ্যামবাজারে বাবাকে দেখে আসি। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। বাবার শরীরও ভালো নয়।"

দীপালির কথা সুব্রতর কানে যায়, যেন বহুদূর হতে উচ্চারিত একটি ক্ষীণ কণ্ঠ। সুব্রতর মস্তিষ্কে তাতে কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না। পড়া শেষ করে সুব্রত বলে, "কী যেন বলছিলে?" উত্তর না পেয়ে সুব্রত চেয়ে দেখে দীপালি নেই। অনেক আগে সে উঠে গিয়েছে। সুব্রতর ইচ্ছা হয় দৌড়ে গিয়ে দীপালিকে জড়িয়ে ধরে। বলে, "চলো কোথায় যেতে হবে, হুকুম করো।"

কিন্তু এই দুর্বলতা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থায়ী হয়। রেম্পিনি সায়েব ভেসে ওঠেন চোখের সামনে—"কাজ করে যেতে হবে। সব কিছু ভুলে কাজ করে যেতে হবে।" দীপালির চিন্তা মুছে ফেলে সুব্রত আর একটা বই টেনে নেয়।

অবশেষে সেই দিন এল, যে দিনের জন্য সুব্রত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। যার জন্য দীপালিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যার জন্য কত নিদ্রাবিহীন রাত্রিযাপন, সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত উপস্থিত। জয় হয়েছে সুব্রতর, আপন শিষ্যের হস্তে পরাজিত হয়েছেন উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনি। আজ আর তিনি বকবেন না। বলবেন না, সুব্রত তোমার হারা উচিত হয়নি। বরং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবেন সুব্রতকে। তাঁর শিক্ষাদান সার্থক হয়েছে। লিফটের অপেক্ষা না করে সুব্রত টেম্পল চেম্বারের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল।

ভিতরে ঢুকেই সুব্রত কিন্তু থমকে দাঁড়ালো। রেম্পিনি একমনে বই পড়ছেন। সুব্রতকে দেখতে পেলেন না। গাউনটা খুলে রেখে সুব্রত নিজের চেয়ারে বসে পড়লো। তখনও রেম্পিনি নির্বাক হয়ে রইলেন। সুব্রতর সঙ্গে যেন কোনো পরিচয় নেই তাঁর। অস্বস্তি লাগে সুব্রতর, মনটা খারাপ হয়ে যায়। দু'-একটা সন্দেহের সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছে। দেওয়ালের বই-এর সারিগুলোর দিকে সে তাকালো। তারাও যেন ভয় পেয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছে। শুধু ঘড়িটা প্রগল্‌ভ শিশুর মতো আপন মনে বকে চলেছে! রেম্পিনি ডুবে রয়েছেন বই-এর ভিতরে।

সন্ধ্যা ছ'টা। সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। "গুড্ নাইট স্যার।"

বই থেকে মুখ না তুলেই রেম্পিনি বললেন, "গুড্ নাইট।"

পরের দিন কাজের শেষে রেম্পিনি ডাকলেন, "সুব্রত"।

এই ডাকের জন্যই তো সুব্রত অপেক্ষা করছিল। সারারাত যে তার ঘুম হয়নি। কিন্তু একি, রেম্পিনিকেও যেন চেনা যাচ্ছে না। একদিনে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। তিনি গম্ভীর, মিতভাষী ও বিমর্ষ।

"সুব্রত," রেম্পিনি থামলেন। তাঁর চিন্তা যেন এখনও শেষ হয়নি। "সুব্রত, আমাদের আর এক-চেম্বারে কাজ করা চলে না।" আর একটিও কথা বলেননি উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনি। বেদনাহত সুব্রত চমকে উঠলো। রেম্পিনি ততোক্ষণে চোখ নামিয়ে নিয়েছেন। তিনি আবার ঢুকে গিয়েছেন ব্রীফের মধ্যে।

সেদিন রাত্রে নিজেকে ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ মনে হলো সুব্রতর। সে যেন একা। এখন থেকে আইনের অন্তবিহীন আকাশে তাকে একাকী বিচরণ করতে হবে। দীপালিকে সব কথা বলতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সঙ্কোচ আসে। নিজের পেশার ব্যাপারে স্ত্রীকে ব্যস্ত করা কি উচিত হবে? আগাথা সেন স্বামীর প্রফেশনাল টক্ বরদাস্ত করেন না।

এই চিন্তার জালে সুব্রত হয়তো দিনে দিনে জড়িয়ে যেতো। কিন্তু কাজ আছে, অনেক কাজ। কোর্টে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এটর্নিরা দলে দলে ব্রীফ পাঠাচ্ছে। তারই মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে সুব্রত রায়।

সুব্রতকে ডুবে থাকতে হয় কাজের মধ্যে। এখন শুধু কাজ আর কাজ। রাত্রে ডিনারের পরও কাজ। ঘড়িতে দশটা বাজে, দীপালি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। বলে, "শোবে চলো।"

"এই, আর কয়েক মিনিট।"

"রাত যে অনেক হলো।"

সুব্রত দীপালিকে অনুসরণ করে। কিন্তু হাতে খানকয়েক বই। বিছানাতে বইগুলো নামিয়ে রেখে টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা সে জ্বালিয়ে দেয়। আর দীপালি অসহায়ভাবে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ ফুটে কিছুই সে বলে না।

সুব্রত রায়ের জগতের পরিধি আরও ছোটো হয়ে আসে। কাজ বাড়ার অনুপাতে সময় কমছে। সিনেমা থিয়েটার যাওয়া বন্ধ

হয়েছে অনেক আগেই। গল্পের বই পড়াও ছেড়ে দিতে হয়েছে, খবরের কাগজটাও রোজ দেখা হয়ে ওঠে না। এখন কেবল হলসবেরী, অল্-ই-আর, সি-ডবলু-এন, টি-এল-আর……।

একদিন সাজগোজ করে দীপালি এসে দাঁড়ালো। ঘিয়ে রঙের সিল্কের শাড়ি বেশ মানিয়েছে। "কি ব্যাপার?" সুব্রত জিজ্ঞাসা করলো।

"কেন গত শনিবার আগাথা সেন বার বার বলে গেল, টি-পার্টি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

"সে কি! আমার যে একদম মনে নেই। এদিকে দু'জন মক্কেলকে কথা দিয়েছি, তারা এখনি আসবে। খুব দুঃখিত।" দীপালি করুণ নয়নে চেয়ে থেকে চলে গেল।

এর পরেও তো কতদিন কাটলো। খোকন এসেছে সংসারে। বাবার স্নেহ কিছুটা সে পেয়েছে। অন্ততঃ রবিবারে খোকনের সঙ্গে খেলা করেছেন সুব্রত। তারপর যারা এসেছে বাবাকে দূর থেকে দেখেছে তারা। দীপালিই নাম রেখেছেন শিপ্রা। সুব্রত খোঁজ রাখেননি। এসেছে মীনা। সুব্রত খেয়াল করেননি। অরুন্ধতী, যার ডাক নাম ডলি, বাবার কাছে আবদার করেছে, "আমরা একা-একা পিকনিকে যাই। তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু।

"সময় নেই। ক্লায়েন্ট আসবে এখনি।" রসকষবিহীন হয়ে উত্তর দিয়েছেন সুব্রত রায়।

সংসারের খবর পাঁচুগোপাল তবু বলতে পারেন খানিকটা। কিন্তু তাঁর সায়েবের কিছু জানা নেই।

ব্যারিস্টার সুব্রত রায় মুখে সেদ্ধ গুঁজে যান। সব সেদ্ধ। তেল নয়, ঘি নয়, ডাক্তারের বারণ। খাওয়াটা নিতান্ত কর্তব্যবোধে। সামনে দীপালি। পঁয়ত্রিশ বছর প্রতিদিন সে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে আসছে। মেয়েরা কোথায়? না, সুব্রত রায় অযথা চিন্তায় সময় নষ্ট করবেন না। কালকে দুটো মামলা।

দীপালি খুব আস্তে বললেন, "খোকনকে চিঠি লিখবে না?"

"কেন, তুমি কি লেখোনি? লণ্ডনের আবহাওয়া এখন কেমন?"

"আমি লিখলেই শুধু হবে কেন ? তোমারই ছেলে বিদেশে—"

সুব্রত কথা শেষ করতে দিলেন না। "রবিবারে একবার মনে করিয়ে দিও।"

রবিবারে মনে করিয়ে দিয়েও যা হবে তা জানা আছে। দীপালি উত্তর দিলেন না।

বিবেকের দংশন সুব্রতকে জ্বালা দেয়, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। নিজের ছেলেকে চিঠি লেখা হয় না, মেয়েরা বাবাকে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে।

বহু দিনের পুরনো স্বরে সুব্রত হঠাৎ ডেকে উঠলেন, "দীপা চলো আজ গল্প করি। মীনা ও ডলিকে ডাকো।" ঠাকুরকে হাঁক দেন সুব্রত, "বাড়ির তরকারি একটু দিয়ে যাও, খেয়ে দেখি। রোজ রোজ সেদ্ধ ভালো লাগে না।" সুব্রতর মুখে কথার ফুলঝুরি। "একদিন সবাই মিলে সিনেমায় চলো।"

কিন্তু কেউ উত্তর দিচ্ছে না। দীপালি অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। বাবা হঠাৎ সিনেমার কথা বলছেন ! কেউ বিশ্বাস করছে না তাঁকে। কেউ এগিয়ে আসছে না। সবাই তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে। কিন্তু কেউ ভালোবাসে না।

দীপালি শেষে বললেন, "বেশ তো, ভালো কথা।"

নিষ্প্রাণ উত্তর। এরা আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, সুব্রতর মনে হলো। অভিমান জাগলো, কিন্তু প্রকাশ করলেন না তিনি। বিরক্তিও চেপে রাখলেন। বুঝতে পারছেন, এদের প্রাণ চাঞ্চল্যকে তিনিই তিলে-তিলে হত্যা করেছেন।

ঘড়ির দিকে তাকালেন সুব্রত রায়। পনেরো মিনিট অযথা নষ্ট হয়েছে। মনে পড়ে যায় আগামী কাল মামলা আছে। তোয়ালেতে হাত মুছে উঠে পড়লেন সুব্রত রায়।

লাইব্রেরী। টেবিল ল্যাম্পঃ কাছে টেনে নিলেন তিনি। পড়বার চেষ্টা করেও মাথায় ঢুকছে না কিছু। প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি সাংসারিক চিন্তা ভুলবার চেষ্টা করেন। কাদার মতো চিন্তাগুলো এতোদিন জলের তলায় থিতিয়ে ছিল। নাড়া পেয়ে হঠাৎ তারা ঘুলিয়ে উঠেছে, রঙ পালটিয়েছে জলের।

চেয়ারে বসে রেম্পিনি সায়েবের কথা মনে পড়ে যায়। শেষদিনের কথা। অনেকদিন আগেকার কথা। রেম্পিনি ডেকে পাঠিয়েছেন সুব্রতকে। কতদিন দেখা নেই দু'জনে।

"আমাকে ডেকেছেন ?"

"হ্যাঁ!" কিছুক্ষণ থেমে রেম্পিনি ডাকলেন, "সুব্রত"।

"বলুন।"

"আমি চলে যাচ্ছি।"

"সে কি ?"

"হ্যাঁ, ফিরে যাবো নিজের দেশ স্কটল্যাণ্ডে। একটা ছোটো কুঁড়ে ঘর কিনেছি সেখানে। অনেকদিন যুদ্ধ হলো, এবার অবসর। চাষ করবো নিজের হাতে, ফসল ফলাবো।"

উত্তর দিতে পারে না সুব্রত।

চেয়ার থেকে উঠে রেম্পিনি বললেন, "একটা কাজ আছে, সুব্রত। সেইজন্য তোমাকে ডেকেছি।" তারপর জামাকাপড়ের আলমারিটা খুললেন তিনি। অনেকগুলো কালো কোট ও গাউন ঝুলছে সেখানে।

"এই গাউনটা চেনো ?" রেম্পিনির হাতে এক জীর্ণ গাউন।

"নিশ্চয়ই। কতদিন আপনাকে দেখেছি কোর্টে পরে যেতে। দু'-একবার বলেওছি এতো ছেঁড়া গাউন ভালো দেখায় না। আপনি উত্তর দেননি।"

রেম্পিনি গাউনের দিকে আবার তাকালেন। পরম আগ্রহে দর্জির নামলেখা লেবেলটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন।

"তা সত্য, আমাকে মানায় না। এ-গাউন পরবার যোগ্যতা আমার নেই ; আমি অনেক ক্ষুদ্র।"

রেম্পিনির কথা সুব্রত ঠিক বুঝতে পারে না।

গাউনটা যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে তিনি বললেন, "সুব্রত তোমাকে আগে বলিনি। কেউ জানে না। এ গাউন আমার নয়।"

"এঁ্যা।"

গাউনটার উপর হাত বোলাতে-বোলাতে রেম্পিনি বললেন, "মৃত্যুর আগে স্যার হেনরী লং আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

প্রিয় শিষ্যকে কাছে ডেকে স্যার হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে কী দেবো উইলমট ?"

"আমার জীবনে সবই তো আপনার দান"—রেম্পিনি উত্তর দিলেন।

দীর্ঘদিনের রোগশয্যায় পাণ্ডুর বৃদ্ধ স্যার হেনরীর ঠোঁট তুটি কেঁপে উঠলো। "আমাকে আর কোর্টে যেতে হবে না। যে জীবন পিছনে ফেলে এসেছি, তার উত্তরাধিকারী তুমি।"

স্যার হেনরী তাঁর কালো গাউনটি বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। কম্পিত হাতে সেটি বার করলেন তিনি। বললেন, "এই নাও উইলমট।"

গুরুর দান মাথা পেতে নিয়েছিলেন রেম্পিনি। দীর্ঘকাল পরম শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে কালো গাউনটি রক্ষা করে এসেছেন তিনি।

সেদিন রাতে টেম্পল চেম্বারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রেম্পিনি সুব্রতকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। সজল চোখে সঁপে দিলেন কালো গাউনটি। বললেন, "যখনই কোনো কঠিন কেসে নিজেকে বিব্রত বোধ করবে, এই গাউন গায়ে দিয়ো।

বর্তমানে ফিরে আসেন সুব্রত রায়। তিনি ক্লান্ত। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমলে চলবে না। মামলার পয়েন্ট বার করতে হবে। সুব্রত রায় পায়চারি আরম্ভ করলেন।

রাত কত ? ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চমকে ওঠেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। সমগ্র পৃথিবী নিদ্রামগ্ন। বিজলী বাতিটাও বুঝি নিদ্রা-কাতর। ম্লান হয়ে এসেছে তার আলো।

আর ব্যারিস্টার সুব্রত রায় কেসের পয়েন্ট খুঁজছেন। কিন্তু মস্তিষ্ক শূন্য। কিছু মনে আসছে না। অব্যক্ত যাতনায় চুলগুলো ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

কী হবে ভেবে ? এখন নিদ্রা। অন্ততঃ কয়েকঘণ্টা শান্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু চোখের সামনে আগামী কালের কোর্টের দৃশ্য ভেসে ওঠে। ব্যারিস্টার স্যানিয়াল একের পর এক বাণ ছুড়ছেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। উত্তর দিতে

পারছেন না সুব্রত রায়। মাথা নিচু করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। না না, তা হয় না।

ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলে চলে। যক্ষ-পুরীতে বন্দী যেন সুব্রত রায়। চারিদিকে কলসী-কলসী মোহরের মতো মোটা-মোটা আইন বইগুলো জড়ো হয়ে রয়েছে। অনন্তকাল ধরে এই যখের ধন পাহারা দিতেই কে যেন তাঁকে মন্ত্রবলে বশীভূত করে রেখেছে। এই বন্দিশালা থেকে কেউ কি তাঁকে উদ্ধার করতে পারে না? ব্যারিস্টার রায় থমকে দাঁড়ান। দীপালি। হ্যাঁ। দীপালি পারে। সে আসবে। এখনই এসে বলবে, "রাত অনেক, শোবে চলো।"

ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলে চলে। না না, ভুল হয়ে গিয়েছে। দীপালি তো আসে না বহুদিন। অনেক বছর সে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ কিছু বলবে না সুব্রতকে। সারা রাত জেগে থাকলেও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।

দূরে টাঙানো গাউনটা হঠাৎ নজরে পড়ে যায়। মিশ কালো রঙ। কত পুরনো কে জানে। অনেক জায়গায় ছোটো-ছোটো ফুটো। রেম্পিনি সায়েবের গাউন। বহু দিনের সঙ্গী। যখনই কোনো জটিল মামলায় সন্দেহ জেগেছে, জেগেছে সামান্য ভয়, সুব্রত রায় পরম বিশ্বাসে তাকে অঙ্গে ধারণ করেছেন। বহু যুদ্ধের স্মৃতিমণ্ডিত বর্ম।

তাঁর দৃষ্টি গাউনের দিকে নিবদ্ধ। সেটি যেন ক্রমশঃ আকারে বাড়ছে। সুব্রত রায় ফিরে যেতে চান নিদ্রার ক্রোড়ে। কিন্তু একি! কালো গাউনটা যেন এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, ওই তো আরো কাছে এগিয়ে আসেছে। পালাতে হবে। তিনি দ্রুত কয়েক পা পিছু হটে এলেন। কিন্তু দরজা কোথায়? ডানদিকে তাকালেন তিনি। তারপর বাঁদিকে। কিন্তু দরজা নেই। শুধু বই। বই-এর দেওয়াল। ওই তো সুব্রত রায় দেখতে পাচ্ছেন তাঁর দেহকে নিঃশ্বাস রোধ করে হত্যা করা হচ্ছে। ওই তো তাঁর নিজেরই মৃত দেহ পড়ে আছে। বীভৎস, পঙ্কিল। হৃদয় নেই, প্রাণ নেই, শুধু বিশাল মস্তিষ্ক। ভিতরে কী সব গিজ-গিজ করছে হ্যাঁ পোকা, আইনের পোকা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। অন্ততঃ নিজের আত্মাকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু নিষ্ফল প্রচেষ্টা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা জগৎ-সংসারকে বিলুপ্ত করে ঐ কালো গাউন আরও এগিয়ে আসছে।

ধীরে-ধীরে বিজলী বাতির স্তিমিত আলোকে, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর অলক্ষ্যে ঐ হিংস্র, কুৎসিত, বিশাল দানব-পক্ষী তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ বিস্তার করে সুব্রত রায়ের সকল সত্তা গ্রাস করতে ছুটে আসছে।

বার-লাইব্রেরীর সামনে বাবুদের বেঞ্চিতে বসে এই গল্প যিনি বলছিলেন, তিনি চুপ করলেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ছোকাদা বেঞ্চির কোণ থেকে আরও কাছে সরে এলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে বিড়িতে আগুন ধরালেন। তারপর বললেন, "ওই কালো গাউনের মোহ বহু ব্যারিস্টারকে সংসার থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে ছোকাদা আবার বললেন, "ওরে আমাদের সায়েবদের আসল বিয়ে ওই কালো গাউনের সঙ্গেই।"

আমার টেম্পল চেম্বারে আসবার পর সায়েব যে সব মামলা করছিলেন তার বিষয় বিভিন্ন। রেল কোম্পানির সঙ্গে কয়েকটা মামলা সাত-আটদিন ধরে চললো। গাদা-গাদা কাগজ টাইপ করেছি, কিন্তু বিষয় এতোই নীরস যে, হাঁপিয়ে উঠেছি। রেল কোম্পানির পর এক ট্রেডমার্কের কেস্, আরও নীরস আরও জটিল।

তারপর একদিন চেম্বারে এলেন লেডী টাইপিস্ট হেলেন গ্রাবার্ট।

হেলেন সুন্দরী না হলেও কুৎসিত নয়। শ্যামাঙ্গী। হাতে অতি-আধুনিক রুচির ভ্যানিটি ব্যাগ। মুখে কয়েকটা ছোটো ছোটো কালো দাগ। ঠোঁটের রঙ লিপস্টিকের কল্যাণে মা-কালীর জিভের মতো লাল। পরিচ্ছন্ন বেশবাস। স্কার্টের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিংবা স্বচ্ছতা শালীনতার আইন লঙ্ঘন করেনি।

সায়েবের অনুমতি নিয়ে হেলেন সিগারেট ধরালো। রাঙা ঠোঁটে সাদা রেড এ্যাণ্ড হোয়াইট সিগারেট বিশ্রী দেখায়।

হেলেনের হাসি যেন কেমন লাগে। মনে হয়, শয়তানীতে ভরা। সারা দেহের কোথাও যেন স্নেহ মমতা নেই।

হেলেন গ্ বার্ট মামলা করতে চায়, ক্ষতিপূরণের মামলা। কে একজন তাকে বছরখানেক প্রেম নিবেদন করে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়, এখন তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। হেলেনকে সে ছাড়তে চায়, কিন্তু হেলেন তাকে ছাড়বে না। জলে নেমে পিছিয়ে আসা চলবে না। আসতে হলে কিছু খরচ করতে হবে।

হেলেন হি-হি করে হাসে। দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের মামলা করবে সে। ব্রীচ অফ প্রমিস অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মামলা। সেইজন্যই ব্যারিস্টারের কাছে আসা।

হেলেনের হাসিতে আমার কেমন ঘৃণা বোধ হয়। প্রেমের পথে এতো চোরাবালি কে জানে? তারই সুযোগ নিয়ে হেলেন কাউকে শোষণ করতে চায়। হেলেনের এককালের মনের মানুষ সুরজিৎ রায়ের জন্য দুঃখ হয়। বেচারা বোধ হয় পার্ক স্ট্রীটের উত্তরের জগতের আসল রূপটি জানে না; তাই জালে পড়েছে। হেলেন এখন সেই জাল গুটোতে চায়। কোর্টে মামলা করে দশ হাজার টাকা শুষে নেবে সে। চেম্বারে আসার আগেই বা কত নিয়েছে কে জানে!

ব্রীচ অফ প্রমিসের মামলা এদেশে বড়ো একটা হয় না। বিলেতে অবশ্য ভুরি-ভুরি মামলা হয় এই নিয়ে। আইনের চোখে বিয়ে এক ধরনের কণ্ট্রাক্ট, একটা চুক্তি। কণ্ট্রাক্ট আইনে চুক্তি ভঙ্গ হলে চুক্তি ভঙ্গকারীকে খেসারত দিতে হয়। কোনো ভদ্রলোক হয়তো একটি মেয়েকে বললেন, তোমায় বিয়ে করেবো। মেয়েটি যে মুহূর্তে সম্মতি জানালেন, অমনি দু'জনের মধ্যে আইনের চোখে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল। পরে ভদ্রলোকটির যদি মত পরিবর্তন হয় এবং পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তাহলে ভদ্রমহিলা খেসারত আদায় করতে পারেন।

হেলেন গ্ বার্টও ক্ষতিপূরণ চায়:—

গুরুতর মানসিক আঘাত	৫,০০০৲ টাকা
সমাজে সম্মানহানি	৩,০০০৲ ,,
ভবিষ্যতে অন্য স্বামী লাভের অসুবিধা	২,০০০৲ ,,
	মোট ১০,০০০৲ টাকা

এ হিসেব হেলেনের নিজের তৈরি। সুরজিত রায়ের প্রত্যাখ্যানে রাতে তার ঘুম হয় না। ডাক্তার বলেছেন, এ গুরুতর নার্ভের ব্যাধি, তীব্র মানসিক আঘাতের ফল। এমন ক্ষতির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অতি সামান্য।

সমাজে অনেকে জেনেছে, হেলেন গ্রুবার্ট সুরজিৎ রায়ের বাগ্‌দত্তা, শীঘ্র ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে ঘর করবে। বান্ধবীরা তাই জানে, মায়ের বন্ধুরাও তাই শুনেছেন। এলিয়ট রোডের সোসাইটিতে একথা কারও অজানা নয়। সবাই জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে? সে সমাজে হেলেনের মানহানি হয়েছে। এর জন্য তিন হাজার খুবই ন্যায়সঙ্গত। অন্ততঃ হেলেনের মত তাই।

ভবিষ্যতে বিয়ের বাজারে তার স্বামী পাওয়া শক্ত হবে। সুরজিতের জন্য কত ছোকরাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। দরকার হলে তাদের নাম দিতে পারে হেলেন। জন ফিলিপস, বব ডিক্সন, লায়নেল ডিকোস্টা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে রাজী। এদের যে কোনো একজনকে সে বিয়ে করতে পারতো, কিন্তু সুরজিতের জন্য সব নষ্ট হয়েছে। হেলেন গ্রুবার্ট নেহাত দয়াপরবশ হয়ে, এই ক্ষতির জন্য দু'হাজারের বেশি চাইছে না।

মুখে একটু হাসি জাগিয়ে রেখে সায়েবকে হেলেন এসব বোঝাতে চেষ্টা করছে! সেই হাসি আমার নোংরা মনে হয়েছে। আরও খারাপ লেগেছে হেলেনের বুড়ী মাকে। মায়ের রঙ কাজল কালো। বয়সের স্রোতে গায়ের চামড়া কুঁচকে কিশমিশের মতো দেখালেও, রুজ ও লিপস্টিক ব্যবহারে আগ্রহ কমেনি। হাতের অনাবৃত অংশে তেলের অভাবে খড়ি উঠেছে। বুড়ীর একটি পা বোধ হয় অন্যটি অপেক্ষা সামান্য ছোটো। তাই চলার সময় দেহটা বেঁকিয়ে হাতের লাঠিটা এগিয়ে দিতে হয়। তার আগ্রহ ও উৎসাহ মেয়ের থেকে অনেক বেশি।

মিসেস গ্রুবার্ট মেয়ের কাছেই থাকে, মেয়েকে আগলে বেড়ায়। বুড়ী হলদে দাঁতগুলো বার করে সায়েবকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, টাকার পরিমাণটা কিছু বাড়ানো যায় কি না।

হেলেন গ্রুবার্টের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনে সায়েব বললেন,

"কেসের জন্য প্রমাণ চাই। সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। সুরজিৎ রায় যে সত্যি বিয়ে করতে চেয়েছিল, তারও প্রমাণ দিতে হবে।"

বুড়ী মিসেস গুবার্টের মুখে একগাল হাসি। "হুঁ-হুঁ আমি আগে থেকেই জানি। যেদিন থেকে ও-ছোঁড়া হেলেনের পিছনে ঘুরছে, সেদিনই হেলেনকে বলেছিলাম, চিঠিপত্র কিছু হারিও না, যত্ন করে রেখে দিও। ওসব কাগজপত্র কখন দরকার লাগবে, কেউ জানে না।"

হেলেনের ভ্যানিটি ব্যাগটা ফুলে রয়েছে। ব্যাগের বোতাম টেপার আওয়াজ হয়। হেলেনের নধর নরম হাতখানি ব্যাগের ভিতর ঢুকে গেল। ভিতরে একরাশ চিঠির বাণ্ডিল। প্রিয়া হেলেনকে লেখা সুরজিৎ রায়ের চিঠি।

স্থিরভাবে হেলেন চিঠিগুলো সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলো। সন্ধানী দৃষ্টিতেও হেলেনের মধ্যে কোনো সঙ্কোচের ভাব আবিষ্কার করতে পারলাম না। পয়সার জন্য ওরা সব পারে, আমার মনে হলো।

"চিঠিগুলো পড়ে দেখবেন," এই বলে হেলেন ও তার মা সেদিনের মতো বিদায় নিলেন। মা ও মেয়ের হাই-হিল জুতোর খট খট আওয়াজ লিফটের কাছে এসে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে সায়েব আমাকে ডাকলেন। চিঠির বাণ্ডিলটা তাঁর সামনে পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন, "অসম্ভব। এ হাতের লেখা পড়তে গেলে মাথা ধরে যাবে। তুমি বরং আস্তে-আস্তে চিঠিগুলো টাইপ করে দাও। তারপর আমি পড়ে দেখবো।"

খান পঞ্চাশ চিঠি। টাইপরাইটারটা ডানদিকে সরিয়ে দিয়ে চিঠিগুলি রাখলাম। প্রতিটা চিঠি টাইপ করতে হবে।

একটি প্রেম-কাহিনীর সম্পূর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এই চিঠির জঙ্গলে। কল্পনার স্টেথিস্কোপে আজও শোনা যেতে পারে তুটি যুবক-যুবতীর উষ্ণ প্রাণের স্পন্দন। নীল কাগজে ছোটো ছোটো হরফে লেখা সুরজিতের চিঠি। ওগুলো এখনও চিঠি—একজনকে লেখা এক যুবকের একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি। আমি তাদের নকল করবো। একজনের পরম বিশ্বাসে লেখা চিঠির মৃত্যু

হবে। ব্যারিস্টারের ব্রীফের ভিতর পড়ে থাকবে তাদের মৃতদেহ। কোর্টের কেরানী নাকে চশমা লাগিয়ে চিঠির উপরে কালো কালিতে লিখবে এগজিবিট নম্বর অমুক।

কিন্তু সুরজিত রায়ের হস্তলিপির পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব। প্রতি কথা বুঝে টাইপ করতে হলে তিন দিন লেগে যাবে। টেলিফোন তুলে নিলাম। হেলেনের ফোন নম্বর জানা আছে। তাকে বললাম "মিস্ গ্রবার্ট, আপনার চিঠির বাণ্ডিলের অনেক কথা পড়তে পারছি না। কখন আপনার সময় হবে?"

হেলেন বললেন, "এখনি যাচ্ছি। আমার আজ বিশেষ কাজ নেই।"

আধঘণ্টার মধ্যে হেলেন টেম্পল চেম্বারে উপস্থিত হলো জামা কাপড়ের বাহারটা আজ একটু বেশি। উগ্র সেণ্টের গন্ধ। ঘামে পিঠের কাপড় ভিজে উঠেছে। হেলেনকে দেখে বললাম, "এমন দুর্বোধ্য হাতের লেখা সহজে চোখে পড়ে না।"

ফিক করে হাসলো সে। বললে, "আমার কিন্তু মোটেই আটকায় না। আমি বসে থাকবো। আপনি টাইপ করে যান। আটকালেই বলে দেবো।"

টেবিলের অন্যদিকে চেয়ারে বসলো সে। জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার সায়েব কোথায়?"

"কোর্টে গিয়েছেন।"

"স্মোক করতে পারি?" সিগারেটের একটা দিক টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে হেলেন জিজ্ঞাসা করলো। অনুমতি পাবার আগেই সে সিগারেট লাইটারটা বার করে ফেলেছে। শুধু আগুন ধরাবার অপেক্ষা।

সেণ্ট ও সিগারেটের গন্ধ মিশিয়ে নাকে আসছে। চিঠির বাণ্ডিলের দিকে নজর দিলাম।

সুরজিতের চিঠি নীল কাগজের প্রথম পাতায় শেষ হয় না। পাতার পর পাতা চলে একই চিঠি। চিঠি থেকেই তুলে দিই।

> "...আমার দুষ্টু মেয়ে, এ-চিঠি চারের পাতায় পড়লো। টেবিলে বসে লিখতে হলে অনেক আগেই তোমার নরম ঠোঁটের উদ্দেশে একটি চুমা জানিয়ে ইতি

টানতাম। কিন্তু বিছানায় আধশোয়া হয়ে নিশীথ রাতে চিঠি লেখায় সত্যি রোমাঞ্চ জাগে। সারা রাত আমি লিখে যেতে পারি, পাতার পর পাতা, যে-চিঠির আদি আছে, অন্ত নেই। শুরু আছে, শেষ নেই।...”

চিঠির শেষ এখানেই নয়, আরও কয়েক পাতা আছে। নীল কাগজের বুকে কালো কালির আঁচড়ে সুরজিতের আবেগ বাসা বেঁধেছে।

হাসতে ইচ্ছা করে আমার। সুরজিৎ অপাত্রে তার ভালোবাসা দিয়েছে। এলিয়ট রোডের হেলেন তার প্রতিটি চিঠি সযত্নে রক্ষা করেছে। ভালোবাসার জন্য নয়, আদালতের সম্ভাব্য দলিল হিসেবে। কিন্তু এসব ভাবার কোনো অধিকার তো আমার নেই। আমি শুধু টাইপ করে যাবো।

হেলেনের হাতে পকেট-বুক সিরিজের একটা রঙচঙে আমেরিকান রহস্য-উপন্যাস। সে পড়তে আরম্ভ করে—আমিও টাইপ শুরু করি।

সুরজিতের লেখা প্রায়ই আটকায়। মেশিনের আওয়াজ বন্ধ হলেই হেলেন মৃদু হেসে মুখ তুলে চায়। চিঠির উপর ঝুঁকে অংশ বিশেষ পড়ে দেয়। আমার মেশিন আবার চলতে থাকে, হেলেন গ্বার্টও ফিরে যায় বই-এর-জগতে।

সময়ের অনুক্রমে চিঠিগুলো সাজিয়ে নিলাম। একটা নীল চিঠি তার পরেই পাতলা কাগজে হেলেনের উত্তর। প্রতিটি চিঠির নকল রেখেছে হেলেন। কোনো চিঠিই তার নিজের হাতের লেখা নয়। একটা চিঠিতে হেলেন লিখেছে—

“ডার্লিং,

টাইপকরা চিঠি পেয়ে রাগ করো না। এ চিঠি হাতের লেখারই সমান। আমার টাইপরাইটার মেশিনটি বড়ো ভালো। যন্ত্র হলেও আমার মনের কথা বোঝে। মনের কথা শোনবার জন্য এতদিন শুধু ওই ছিল; আজ তোমাকে পেয়ে তার দায়িত্ব কমলো। তবু মনে হয়, তোমার-আমার দেওয়া-নেওয়ার মূক সাক্ষীরূপে ওকে রেখে দেই। ও আমাকে লজ্জা দেবে না, হিংসে করবে না।

সত্যি বলছি, তোমার চিঠি টাইপ করার সময় এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করি; সারাদিন কত চিঠি টাইপ করি; কিন্তু তাতে থাকে ভিজে পাটের হিসেব, কিংবা চায়ের বাজার দর। 'ডিয়ার সার' ও 'ডিয়ায় সারস্'-এর মরুভূমিতে 'ডার্লিং' লিখতে বুকের ভিতর কেমন লাগে। কবে আসছো দেখা দিতে?

ইতি—

তোমারই হেলেন"

প্রশ্নটা সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠলো। হেলেন গ্রুবার্ট নিজেই টাইপিস্ট। মেশিন বন্ধ করে বললাম, "মিস্ গ্রুবার্ট, আপনি নিজে টাইপ করলে তো অনেক তাড়াতাড়ি হতো। লেখা পড়তে আপনার কোনো অসুবিধে নেই।"

হেলেন মুখ তুললে। তার গলার হারের ছোট্ট লকেটটা দুলে উঠে কেন্দ্র থেকে সরে গেল। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে তার। কোনো রকমে ঢোক গিলে বললে, "হ্যাঁ, সত্যি তো, আমি নিজেই তো টাইপ করতে পারি কিন্তু..." হেলেন কিছুক্ষণ ভাবলে। পরমুহূর্তেই বললে, "না-না, ওসব আমি পারবো না।"

বেশ রাগ হলো আমার। কিন্তু বলা যায় না কিছু। তাই উত্তর না দিয়ে দুটো সাদা কাগজের মধ্যিখানে কালো কার্বন পরিয়ে অক্ষরে চাবি টিপতে আরম্ভ করলাম,—'মাই সুইট লিটল হেলেনা...'

"রাগ করলেন?" আমার মুখের উপর বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে হেলেন জিজ্ঞাসা করলে।

ধোঁয়ার চোটে রাগটা বাড়লেও, বললাম, "না-না রাগের কী আছে। চিঠিগুলো টাইপ করা আমারই কাজ, আপনার নয়।"

টাইপ করতে লাগলাম—

"প্রিয় মিস্ গ্রুবাট,

সে দিনের পরিচয়টা নষ্ট করতে চাই না। ট্যাক্সি থেকে নেমে শুভরাত জানানোর আগে আপনিও তাই বলেছিলেন। আগামী শনিবার বিকেলে খুব ব্যস্ত

থাকবেন নাকি? না হলে, চারটের সময় পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় আসলে আনন্দিত হবো।

শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি—

সুরজিৎ রায়"

"সেদিনের পরিচয়টা কিসের জানেন?" হেলেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে।

"না। জানাবার দরকারও নেই। প্রয়োজন হলে সায়েবকে বলবেন।" আমি উত্তর দিলাম।

হেলেন কিন্তু শুনলে না। বলতে লাগলো—

ওই 'সেদিন' থেকেই কাহিনীর শুরু। হেলেন গিয়েছিলেন এক পার্টিতে। সেখানে বল-ডান্স হচ্ছে। ঘরের কোণে নাচের বাজনা শরীরে চাঞ্চল্য জাগাচ্ছে। অনেকে নাচছে। হেলেনের বান্ধবীরা নাচছে তাদের ফিয়াঁসের সঙ্গে। হেলেন চুপচাপ সোফা থেকে তাদের অঙ্গভঙ্গী দেখছে। মিসেস রেমঁ নীল আলোয় পিয়ানো ফর্টিতে সুরের মূর্ছনা তুলছেন। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণের এই সব সামাজিক উৎসবের সঙ্গে হেলেনের পরিচয় নেই। সবার অলক্ষ্যে সময়টা কাটাতে পারলেই সে বাঁচে।

"আজকের রাতে চুপচাপ বসে থাকতে দিচ্ছি না। আসুন, যদি কোনো আপত্তি না থাকে, আমরা দু'জন—"

হেলেন চমকে উঠে সামনের দিকে তাকালো। নিখুঁত ইভনিং ড্রেসে সজ্জিত একটি যুবক ওকে ডাকছে। মৃদু হাসলো ছেলেটি। তার সাদা চকচকে দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হেলেনের ভয় লাগছে। নাচে তার তেমন অভ্যাস নেই। তালে ভুল হয়। বুড়ী মিসেস হিগিনের নাচের ইস্কুলে মাত্র দু'মাস গিয়েছিল সে। মাইনে দিতে না পারায় আর যাওয়া হয়নি।

"এই যে আসুন, বসে রইলেন কেন?"

হেলেন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ উত্তর না দেওয়া অভদ্রতা। হেলেনের বুকটা কেমন করে ওঠে। ভদ্রলোক কী ভাববেন, নাচ না শিখে বল-এ আসা। তবু সে উঠে দাঁড়ালো। কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক তার বিশাল বাহু দিয়ে হেলেনকে যেন লুফে নিলেন। ওরা ফ্লোরে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আমি সুরজিৎ রায়।"

"আমি হেলেন গুবার্ট।"

"বাঃ চমৎকার নাম। প্যারিস নামে এখানে কেউ থাকলে আমাকে আপনার সঙ্গে নাচতেই দিত না—" নাচের মধ্যে সুরজিৎ আস্তে-আস্তে বললে।

"আমার কিন্তু ডান্স ভালো জানা নেই। কেমন ভয় লাগছে।" নাচের মধ্যে হেলেন ফিস-ফিস করে উত্তর দিলে।

"হা ভগবান, এর জন্যেই বুঝি ফ্লোরে আসতে চাইছিলেন না। কিছু ভাবনা নেই, আপনি তো আর কোনো প্রিন্সের সঙ্গে নাচছেন না।" সুরজিৎ হেলেনকে আরও কাছে.টেনে নেয়।

হেলেনের সর্বশরীরে অপূর্ব আনন্দের শিহরন জাগে। সে কোনো উত্তর দিতে পারে না। শুধু তালে-তালে পা মিলিয়ে যায়। সুরজিতের পুরুষালী চেহারা, যেন সুঠাম ইস্পাত। তার প্রশস্ত বুক আর চওড়া কব্জি হেলেনের বেশ ভারী মনে হয়। হেলেনকে সে অনায়াসে মাটি থেকে ডল পুতুলের মতো তুলে ফেলতে পারে।

সেই থেকেই দু'জনের পরিচয়। সুরজিতের বয়স বেশি নয়। হেলেনের সমবয়সী কিংবা সামান্য বড়ো হবে।

নাম দেখে আমি ভেবেছিলাম সুরজিৎ বাঙালী। কিন্তু হেলেনই ভুল ভেঙে দিল। বললে, "সুরজিৎ রায়ের বাবা বাঙালী খ্রীস্টান। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলের নাম ডেভিড বা জন রাখলেন না। নাম দিলেন সুরজিৎ। ওয়েলেসলী পাড়ায় এমন নাম এর আগে কেউ শোনেনি।

হেলেনের বর্ণনা শেষ হলো। পরের চিঠিটা টেনে নিলাম।

"প্রিয় মিস্ গুবার্ট,

গত শনিবারের কয়েকটি ঘণ্টা মনে রাখবার মতো। আপনি সত্যি খুব ভালো গল্প বলতে পারেন। ফেরার পথে বৃষ্টি নেমেছিল, ভিজে যাননি তো? আমার কিন্তু জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে মনে হয়। শরীর খুব সুস্থ বোধ হচ্ছে না।

শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি—

সুরজিৎ রায়।"

তার পরের চিঠি—

"প্রিয় মিস্ গ্রুবার্ট,

আপনার চিঠিতে বড়ো আনন্দ পেলাম। শরীর নিয়ে আপনাকে কিছু না লেখাই উচিত ছিল। এমন কিছুই হয়নি, এখন আগেকার মতো আপিস যাচ্ছি। ভালো কথা, আজ সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি একটা ছোট্ট লাল টুকটুকে পাখি জানালায় বসে গান গাইছে। পাখিটার সাহস কম নয়। আগামী শনিবার নিশ্চয় দেখা হবে। ইতি"

শনিবারের অপরাহ্ণে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ বাড়তে থাকে। প্রথমে রেস্তোরাঁয়। ক্রমশঃ চৌরঙ্গী পাড়ার বিভিন্ন সিনেমায়। বহুদিন আগেকার ঘটনার প্রতিধ্বনি তুলে আমার টাইপরাইটার কাজ করে চলে।

হেলেন গ্রুবার্ট কোন্ সময়ে উপন্যাস পড়া বন্ধ রেখে ছবি আঁকবার জন্য টেবিল থেকে পেন্সিল তুলে নিয়েছিল জানতে পারিনি। হঠাৎ দেখলাম আমার লেখার প্যাডে কতকগুলো বিচিত্র ছবি হেলেনের পেন্সিলের ডগা থেকে বেরিয়ে এসেছে। খুব বৃদ্ধ এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক, সঙ্গে রাস্তার শীর্ণ মৃতপ্রায় একটা কুকুর।

এক চিঠি শেষ করে অন্য চিঠিতে হাত দিই। আমার ডান দিকে টাইপ-করা কাগজের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। আর একটা নীল চিঠি টেনে নিলাম।

ইতিমধ্যে চিঠির সুরের পরিবর্তন হয়েছে।

"ডার্লিং হেলেনা,

আমার সুইট হেলেনা, শোনো। কোনো সংবাদ দাওনি কেন? দু' রাত আমার ঘুম নেই। তোমার ছোটো ফটোটা বার করে যতো দেখি ততো অবাক হই—আবার দেখতে ইচ্ছে করে। কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

কে তোমার নাম রেখেছিল, হেলেনা? বহু বর্ষ আগে তুমিই ট্রয় নগর ধ্বংস হবার কারণ হয়েছিলে। আর আজ আমার শান্ত জীবনে ঝড় এনেছো তুমি। দুষ্টু মেয়ে, এখন রাত কত জানো? এই মাত্র আমার ক্লকে

দুটো বাজলো। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। এমন বাদলা রাতে দু'জনে দেখা হলে কেমন মজা হতো…"

হেলেনের উত্তর টাইপ করতে কষ্ট হয় না। ঝরঝরে টাইপ করা চিঠি।

"আমার বীরপুরুষ,

চিঠিতে অনেক অভিমান করেছো। রাগও হয়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু সত্যি যদি আমায় ভালোবাসতে তবে চিঠি না লিখে নিজেই আসতে হেলেনের সন্ধানে। কিন্তু না এসে ভালোই করেছে। অত সুখ আমার সহ্য হতো না।

হেলেনের রূপের বর্ণনা দিয়ে কেন লজ্জা দাও? সেদিনের বর্ষামুখর রাতে আমিও জেগে ছিলাম। বিজলীর সঙ্গে বজ্রের শব্দে বড্ডো ভয় করছিল। তুমি থাকলে কিন্তু সত্যি বলছি আমার একটুও ভয় করতো না…"

কিছুকাল পরে লেখা একখানা চিঠির সঙ্গে কয়েকটা ফটো আটকানো রয়েছে।

"দুষ্টু মেয়ে,

সেদিন বোটানিক্‌সে তোলা ছবিগুলো পাঠালাম। ছবিতে তোমার হাসি ভারি মিষ্টি লাগে। এক নম্বর ছবিটা এনলার্জ করতে দিয়েছি। আমার টেবিলে সেটি থাকবে। তুমি হাসবে, আমি দেখবো। তোমার সোনালী চুলের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকবো। এখানে কিন্তু তুমি লজ্জায় মুখ লুকোতে পারবে না।"

জেমক্লিপে আঁটা ছবিটিও খুঁটিয়ে দেখলাম। হেলেন হাসছে। আজকের হতশ্রী, ক্লান্ত, বিগতবসন্ত হেলেন গ্র্বার্ট নয়। সেদিনের হেলেনের দেহে যৌবনের ভরা জোয়ার। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো তাজা শরীর। চোখে অষ্টাদশীর চঞ্চল মাদকতা।

আর একটা চিঠি টেনে নিলাম।

"আমাকে পাগলকরা হেলেন,

ওগো পরীরানী, এই মাত্র তুমি বিদায় নিয়েছো। আমার ঘড়ি বলছে মাত্র দশ মিনিট। কিন্তু মন বলছে

কতদিন তোমাকে দেখিনি—একদিন নয়, একমাস নয়, বহুকালের অদর্শন বেদনা। তোমার ঘ্রাণ এখনো ছড়িয়ে রয়েছে এ ঘরের বাতাসে; তাইতো এখনই লিখতে বসলাম। রজনীগন্ধার যে গুচ্ছটিকে তুমি বুকে নিয়েছিলে, আদর করেছিলে পরম আবেগে, তারাও উদাসভাবে চেয়ে যেন তোমাকে খুঁজছে।

হেলেন, আজকের কথা ভুলবো না। আমাকে তুমি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে সম্মানিত করেছো। হেলেন, আমি সে বিশ্বাসের সকল দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।…"

সুরজিতের লেখা এরপর কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পড়তে পারি না। চেষ্টা করেও বুঝতে পারি না সুরজিৎ কী বলতে চায় হেলেনকে। ছবি আঁকা ছেড়ে হেলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

চিঠিটা এগিয়ে দিলাম। "প্রথম তুটো প্যারা পড়তে পেরেছি। তারপর?" আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হেলেন গোড়া থেকে চিঠিটা পড়তে লাগলো। একবার শেষ করে বোধ হয় আবার পড়লো। সময় নষ্ট হওয়ায় অস্বস্তি লাগছে আমার।

শেষে হেলেন চিঠিটা ব্যাগে পুরে ফেললো। "এ-চিঠিটা টাইপ করার দরকার নেই, আমার কাছেই থাক।"

অন্য কোনো কথা না বলে হেলেন আবার ছবি আঁকায় মন দিলে।

বেশ কয়েকখানা চিঠির পর পুরী থেকে লেখা সুরজিতের একটা চিঠিতে নজর পড়লো। পুরীর সমুদ্রতীরে সুরজিতের মনে হেলেনের মুখ বার বার উঁকি দিয়েছে, কেন, এ-প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই।

পরের ডাকে উত্তর যায়, "এ আমার পরম সৌভাগ্য। আফিসে মোটেই ভালো লাগছে না। ছুটির পর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। কেন জানি না।"

চিঠিতে ক্রমশঃ ওরা হৃদয়ের গোপনতম কথা প্রকাশ করে। ওরা তু'জনে তু'জনকে ভালোবেসেছে। ওরা ঘর বাঁধবে। কিন্তু এলিয়ট রোডে নয়। ও-পাড়া থেকে বহু দূরে, টালিগঞ্জ কিংবা গড়িয়াহাটায়। সুরজিতের রোজগার ভালো, ডালহৌসীর এক

পাটকলের আপিসে তার চাকরি। সুরজিৎ হেলেনকে বিয়ের পর চাকরিতে থাকতে দেবে না। সে আপিসে গিয়ে কী করবে? তার থেকে সংসারে তদারকী অনেক ভালো।

ডিসেম্বরের এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। সুরজিৎ এসেছে হেলেনের বাড়িতে। তার পরনে ছাই-রঙের স্যুট। গলায় প্রজাপতির মতন বো-টাই। মুখে ঈষৎ হাসি। হেলেনের আজ নতুন বেশ। ঘিয়ে রঙের শাটিনের আঁট স্কার্ট বিজলী বাতিতে ঝলমল করছে। কোমরে একই রঙের প্লাস্টিকের বেল্ট। বুকের কাছে দুটি আধফোটা গোলাপ আটকানো রয়েছে। হেলেন চোখ বোঁজে, কে যেন এগিয়ে আসছে। সে আরও কাছে এগিয়ে আসে। ধীরে-ধীরে বুকের কাছে স্পর্শের অনুভব। হেলেন চোখ খুললো। সুরজিতের হাতে তার বুকের গোলাপ।

"এ-গোলাপ আজ থেকে আমার"—সুরজিৎ বললে।

হেলেন হেসে উত্তর দিলে "ও-তো গোলাপ-কুঁড়ি। ফুল ফোটাবার যত্ন নিতে পারবে তো?"

ওরা আঙটি বদল করলো। হেলেনের নরম হাতে সুরজিৎ নিজের প্রতিশ্রুতির চিহ্নস্বরূপ আঙটি পরিয়ে দিলো। হেলেন সলাজে আবার চোখ বোঁজে। মার্চের এক সন্ধ্যায় চার্চের সামনে ওরা দু'জনে গাড়ি থেকে নামবে। প্রিয়জনের পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে তারা ধীরে-ধীরে বেদীর দিকে এগিয়ে যাবে। বেদীর সামনে পুরোহিত দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি ধীরে-ধীরে বলবেন, "মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো।" ভক্তি অবনতচিত্তে পুনরাবৃত্তি করবে তারা। তারপর একমাসের ছুটিতে হনিমুন। গোপালপুর অন সী। হেলেন আর ভাবতে পারে না।

শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় হেলেন দিন গুনছিল। চিঠি লেখা কমিয়ে দিয়েছে সে। সুরজিতের সঙ্গে আজকাল বেশি বেড়াতে যেতে চায় না সে। বলে, লজ্জা লাগে। সুরজিৎ মাঝে মাঝে বাড়ি এসেছে, নীল রঙের চিঠিও পাঠিয়েছে। হেলেন লিখেছে, "আমার মনের মানুষ, আমাকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখবার তোমার এতো ইচ্ছা কেন জানি না। কিন্তু আমি তোমার অবাধ্য হবো না। বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে দেবো।" সুরজিৎ লিখেছে, "যে-ফ্ল্যাটটা

সেদিন তুমি ও আমি দেখে এলাম, ওইটাই ভাড়া নিচ্ছি। ফেব্রুআরীর প্রথমেই আমি ওখানে উঠে যাবো, আর মার্চমাসের সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। বাড়িওয়ালাকে আজ ত্থ'শ' টাকা আগাম দিয়ে দিলাম।"

জানুয়ারীর মাঝামাঝি হেলেনের কাছে আবার একটি নীল চিঠি এল। এ-চিঠির জন্য হেলেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিনা মেঘে বজ্রপাত। বিছানায় শুয়ে বালিশের তলায় মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ সে কাঁদলো। সুরজিৎ রায় নিজে আসতে সাহস করেনি, তাই চিঠি পাঠিয়েছে। সুরজিতের চাকরি গিয়েছে। যে চটকলের আপিসে তার চাকরি সায়েবরা তা বিক্রি করে দিয়েছে। মাস পয়লায় সুরজিতে হাতে যে খামটা আসতো তার ভিতর থাকতো ছ'শ' টাকার করকরে দশ টাকার নোট। সে খাম এবার থেকে আসবে না।

সুরজিৎ রায় ভেঙে পড়েছে। হেলেনকে সে পাবে না এক পয়সা সঞ্চয় নেই তার। যা রোজগার করেছে এতোদিন তাই সে খরচ করেছে।

হেলেন রুমালে চোখ মুছতে-মুছতে যে চিঠি লিখেছিল সেটা টাইপ করলাম—

> "কোনো চিন্তা করো না ডার্লিং। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। আবার তুমি চাকরি পাবে। শুধু আমাদের ঘর বাঁধতে একটু দেরি হবে। তাতে কী? আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু আমরা ঘর বাঁধবোই।"

সুরজিতের উত্তর—

> "ডার্লিং,
>
> তোমার চিঠি বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি কি তুমি আমার পুরনো হেলেনই থাকবে? আমার একান্ত নিজস্ব হেলেনা। আমিও প্রতীক্ষায় থাকবো। নিশ্চয়ই থাকবো। যতোদিন প্রয়োজন।"

হেলেনের দিকে আড়চোখে তাকালাম। ছবি আঁকা বন্ধ

করে, কোন্ সময় নিজের অজান্তে সে চোখ বুজেছে। টেবিলের উপর ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে।

সুরজিৎ চাকরির চেষ্টা করছে। হেলেন নিজের খরচ কমানোর চেষ্টা করে। তাকে আরো টাকা রোজগার করতে হবে। সুরজিতের সামান্য কষ্টও সে সহ্য করতে পারবে না।

সে আর একটা ছোটো চাকরি জুটিয়েছে। শনিবার টার্ফ ক্লাবের কাউণ্টার থেকে রেসের টিকিট বিক্রি; মাসে সত্তর টাকার মতো পাওয়া যাবে। শনিবার বিকেলে দু'জনে আর দেখা হয় না। সুরজিতের সময় আছে যথেষ্ট। ঐদিনটিতে হেলেনকে কাছে পেতে চায় সে। কিন্তু সাড়ে-বারোটা বাজলেই আপিস থেকে হেলেনকে ট্যাক্সিতে রেসকোর্সের দিকে ছুটতে হয়।

বেশ কিছুদিন এমনিভাবে কেটে যায়। সুরজিত লেখে, চাকরি বোধ হয় আর জুটবে না। জীবন অসহ্য! হেলেন উত্তর দেয়, "লক্ষীটি ধৈর্য হারালে চলবে কেন? আমার যা কিছু উপার্জন সে তোমারই জন্য। সে টাকাকে তুমি একমুহূর্তের জন্য অপরের ভেবো না। আমি আরও কিছু রোজগারের চেষ্টা করছি। সুদিন এল বলে।"

সুদিনের প্রতীক্ষায় বছর গড়িয়ে যায়। হেলেনের চিঠি থেকে বুঝি, অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। শরীরের দীপ্তি, মনের সজীবতা কমে আসছে। রুক্ষ-জীবনের দেবতা ধীরে-ধীরে হাস্য-মুখরা, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা হেলেনকে গ্রাস করছে।

সুরজিতের আর ভালো লাগে না। এক প্লাস্টিক কোম্পানিতে সেলসম্যানের কাজ পেয়েছে সে। কিন্তু যা মাইনে পায় তাতে ঘর ভাড়া দিয়ে দু'লেবা অন্নসংস্থান হয় না। নিজেকে ভদ্রভাবে বাঁচিয়ে রাখতে যে অক্ষম, তার বিয়ের চিন্তা পাগলের কল্পনা মাত্র।

রবিবারের এক বিকেলে ওদের দেখা হলো। সুরজিৎ আজকাল একদম কথা বলে না। চা খেতেও তার ইচ্ছা হয় না। বিল দিতে হবে হেলেনকে।

সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করে, "আর কতদিন?"

হেলেন কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। সুরজিৎ যেন ছোট্ট ছেলে। ক্ষিদের সময় খেতে চায়, কিন্তু খাবার কোথা থেকে আসবে

বুঝতে চায় না। তবু সুরজিৎকে ওর ভালো লাগে, ওকে আদর করতে ইচ্ছা করে। ওর ঘন কালো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, আর বেশিদিন নয়।

নাঃ। হেলেনকে কিছু করতেই হবে। আর সামান্য মাইনে বাড়লেই তারা বিয়ে করবে। ঘর বাঁধবে। সুরজিৎ তারপর ভালো চাকরির চেষ্টা করতে পারবে।

ঢাকা আপিসের অফারটা সে গ্রহণ করবে। কোম্পানির ঢাকা ব্রাঞ্চে বছর খানেকের জন্য একজন লেডী স্টেনো চাই। মাইনে প্রায় ডবল এবং ফিরে আসার পর প্রমোশন সুনিশ্চিত। কিছুদিন তাকে সুরজিতের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু উপায় কী? ঢাকা থেকে ফিরেই ওরা বিয়ে করবে। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে সব কিছু গুছিয়ে সংসার পাতবে।

ঢাকা থেকে লেখা হেলেনের চিঠির কপি আমার সামনে—

"মাই নটি ডার্লিং, মাই স্কিপার,

কয়েক ঘণ্টা আগেও দমদমে তোমাকে দেখেছি, অথচ এই ক'ঘণ্টায় কত দূরে চলে এসেছি। হোটেলের ব্যবস্থা আপিস থেকেই হয়েছে, ওয়াই. ডবলু. সি. এতে জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবো।

এইমাত্র স্নান সেরে এসেছি। ঘর সাজাবো দু'একদিনের মধ্যে। তোমার বড়ো ছবিটা কিন্তু ড্রেসিং টেবিলে ইতিমধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার খুব কাছে হাসছো। অথচ তুমি কত দূরে। সবই ভগবানের ইচ্ছা। নইলে এমন হবে কেন ডার্লিং? তবুও সময় সময় মন প্রবোধ মানতে চায় না। সুইট ড্রিম, ইতি—

তোমারই হেলেন।"

মাস কয়েক পরে হেলেনের চিঠি :—

"ডার্লিং,

আজকের ডাকে একটা সোয়েটার পাঠালাম। কিছুদিন আগে পশমটা কিনেছিলাম। চকোলেট রঙে তোমায় ভালো মানাবে। সামনে শীত তাই তাড়াতাড়ি বুনতে হলো। সোয়েটার গায়ে দিয়ে একটা ফটো তুলো।

তার এক কপি আমায় পাঠাতে ভুলো না। তোমায় কতদিন দেখিনি। কবে আবার এক সঙ্গে সিনেমা দেখে পার্ক স্ট্রীটের সেই রেস্তোরাঁয় বসবো……”

চিঠির বাণ্ডিল পাতলা হয়ে এসেছে। ঘড়িতে প্রায় চারটা বাজে। সুরজিতের চিঠি দ্রুত টাইপ করি—

“আমার হেলেনা,

সোয়েটার পেয়েছি ঠিক সময়ে। সময় মতো উত্তর না দেওয়ার জন্য দুঃখিত। সোয়েটার এখনও পরিনি। কি হবে পরে? কে তাতে আনন্দ পাবে? ক্রমশঃ যেন বুড়ো হয়ে পড়ছি। কত দিন এমনি চলবে জানি না…”

হেলেনের উত্তর আসে—

“অতো হতাশ হতে নেই। তুমি না পুরুষ? আর কয়েক মাসেই আমার ব্যাঙ্কে বেশ কিছু জমে যাবে। তখন আমাদের সামনে অফুরন্ত আনন্দের দিন।…”

সুরজিতের চিঠি—

“…কবে সে আনন্দের দিন আসবে? যখন আমরা বুড়ো হয়ে কবরে যাবার দিন গুনবো? সব মিথ্যা… তোমার টাকায় প্রয়োজন নেই। ঢাকাতে সময় নষ্ট না করে ফিরে এসো। জীবনে যদি দুঃখ ও কষ্ট থাকে আমরা এক সঙ্গে তার সম্মুখীন হবো…

হেলেনের চিঠি—

“এতোদিন আমরা ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। এই শেষ বেলায় আর ধৈর্য হারিও না, লক্ষ্মীটি। রাত পোয়াতে আর বেশি বাকি নেই। হঠাৎ একদিন আমাকে কলকাতায় তোমার পাশে দেখতে পাবে।…এখানে ঘড়ি খুব সস্তা। তোমার জন্য একটা ঘড়ি কিনেছি, যাবার সময় নিয়ে যাবো। ততোদিন ওতে দম দিচ্ছি। ঘড়ি বন্ধ হওয়া ভালো নয়। চালু ঘড়ি নিজের হাতে তোমার মনিবন্ধে পরিয়ে দেবো।…”

এর পরের কয়েকটা চিঠি দ্রুতবেগে শেষ করি। ছুটির সময় হয়ে এসেছে। প্রায় পাঁচটা। হেলেন-সুরজিৎ পত্রাবলীর শেষ

চিঠিটা তুলে নিই। সুরজিৎ রায়ের চিঠি। কিন্তু নীল কাগজে লেখা নয়, সাদা সাধারণ কাগজ। ছোট্ট চিঠি।

এমন সময় হেলেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো। ছোখ রগড়াতে-রগড়াতে সে বললে, "আই এম স্যরি। কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। ক'টা বাজে? সব শেষ তো?"

না প্রায় শেষ। এইটুকু বাকী ঃ—

"প্রিয় হেলেন,

এ-চিঠি তোমায় আঘাত দেবে। কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী নই। তোমার ভুলের মাসুল তোমাকেই দিতে হবে। সুদিনের প্রতীক্ষায় জীবনের আর একটি দিনও ব্যয় করতে আমি রাজী নই। অথচ তুমি বার বার আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছো। কিছুদিন হলো আর একজন আমার জীবন-আকাশে দেখা দিয়েছে। তার নাম নাই বা শুনলে। সে তোমার মতো আমাকে উপেক্ষা করে না। অপেক্ষা করতেও বলে না। আমাকে পাবার জন্য সে পাগল; সে দুঃখ পেতে রাজী। আমাকে পেলেই সে সন্তুষ্ট—ভালো ফ্ল্যাট, ভালো পোষাক, সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুই সে চায় না। আমার জীর্ণ কুটিরে বধূরূপে তার আগমন হবে শীঘ্র।

তুমি সুদিনের অপেক্ষায় রূপ যৌবন বাক্সে বন্ধ করে বসে থাকো। যখন তোমার অভিষ্ট সুদিন আসবে, তখন বাক্স খুলে দেখবে সব কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। ইতি

সুরজিৎ।"

আঙুল দিয়ে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে হেলেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে তো খুব খাটিয়ে নিলাম। এবার আমি যেতে পারি কি?"

"হ্যাঁ। যেতে পারেন আপনি। সব চিঠিই টাইপ হয়ে গিয়েছে।"

"শেষ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবো ভেবেছিলাম। চিঠিটা কাছে রাখতে ঘেন্না হয়।"

"না ছিঁড়ে ভালোই করেছেন কোর্টে কাজে লাগবে।" আমি উত্তর দিলাম।

"হুঁ। বছাধনের কত তেজ এবার বোঝা যাবে। অকৃতজ্ঞ।

দশ হাজার টাকা কোথা থেকে যোগাড় হয় দেখবো।" ক্রোধের আগুনে হেলেন জ্বলছে।

"আচ্ছা, মামলাতে আন্দাজ কত টাকা লাগবে?" হেলেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে।

"ঠিক বলতে পারছি না। এটর্নিরা জানেন।" আমি উত্তর দিলাম।

"তিলে-তিলে রক্ত জল করে পয়সা রোজগার করেছিলাম লোকটার জন্য। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো। ফাঁদে পড়বার আগেই লোকটাকে চিনতে পেরেছি। ব্যাঙ্কে যা জমিয়েছি তার সব খরচ করতে আমি পিছপাও হবো না, মামলায় আমাকে জিততেই হবে। দশ হাজার টাকা আদায় করবোই।" হেলেন হি-হি করে হাসতে লাগলো।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়নাটা বার করে নিজের ঠোঁটটা খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে হেলেন আবার জিজ্ঞাসা করলে, "তাই না, বাবু? মামলায় আমাকে হারাবে কে?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। আপনার কেস খুব স্ট্রং।" আমি বললাম।

"ওকে যে শেষপর্যন্ত বিয়ে করিনি আমার সৌভাগ্য। কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্বলচিত্ত লোক।"

আয়নাটা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে রাখলো হেলেন। প্রতিশোধ চাই। সুরজিৎকে ধ্বংস করতে হবে।

দশ হাজার টাকা কোথায় পাবে সুরজিৎ রায়? তার সর্বস্ব নীলামে যাবে। দেউলিয়া খাতায় সুরজিৎ রায়ের নাম তুলিয়ে ছাড়বে হেলেন। তখন কোথায় থাকবে তার নতুন প্রিয়া? কোথায় থাকবে তার বিবাহের স্বপ্ন? সেদিন সুরজিৎকে আবার হেলেনের কাছে আসতে হবে। তখন? তখন রাস্তার কুকুরের মতো তাকে সে দূরে সারিয়ে দেবে। সুরজিৎ রায়কে সর্বনাশের শেষ স্তরে না দেখা পর্যন্ত হেলেনের আত্মা শান্তি পাবে না।

বুড়ী মা ও এটর্নি অমিয় চ্যাটার্জির সঙ্গে হেলেনকে প্রায়ই চেম্বারে আসতে হয়। যাঁরা সাক্ষী দেবেন তাঁরাও দু'-একদিন সায়েবের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন।

হেলেন গ্রবার্ট একটার পর একটা সিগারেট উড়িয়ে যায়।

তার মা জিজ্ঞাসা করেন, হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যাবে কিনা।

মাস কয়েক পরে আদালতে হেলেন গ্রুবার্টের মামলা উঠলো। কোর্টরুমে বেজায় ভিড়। এমন মজার কেস্ রোজ হয় না। ব্যারিস্টারের বাবুরা, উকিলের মুহুরী ও এটর্নির কোর্ট-ক্লার্করা ঘরের প্রায় সবক'টা চেয়ার ও বেঞ্চি দখল করে বসে আছেন। এডভোকেট ফণি বিশ্বাসের মুহুরী প্রবোধ মুখুজ্যে, ব্যারিস্টার ভবানী ঘোষের বাবু গজানন, হারুবাবু, অর্জুনবাবু ও আরও কয়েকজন বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে দেখেই অর্জুনবাবু একটু কাছে এগিয়ে এলেন। "এই যে চাঁদ, বেশ মজাদার মামলা ফেঁদে বসেছেন তোমার সায়েব। মাইরি, একটু হিস্ট্রিটা বলো শুনি।"

অর্জুনবাবুর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আরও সামনে এগিয়ে গেলাম। সামনের সারিতে দু'দলের ব্যারিস্টার বসে আছেন। সায়েব রয়েছেন, রয়েছেন জুনিয়র মিঃ মজুমদার ও এটর্নি অমিয় চ্যাটার্জি। সুরজিৎ রায়ের ব্যারিস্টাররাও বসে রয়েছেন।

সায়েবের ঠিক পিছনে দুটি চেয়ারে হেলেন ও তার মা। হলের অন্যদিকে সেই একই সারিতে সুরজিৎ রায়। তার পাশে একটি কমবয়সী মেয়ে। হেলেন তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। মেয়েটির চোখে ছোট শিশুর নিষ্পাপ দৃষ্টি।

মামলা শুরু হলো।

সুরজিৎ রায়ের ব্যারিস্টার বললেন, "আমার মক্কেল বাদিনীকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন সত্য, কি সে-চুক্তি বাদিনী নিজেই ভঙ্গ করেছেন। অমুক তারিখের লেখা বাদিনীর চিঠি তার প্রমাণ।" তিনি হেলেনের চিঠি আদালতকে পড়ে শোনালেন। সায়েব বললেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা চুক্তিভঙ্গ নয়, অভিমানের চিঠি। প্রেমের ব্যাপারে এরকম অভিমান খুবই স্বাভাবিক। সুরজিৎ রায়ের অমুক তারিখের চিঠি পড়লেই সেটা বোঝা যাবে। সায়েব চিঠিটা আদালতকে শোনালেন। সুরজিৎ রায় ইনিয়ে-বিনিয়ে হেলেনকে আদর জানিয়েছে সে চিঠিতে। বলেছে, অভিমান করো না। চিঠি দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। তারপর

হু'জনের পত্রালাপ পূর্বেকার মতোই চলেছে। সুরজিৎ হেলেনকে বধূরূপে পেতে চেয়েছে। হেলেন লিখেছে, তোমাকে পতিরূপে পেলে, আমি ধন্য হবো।

পিছনের বেঞ্চ থেকে একজন ফিস-ফিস করে বললে, "প্রবোধদা, ছোকরা কি বোকা দেখেছো। সব কিছু লিখে বসে আছে। সাধে কি আর শাস্ত্রে বলে শতং বদ মা লিখ।"

প্রবোধদা উত্তর দিলে, "ছুঁড়িটাও কম ওস্তাদ? সব ক'টা চিঠি রেখে দিয়েছে।"

আর একজন বললে, "রাখবে না? ওটাই তো ওদের ব্যবসা। ছেলেধরা পেত্নী।

হেলেন-সুরজিৎ প্রেমপত্রের নানা অংশে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে সায়েব জজকে শোনাতে লাগলেন। প্রতিবাদে ব্যারিস্টার সেনও অন্য অংশ পড়তে আরম্ভ করলেন।

উপস্থিত দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা—চিঠিগুলি রসে বোঝাই। হেলেন মুখ নিচু করে বসে আছে। সুরজিৎ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। আর সুরজিতের পাশে নীল রঙের স্কার্ট-পরা মেয়েটি পরম বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে। মুখের ভাব থেকে মনে হয় যেন সে কিছু বুঝতে পারছে না। হেলেন তার কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়ী।

সওয়ালের আগে হেলেন সাক্ষ্য দিয়েছে। সুরজিৎকেও হেলেনের পরিত্যক্ত কাঠগড়াতে দাঁড়াতে হয়েছে। হেলেনের বুড়ি মা সাক্ষ্য দিয়েছেন—তাঁর মেয়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, দুশ্চিন্তায় তার রাতে ঘুম নেই। ডাক্তার সাক্ষ্যে বলেছেন, এই সব ক্ষেত্রে দুরারোগ্য মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

পুরো দু'দিন মামলা চললো। তৃতীয় দিনে আবার সবাই কোর্টে উপস্থিত। আজ রায় বার হবে। রায়ের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। সুরজিতের হাত ধরে সেই মেয়েটিও আজ এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। হেলেন সেদিকে তাকিয়ে দেখছে। মেয়েটিকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘিয়ে রঙের সার্জের স্কার্ট পরেছে সে। গলায় নকল মুক্তোর মালা।

সুরজিতের হাত ধরে আজকেও সে সবকিছু অবাক হয়ে

দেখছে। হেলেনের দিকেও মাঝে-মাঝে আয়ত চোখে সে তাকাচ্ছে। সুরজিৎ গম্ভীর। হেলেন তার দিকে তাকাতে ঘৃণা বোধ করে। তবু এক দুর্নিবার আকর্ষণে হেলেনের দৃষ্টি সুরজিতের উপর গিয়ে পড়ে। একটা নতুন সোয়েটার পরেছে সুরজিৎ। হাতে বোনা চমৎকার সোয়েটারটিতে সুরজিৎকে বেশ মানিয়েছে। হয়তো এই সোয়েটারই ঢাকা থেকে হেলেন তাকে পাঠিয়েছিল।

জজ এসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। বেঞ্চক্লার্ক চিৎকার করে ডাকলো—হেলেন গ্রুবার্ট ভারসেস্ সুরজিৎ রায়।

সুরজিৎ রায়ের হার হয়েছে। হেলেন গ্রুবার্টকে বিয়ে না করে সুরজিৎ চুক্তিভঙ্গ করেছে। ব্রীচ অব প্রমিস! জজসায়েবের অভিমতে হেলেন গ্রুবার্টের দাবি ন্যায়সঙ্গত।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো সুরজিৎ রায়। হিংস্র হাসিতে ভরে উঠেছে হেলেনের মুখ। কিন্তু সেই মেয়েটির বিশেষ পরিবর্তন নেই। পরম বিশ্বাসে সুরজিতের হাত ধরে সে পূর্বেকার মতোই দাঁড়িয়ে রইলো। তার আয়ত চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি থেকে মনে হলো যেন এ-যুদ্ধের কিছুই তার জানা নেই।

হেলেনের মা'র আনন্দ উছলে পড়ছে। বুড়ী লাফাতে-লাফাতে কোর্টঘর থেকে বেরুবার সময় বললে, "মেয়েকে কতবার বলেছি, বেশি টাকা দাবি করো। মেয়ে আমার কথায় কান দিলে না। হুঁ-হুঁ আমি জানি। যেদিন থেকে ও ছোঁড়া এসেছে, তখনই বলেছি, চিঠিপত্রগুলো যত্ন করে রাখিস, হুঁ-হুঁ।"

পাকা ঝিঙাবিচির মতো কালো-কালো দাঁতগুলো বার করে হেলেনের মা আমাদের ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু মেয়ের দেখা নেই, বোধহয় আগেই চলে গিয়েছে। তবে ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে যাওয়ার অসৌজন্য আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

বুড়ী বললে, "ডিক্রিটা তাড়াতাড়ি বার করে জারি করার ব্যবস্থা করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি টাকা আদায় করা যায়, ততোই ভালো।"

এটর্নি অমিয় চ্যাটার্জি বললেন, "তার জন্যে ভাববেন না, মামলায় যখন জিতেছি, সব তাড়াতাড়ি করে দেবো।"

চেম্বারে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হেলেন এসেছিল কিনা।

বেয়ারা বললে, না আসেনি। এই হয়ে থাকে সাধারণতঃ। মামলা যখন শেষ হয়েছে আর কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রুবার্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

হেলেন গ্রুবার্টের কাহিনী এইখানে শেষ হলে আজকে লেখার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু কয়েকদিন পরে এটর্নি মিস্টার চ্যাটার্জির কাছে যে খবরটা পেয়েছিলাম তাতে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম আমি।

হেস্টিংস স্ট্রীটের মোড়ে একটা দোকানে চা খেতে যাচ্ছিলাম। পথে মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা। তিনি চিৎকার করে বললেন, "আরে মশাই, আপনাদের চেম্বারেই যাবো ভাবছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার। আরে মশাই, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং দেবতারাই বুঝতে পারেন না, আর আমরা তো কোন্ ছার?"

আমার অনুরোধে ব্যাপারটা আরও খুলে বললেন মিস্টার চ্যাটার্জি।

"মস গ্রুবার্ট লিখে পাঠিয়েছেন, ডিক্রি জারি করতে হবে না, ক্ষতিপূরণের টাকায় তাঁর প্রয়োজন নেই। উনি নাকি শুধু মামলায় জিততে চেয়েছিলেন, তার বেশি কিছু নয়।"

ব্যাপার ঠিক বুঝতে না পেরে বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মিস্টার চ্যাটার্জি। কিন্তু বেয়ারা ফিরে এসেছে। হেলেন গ্রুবার্ট প্লেনে ঢাকায় চলে গিয়েছে।

"তারপর, এই কেসে তহুরী বাগালে কত?" ছোকাদা জিজ্ঞাসা করছিলেন একদিন। বার-লাইব্রেরীর সামনে বেঞ্চিতে আমরা অর্থাৎ বাবুরা দলবেঁধে বসে ছিলাম। ছোকাদার এই আচমকা প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে গেলাম।

"কোন্ কেসের কথা বলছেন?"

"কেন তোমার ওই হেলেন গ্রুবার্টের কেস্। তহুরীর চান্স ছেড়ো না। লজ্জা করলে তোমারই লোকসান।"

"কিন্তু তহুরী জিনিসটা কি তাই বললেন না।"

হা-হা করে অর্জুনবাবু, দীনুবাবু, হারুবাবু সবাই হেসে উঠলেন। "একেবারে সাক্ষাৎ পরমহংসদেব, তহুরী কাকে বলে জানে না। এছেলে এখন বাঁচলে হয়।"

বাবুদের কথায় কান না দিয়ে ছোকাদা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। "বাবুদের তহুরীকে অনেকে বকশিশ বলে। কিন্তু আমরা তা মানতে রাজী নই। এটা আমাদের ন্যায্য পাওনা। সায়েবরা যতো মোহর ফী নেবেন, ততো টাকা আমাদের পাওনা। ত্রিশ মোহর ফী হলে, ত্রিশটাকা তহুরী।"

"কিন্তু বাপু যা দিনকাল পড়েছে তাতে একটাকা রেটে কোনো এটর্নি তহুরী দিতে চায় না। তবে যতোটা পারো বার কর নেবে। ত্রিশ টাকার জায়গায় যদি কুড়ি টাকা হয় তাই সই। আরে বাপু আসল রোজগার তো ওই তহুরী থেকে। ওই যে পাঁচুগোপাল"—ছোকাদা দেখে নিলেন পাঁচুগোপাল আছে নাকি। যখন দেখলেন সে নেই তখন মন খুলে বললেন, "ওই পাঁচুগোপাল মাইনে আর ক'টাকা পায়? কিন্তু বাপু জ্বরে কী আসে যায়, পিলেতে যে মেরে দেয়। প্রতি মাসে নিদেন হাজার টাকা পাঁচুগোপাল পকেটে পোরে। অমন নিরীহ ভালোমানুষটি সেজে বসে থাকলে কী হয়, ইচ্ছে করলে অনেক ব্যারিস্টারকে ও কিনে রাখতে পারে।"

"বলেন কি?" অজান্তে আমার চোখ দুটো বড়ো হয়ে উঠেছিল।

"যা বলছি শুনে যাও," ছোকাদা বললেন। পাঁচুগোপালকে তহুরী চাইতে হয় না, এটর্নিরা হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। কিন্তু সবাই তো আর পাঁচুগোপাল নয়। আমাদের তহুরী আদায় করতে কালঘাম ছুটে যায়।"

"সত্যি মাইরি এটর্নিরা তহুরী দিতে গিয়ে এমন ভাব করে যেন টাকাটা তার নিজের পকেট থেকেই যাচ্ছে।" অর্জুনবাবুর হাত পা নাড়ানোর ভঙ্গিতে এটর্নিদের প্রতি তাঁর বিরক্তিটা বেশ প্রকাশিত হলো।

"আর আজকালকার সায়েবরাও তেমনি হয়েছে। এটর্নিদের মুখ ফুটে কিছু বলবে না। সায়েব ছিল উড্‌রফ সায়েব। কিন্তু সে সব দিন কি আর আছে রে দাদা।" ছোকাদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিলেন।

উড্‌রফ সায়েবের গল্প বলার জন্য আমরা সবাই ছোকাদাকে চেপে ধরলাম। ছোকাদা বলতে লাগলেন—

"উড্‌রফ সায়েব মস্ত ব্যারিস্টার। এক এটর্নি তাঁকে ব্রীফ পাঠালেন। ফীও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু তহুরী? সায়েব এটর্নি জানালেন, তহুরী দেওয়াটা তাদের প্রথা নয়। উড্‌রফ সায়েবও কম যান না। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ব্রীফ ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আর লিখে দিলেন, বাবুকে তহুরী না দিলে ব্রীফ নেওয়াটা তাঁরও প্রথা নয়।"

"এটর্নি তখন কী করলো?" অর্জুনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"এটর্নি তখন দীনদয়ালকে তহুরী দেবার পথ পায় না।" ছোকাদা বললেন।

"উড্‌রফ সায়েবের বাবুর নাম বুঝি দীনদয়াল?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"হুঁ", ছোকাদা বললেন। "দীনদয়ালকে আমি দেখেছি। গম্ভীর প্রকৃতির লোক, পারতপক্ষে কারুর সঙ্গে কথা বলতেন না। কালো চোগাচাপকান চাপিয়ে কোর্টে আসতেন। আজকাল বার-লাইব্রেরীর কেদারবাবু ছাড়া ওরকম ড্রেস আর কেউ পরে না। এটর্নি উকিল তো দূরের কথা, এই বার-লাইব্রেরীর অর্ধেক ব্যারিস্টারকে তিনি তোয়াক্কা করতেন না।

জুড়িগাড়ি চড়তেন দীনদয়াল। তাজা বাঘের মতো দুটো ঘোড়া সে গাড়ি টানতো। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের মোড়ে তাঁর কোচম্যান পা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক সরাতো। পিছনে থেকে সহিস লাফ মেরে মাটিতে নেমে দরজা খুলে দিতেই, দীনদয়ালবাবু বেরিয়ে আসতেন। তারপর ধীরে-ধীরে ঢুকে যেতেন হাইকোর্টের ভিতর।"

সেই দীনদয়ালবাবু কিন্তু একদিন জুড়িগাড়ি চড়া ছাড়লেন। দীনদয়ালবাবুর জুড়িগাড়ি ত্যাগের যে গল্প ছোকাদা খুব আস্তে-আস্তে এবং রসিয়ে-রসিয়ে বলেছিলেন তার কতটুকু সত্য বলতে পারবো না। গল্পের ঝোঁকে সে-কাহিনীর মধ্যে ছোকাদা আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছিলেন কিনা কে জানে?

সে-যুগের খাঁটি জমিদারী মেজাজ ছিল দীনদয়ালবাবুর। ঘোড়া দুটি তাঁর বাঘের মতো—(ঘোড়ারা বাঘের মতো হয় কিনা জানি

না, তুলনাটি ছোকাদার)। দীনদয়ালবাবুর নেশা ছিল, তাঁর গাড়ি সবাইকে ডিঙিয়ে চলে যাবে। কোচম্যানরা সে-কথা জানতো তাই সামনে কোনো গাড়ি পড়লে তারা সর্বদা চেষ্টা করতো সেটিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে।

একদিন হেস্টিংস স্ট্রীটে এক গাড়ি পড়লো দীনদয়ালের গাড়ির সামনে। আর যাবে কোথায়! তাঁর কোচম্যান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে সামনের গাড়িকে নিপুণভাবে পাশ কাটিয়ে পিছনে রেখে হাইকোর্টের সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্য গাড়িটাও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে এসে দাঁড়ালো। দীনদয়ালবাবু যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, তাই হলো। সেই গাড়ি থেকে নামলেন স্বয়ং উড্রফ সায়েব।

"হ্যাল্লো দীনদয়াল"—উড্রফ সায়েব দীনদয়ালের পিঠে হাত রাখলেন। কিন্তু গাড়ি সম্বন্ধে তাঁকে একটি কথাও বললেন না।

চুপ করে রইলেন দীনদয়াল। পরের দিন থেকে দেখা গেল তিনি পায়ে হেঁটে কোর্টে আসছেন। তিনি যে সেই জুড়ি গাড়ি চড়া ছাড়লেন, ভবিষ্যতে কেউ একদিনের জন্যও তাঁকে জুড়িগাড়ি চড়তে দেখেনি।

হোটেল ছেড়ে সায়েব চৌরঙ্গী রোডের উপর এক ক্লাবে উঠে গেলেন। তিনি অনেক বৎসর ধরে সে-ক্লাবের সভ্য। ক্লাবে থাকবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। দু'খানা ঘরই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরগুলির আকারও বেশ বড়ো।

ছুটির পর আমাকে রোজ সেখানে যেতে হয়। বাড়ি ফিরতে সেজন্য আরও একটু দেরি হয়। কিন্তু গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা আটটার সময় ট্রামগুলো যখন হু-হু করে চলে, বেশ লাগে। আরও ভালো লাগে যখন সাড়ে চারটের সময় গাড়িতে চড়ে সায়েবের সঙ্গে রেড রোড ধরে যাই। ড্রাইভারের পাশে বসে মোহনচাঁদ। পিছনে সায়েব ও আমি। দূরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। তারপর

একসময় মেমোরিয়ালকে বাঁ পাশে ফেলে রেখে আমরা আরও এগিয়ে যাই। দমকা হাওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে থাকি। যখন মোটরের চাকার সঙ্গে নুড়ির ঘর্ষণে অস্পষ্ট খড়বড়-খড়বড় আওয়াজ হতে থাকে তখন চোখ খুলি; বুঝতে পারি ক্লাব এসে গিয়েছে। ক্লাব বাড়িটার চারিদিকে অসংখ্য ফুলের গাছ। একদল মালী সর্বক্ষণ তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত। পাশেই তাদের জালে ঘেরা টেনিস লন। প্রতি মিনিটে দু'একটা গাড়ি এসে দরজার কাছে থামছে। দু'-একজন গাড়ি থেকে নেমে সোজা ভিতরে চলে যাচ্ছেন, আর গাড়িটা আরও এগিয়ে গিয়ে একজায়গায় অলসভাবে পড়ে থাকে।

জামা-কাপড় ছাড়তে সায়েব ভিতরে চলে যান। আমিও সেই সুযোগে সোফাতে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করি। একটু পরে চা আসবে। চা শেষ করে, আবার কাজ আরম্ভ হবে। সায়েব বলে যাবেন, আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নেবো।

এই ক্লাবেই শ্রীমতী সুনন্দা উইলসনকে প্রথম দেখি। শ্রীমতী না বলে তাঁকে মিসেস সুনন্দা উইলসন বলা উচিত। কারণ বাঙালী হলেও শ্রীমতী সম্ভাষণ তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা।

ক্লাবে সায়েবের ঘরে আমি একা বসেছিলাম। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলে দেখলাম টেনিস র‍্যাকেট হাতে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। ভিতরে আসতে বললাম তাঁকে। ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকে এলেন। একটা চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। বোধ হয় এইমাত্র খেলে ফিরছেন ভদ্রমহিলা। কপালে মুক্তোর মতো কয়েকটি ঘামের ফোঁটা কিছুতেই রুমালের বাধা মানতে চাইছে না।

ঈষৎ হেসে তিনি বাঙলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "সায়েব আছেন?" মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর।

সায়েব ছিলেন না, লাইব্রেরীতে বই আনতে গিয়েছিলেন। বললাম, "এখনই আসবেন, একটু যদি অপেক্ষা করেন।"

সুনন্দা দেবী নিতান্ত বালিকা নন, বয়স হয়েছে। অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ। কিন্তু চোখে-মুখে ও ব্যবহারে বালিকাসুলভ চপলতা।

সুনন্দা দেবীকে ফরসা বলতে হবে, তবে কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল জাতীয়া কিছু নন।

তাঁর পরিধানে বাঙালোর সিল্কের আকাশ রঙের শাড়ি ও হাতকাটা ব্লাউজ। মণিবন্ধে কালো ব্যাণ্ডে ছোটো সোনার ঘড়ি চিকচিক করছে। মাথাভর্তি বিলিতী ফ্যাসনে কাটা কোঁকড়ানো চুল সব জায়গায় বিন্যস্ত নয়। সুনন্দা দেবীর চঞ্চল চাহনিতে পাহাড়ী ঝর্ণার মতো আবেগ আছে। তিনি কৌচে বসে হাতের র‍্যাকেটটা ছোটো ছেলের মতো লোফালুফি করতে লাগলেন। একটু পরেই উঠে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। পরমুহূর্তেই আবার র‍্যাকেটটা হাতের উপর স্থিরভাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঘরে ঢুকেই সায়েব আশ্চর্য হলেন। "সুনন্দা যে, কী খবর? এতোদিন কোথায় ছিলে? বোম্বাই থেকে কবে আসা হলো?"

সুনন্দার ইংরিজীতেও অপূর্ব মিষ্টতা। "প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ দিতে এলাম। রবার্টও আসতো; কাজে আটকে পড়েছে বেচারা।"

সায়েব ও সুনন্দার মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হলো। সুনন্দা জানালেন, "আমরা ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি। রবার্টের কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, তাছাড়া বিলেতের হেড আপিসে সে প্রমোশন পাচ্ছে।"

"সুখবর সন্দেহ নেই। রবার্ট চাকরিতে আরও উন্নতি করবে, আমি বলে রাখলাম।" সায়েব খুব খুশি হয়েই বললেন। ম্লান হেসে সুনন্দা বললেন, "যাবার আগে ভাবলাম বাঙলাকে দেখে যাই। কলকাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। হয়তো আর দেখা হবে না।"

"কবে এসেছো কলকাতায়?" সায়েব আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"তা দিন তিনেক হয়ে গেল। ভাবলাম শেষ বিদায় আপনার কাছেই নেওয়া উচিত। অনেকদিনই তো আপনার কথা মনে রাখতে হবে।"

সায়েব মৃদু হাসলেন! "না সুনন্দা, বাঙালীদের প্রশংসায় আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। তারা আমায় এতো ভালোবাসে যে, প্রশংসার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না।"

"আপনি ব্যারিস্টার মানুষ, আপনার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারবো কেন ?"

"বটে ! কথাবার্তায় তোমার সঙ্গে আমি কোনোদিনই পেরে উঠিনি। তোমার বাবাকে দু'-একবার বলেওছি, এ-মেয়ে ব্যারিস্টার হলে আমাদের আর করে খেতে হবে না।" হা-হা করে হেসে উঠলেন সায়েব।

"টুকিটাকি মার্কেটিং কিছু বাকী আছে। এখন বরং উঠি। না হলে সেগুলো আজ শেষ করতে পারবো না।" সুনন্দা উঠে পড়লো।

"কলকাতা থেকে যাবার আগে রবার্টকে নিয়ে একদিন এসো। কবে কলকাতা ছাড়ছো ?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"পরশু সন্ধ্যার ট্রেনে।"

"তাহলে আগামীকাল ডিনারে আসতেই হবে। লাস্ট ক্যালকাটা ডিনারটা আমার সঙ্গে হওয়াই উচিত। মনে আছে কি, তোমার প্রথম ক্যালকাটা ডিনার এই বুড়োর সঙ্গে হয়েছিল !"

হেসে ফেললেন সুনন্দা। বললেন, "নিশ্চয়ই আসবো। রবার্টও খুব আনন্দিত হবে।"

"হ্যাঁ, একেবারে ভুলে গিয়েছি। ছেলেদের কী হলো ? তাদের কী ব্যবস্থা করলে ?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

সুনন্দা গম্ভীর হয়ে উঠলেন। একটু যেন বিমর্ষও মনে হলো। "রবার্ট বেচারার তুলনা হয় না। বললে ওরাও সঙ্গে যাবে। পাশপোর্টের গোলমাল আছে, সে এমন কিছু নয়।"

সায়েব বললেন, "আহা, বেচারাদের জন্য কষ্ট হয়। রবার্টের কোনো ছেলেপুলে হয়েছে নাকি।"

সুনন্দার চোখে আবার ছেলেমানুষি ফিরে এল। দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "রবার্ট বলে এরাই তো ছেলেপুলে, আর দল বাড়িয়ে কী হবে ?

টেনিস র‍্যাকেটটা হাতে ঘোরাতে-ঘোরাতে সুনন্দার ঋজু তনুদেহ ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর হাঁটার মধ্যেও ছন্দ আছে, প্রাণ আছে, স্বীকার করতেই হবে।

আমার কাছে দু'জনের কথাবার্তা কেমন হেঁয়ালি ঠেকলো। কে এই সুনন্দা ? রবার্ট উইলসনই বা কে ? ছেলেপুলেই বা কাদের ?

পরের দিন সকালে সায়েবের নির্দেশে হোটেলে টেলিফোন করে সুনন্দাকে রাত্রের ডিনারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেছেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ। মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।"

ডিনারে ওঁরা দু'জন এসেছিলেন। তারপর যাবার দিন সুনন্দা হোটেল থেকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। জানিয়েছেন ডিনারের জন্য ধন্যবাদ। আর সঙ্গে পিন দিয়ে একটা ফটো এঁটে দিয়েছেন—রবার্ট উইলসনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সুনন্দা দেবী।

ছবিটা বেশ কয়েকবার দেখে সায়েব আমাকে বললেন, "ছবিটা আমার এলবামে আটকিয়ে রাখো। সুনন্দার আরও ছবি আছে ওই এলবামে।"

সুনন্দার কাহিনী পরে সম্পূর্ণ জেনেছি। সায়েব বলছিলেন, "উকিল বা ডাক্তারদের ট্র্যাজেডি এই যে, মামলা জেতার পর কিংবা রোগ সেরে যাওয়ার পর মক্কেল বা রোগীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু ডাক্তার তাঁর রোগীকে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী দেখলে আনন্দিত হন। সুনন্দাকে সুখী দেখে আমারও আনন্দ হচ্ছে। সুনন্দাকে আর এক কারণে মনে থাকবে। সুনন্দার জন্য দু'বার ডাইভোর্স কোর্টে হাজিরা দিয়েছি, এখানে সচরাচর এমনটি ঘটে না।"

সুনন্দার সঙ্গে সায়েবের পরিচয় অনেকদিনের। সায়েব তখনও কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেননি। শিলং-এ শৈলবিহারে এসেছেন বিলেত থেকে সদ্য আগত কর্নেল সায়েব। শিলং পাহাড়ে প্রভাতী শীতের আমেজ তখনও বেশ রয়েছে। অন্ধকার ভালোভাবে কাটেনি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামনের চড়াই ধরে সায়েব এগিয়ে যাচ্ছেন, অবাক হয়ে দেখছেন প্রকৃতির অপরূপ লীলাবৈচিত্র্য। হঠাৎ সেই প্রায়ান্ধকারে আর একজন অশ্বারোহী রাস্তার উল্টোদিক থেকে এসে পড়লেন। সরু রাস্তা। সামনের অশ্বারোহীকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য সায়েব ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ওদিকে অন্য ভদ্রলোকটিও পথ ছেড়ে দেবার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছেন।

আলাপ জমে উঠলো তু'জনের। ইনি অসিত সেন, সুনন্দার বাবা। ছ' ফিট লম্বা দেহ। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন। মুখে সর্বক্ষণ সিগারেট জ্বালিয়ে রাখেন। নেশার মধ্যে তুটি—শিকার ও ফুলবাগান।

অসিত সেন খ্রীস্টান। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। তুটি ছেলে ও একটি মেয়েকে মনের মতো করে মানুষ করেছেন। ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই কয়েকবার বিলেত ঘুরে এসেছে। অসিত সেনের বিশ্বাস, ভারতীয় আদবকায়দা তাঁর সন্তানরা যতো কম শেখে ততোই মঙ্গল। শ্রীমতী সেন বিদেশিনী, ফ্রান্সের মেয়ে। মেয়ের নামকরণে কিন্তু অসিত সেন ভারতীয় ধারা অনুসরণ করলেন। অডি, ফ্যান্সি বা বিউটি নয়, নাম রেখেছেন সুনন্দা।

আশ্চর্য মেয়ে এই সুনন্দা। বয়স কত হবে? দশ কি এগারো। সে ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কাটে, ভাইয়ের সঙ্গে ফুটবল খেলে। এমনকি বাবার সঙ্গে শিকারে বার হয়। সদাচঞ্চল, হাস্যমুখরা, ছোট্ট সুনন্দাকে সায়েব নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। সকালে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তু'জনে বার হতেন একসঙ্গে। ঘুরে আসতেন বেশ কয়েক মাইল।

সেই যে আলাপ জমলো, ক্রমশঃ তা আরও ঘনিষ্ঠ হলো। শিলং থেকে কলকাতা ফিরে এসে সায়েব সুনন্দা ও তার বাবাকে চিঠি লিখেছেন। তারা উত্তর দিয়েছে। বড়োদিনের উৎসবে সায়েব সুনন্দা ও তার ভাইদের নামে পার্সেল পাঠিয়েছেন।

সীনিয়র কেমব্রিজ শেষ করে সুনন্দা আর পড়লো না। মিউজিক ও ছবি আঁকার দিকেই ইদানিং নজরটা তার বেশি পড়েছে। গৌহাটিতে ওরা থাকে। তবে মাঝে-মাঝে কাজের জন্য অসিত সেনকে শিলং যেতে হয়। সেখানেও একটা বাঙলো আছে। তাই ছেলেমেয়েরা প্রায়ই সঙ্গে যায়।

কয়েক বছর পরে ঈস্টারের ছুটিতে সায়েব আবার শিলং গিয়েছেন। অসিত সেন কিছুতেই হোটেলে থাকতে দেননি। জোর করে নিজের বাঙলোতে সায়েবকে নিয়ে গিয়েছেন। তখন অবশ্য সায়েব আর মিলিটারীতে নেই, হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন।

আরও কয়েকবছর পরে সায়েব সুনন্দার বিয়ের চিঠি পেলেন।

অসিত সেন লিখলেন, সুনন্দার রুচি ও পছন্দ ভালো। ছেলেটি উচ্চবংশের বাঙালী খ্রীস্টান, নাগপুর প্রবাসী।

বিয়েতে সায়েব যেতে পারেননি। কিন্তু লোক মারফত প্রচুর উপহার পাঠালেন। অসিত সেনকে লিখলেন, "মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে পেরেছো জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

তারপর সুনন্দা নাগপুরে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে সায়েবকে চিঠি লিখেছে।

কলকাতায় যে বাড়িতে সায়েব তখন থাকতেন সেটি জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সরকারী বাসভবন। গৃহস্বামী মিস্টার ফিলিপ নর্টন সায়েবের বহুদিনের পরিচিত।

সায়েব বলছিলেন, "এই বাড়িতেই সুনন্দাকে ক'দিন কাটিয়ে যেতে লিখলাম।" সুনন্দা সানন্দে রাজী হলো। নাগপুরের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য কলকাতা মন্দ নয়। সুনন্দা এল। সঙ্গে তার স্বামী। মিস্টার ও মিসেস নর্টনের সঙ্গে সায়েব ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিসেস নর্টন জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিন থাকবে?"

সুনন্দা বললেন, "আমার সপ্তাহ তিনেক থাকবার ইচ্ছা। উনি অবশ্য তিনদিনের মধ্যে চলে যাবেন। আপিসে ছুটি পাওনা নেই।"

মিস্টার নর্টনের ওখানে আর একটি লোক বসেছিলেন। সায়েব তাঁকে বেশ ভালোভাবে চেনেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সঙ্গে সুনন্দার পরিচয় করিয়ে দিতে হলো।

এই ভদ্রলোকটির সমস্ত ইতিহাস সায়েব আমাকে বলেছিলেন ভদ্রলোকের আসল নাম বলবো না। বাংলাদেশের অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলতে পারেন।. গত যুদ্ধের সময় কোনো অজ্ঞাত উপায়ে প্রচুর অর্থ ও সেই সঙ্গে প্রচুর সুনাম তিনি যোগার করেছেন।

মনে করা যাক তাঁর নাম শৈলেন বৈরাগী। বহুকাল আগে নর্টন সায়েব এক মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের এক প্রাথমিক স্কুলে একটি ছেলেকে তিনি দেখতে পান। কেন জানি না ছেলেটির প্রতি তাঁর মায়া পড়ে গেল। কালো পাথরের মতো রঙ, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, আর বিস্মিত একজোড়া চোখ। খোঁজ নিয়ে জানলেন ছেলেটির বাবা ও মা চা-বাগানের কুলি। বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে ছেলেটিকে

খ্রীস্টধর্মে দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন তিনি। দার্জিলিং-এর বিনাপয়সার স্কুলে পড়ানো তাঁর পছন্দ হলো না। একটু বড়ো হতেই দক্ষিণের এক কনভেণ্টে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

কনভেণ্ট থেকে মিস্টার নর্টন বৈরাগীকে সোজা বিলেত পাঠালেন। কিন্তু পড়াশুনা না করে বৈরাগী সেখানকার ইউনিভার্সিটিতে মন দিয়ে টেনিস আর ক্রিকেট খেলে বেড়ালেন। কেবল মিস্টার নর্টনের ভয়ে তাঁকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে বসতে হলো এবং সেই পরীক্ষায় ফেলকরা ছাত্রদের মধ্যে নিম্নতম স্থান দখল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। পরীক্ষায় ফেল হয়ে বৈরাগী বিলেতের আদব-কায়দা শিখতে মনস্থ করলেন। নাচ, গান ও মদ্যপানে অনেকগুলো ডক্টরেট পাবার যোগ্যতা নিয়ে বৈরাগী স্বদেশে ফিরলেন।

বহু চেষ্টায় মিঃ নর্টন তাঁর জন্য এক চাকরি যোগাড় করলেন। ক্লাইভ স্ট্রীটে এক নামজাদা সওদাগরী আপিসে মোটা মাইনের চাকরি।

বৈরাগীর গুণবলী ক্রমশঃ কলকাতার উচ্চ মহলে ছড়িয়ে পড়লো। চৌরঙ্গীতে এক ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন। বৈরাগীর দৃষ্টি একদিকে খুবই উদার। রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর ও স্যারদের কন্যা থেকে আরম্ভ করে আপিসের টাইপ-ললনাদের উপর পর্যন্ত তিনি সমান নজর রাখেন। একদিনের কথা। সায়েব কোর্ট থেকে ফিরছেন। তাঁর গাড়িটা ভিতরে ঢোকবার সময় সামনে মালপত্র বোঝাই এক ট্যাক্সি দেখতে পেলেন। কয়েকজন চাকরবাকর তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে সায়েব এগিয়ে গেলেন। ট্যাক্সিতে দু'জন ইংরেজ মহিলা বসে আছেন। হাবভাবে বোঝা যায় এদেশে তাঁদের সদ্য পদার্পণ। মহিলাদের মধ্যে একজন বয়স্কা। তিনি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কি রাজকুমার বৈরাগীর প্যালেস?" সায়েব আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলেন, "যতোদূর জানি বাড়ির মালিক ভারত সরকার। বর্তমানে মিঃ ফিলিপ নর্টনের সরকারী বাসভবন।" যুবতী মহিলাটি ভীত হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ কাগজের মতো সাদা দেখালো। অনুসন্ধানে জানা গেল, তাঁরা সদ্য বোম্বাই-মেল থেকে নেমেছেন। আসছেন

বিলেত থেকে। 'রাজকুমার' বৈরাগীকে তাঁরা জাহাজ থেকে টেলিগ্রাম করেন। আশা ছিল, 'রাজকুমার' স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। আরও জানা গেল, যুবতী মহিলাটি বৈরাগীর বাগ্দত্তা। বিয়ে করে পাকাপাকি ভাবে ঘর বাঁধবার জন্যই তিনি এখানে এসেছেন। সায়েব ভদ্রমহিলাদের একটি হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বললেন বৈরাগীকে তিনি খবর পাঠাচ্ছেন হোটেলে দেখা করবার জন্য।

খবর পেয়ে বৈরাগী প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সহজেই নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর কয়েকদিন ছোটাছুটি করে ভদ্রমহিলাদের কি বোঝালেন ভগবান জানেন। কিন্তু মা ও মেয়েকে একদিন রুমাল নাড়তে-নাড়তে বোম্বাই মেলে বিদায় নিতে দেখা গেল।

বৈরাগীর আশ্চর্য আকর্ষণ-শক্তি; অনেকটা সম্মোহনী-শক্তির মতো। তার চারিত্রিক পরিচয় জেনেও অনেক মেয়ে তার পিছনে ছোটে।

কিন্তু কে জানতো সুনন্দার মতো বুদ্ধিমতী মেয়েও সেই ভুল করবে। বৈরাগী ঘন-ঘন যাতায়াত শুরু করলো; সুনন্দাও আজ এই অছিলায়, কাল অন্য অছিলায় দেরি করে ফিরতো। সুনন্দার কথা সায়েব সরলভাবে বিশ্বাস করেছেন। তাছাড়া সুনন্দা যে পরিবেশে মানুষ সেখানে বিবাহিতা মহিলাদের অবাধ স্বাধীনতা।

ঘটনার গুরুত্ব বোঝা গেল মাস কয়েক পরে। অসিত সেন কলকাতায় সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেনের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। মনের কোণে উদ্বেগের উপস্থিতি সহজেই বোঝা যায়। অসিত সেন সায়েবকে অবাক করলেন। বললেন, নতুন বিয়েতে সুনন্দা নাকি মোটেই সুখী হয়নি। কলকাতা থেকে নাগপুর গিয়ে সে মাত্র একমাস ছিল, তারপর সোজা গৌহাটি ফিরে গিয়েছে।

দু'দিন পরে সুনন্দাও কলকাতায় এল। সুনন্দা স্বামীর হাত থেকে মুক্তি চায়। সায়েব বোঝালেন, "সুনন্দা তোমার বয়েস হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে ভালো করে ভেবে দেখো।"

সুনন্দা কিন্তু অবিচলিত। সে বললে এই বিয়েটা একেবারে ভুল হয়ে গিয়েছে। "আমার টেম্পারামেণ্টের সঙ্গে মিঃ বোসের

মোটেই খাপ খায় না। আসলে লোকটা নির্জীব।” যে-স্বামীর মধ্যে প্রাণের চাঞ্চল্য নেই, উদ্দীপনা নেই, তার কাছে সুনন্দা জীবনটা নষ্ট হতে দেবে না। শিলং পাহাড়ের লীলা-চঞ্চল ঝর্ণা কিছুতেই নাগপুরের এক বদ্ধ ডোবায় গিয়ে মিশতে পারে না।

সুনন্দারা যে পরিবেশে মানুষ সেখানে মা-বাবারাও সন্তানের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ মাথা গলাতে সাহস করেন না। সাংসারিক ব্যাপারে অসিত সেনের মাথা খোলে না, সুনন্দা তাঁর একমাত্র মেয়ে। তার জীবনে তিনি কণ্টক হতে চান না।

সুনন্দা দেবীর কাহিনী এই পর্যন্ত একটানা শুনেছিলাম। দিনটা ছিল শনিবার। হাইকোর্ট ওই দিন বন্ধ থাকে। চা খেতে-খেতে বিকেলে গল্প হচ্ছিলো। কিন্তু আমার গল্প শোনায় বাধা পড়লো। বেয়ারা এসে বললে, সায়েবের টেলিফোন এসেছে। টেলিফোনে কথাবার্তা শেষ করে সায়েব যখন ফিরলেন, তখন মনে হলো গল্পের সূক্ষ্ম তারটা যেন ছিঁড়ে গিয়েছে। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম “তারপর?”

“হুঁ। তারপর অসিত সেন আমাকে বললেন, আইনের দিকটা তোমাকেই সামলাতে হবে”—সায়েব আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

“আগেই বলেছি সুনন্দারা খ্রীস্টান। খ্রীস্টান আইনে ডাইভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব। ইচ্ছে করলেই অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। এর জন্য কতকগুলো অপরাধের প্রয়োজন—আমরা যাকে বলি ম্যাট্রিমনিয়াল অফেন্স (বৈবাহিক অপরাধ)। কোন্ কোন্ অপরাধে ডাইভোর্স সম্ভব ভারতীয় ডাইভোর্স আইনে তা লেখা আছে, নিশ্চয় জানো।”

“হুঁ, আপনার কাছে কিছু-কিছু শুনেছি।”

“চরিত্রহীনতা ও নিষ্ঠুরতা এই দুটো অভিযোগই প্রধান।” সায়েব একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, “কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা কথাটি একটু গোলমেলে। দেশ, কাল ও সমাজ ভেদে এর বিভিন্ন অর্থ। এমনকি যার উপর নিষ্ঠুরতা করা হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গির উপরও অনেকটা নির্ভর করে।”

আমি বললাম, “তা বটে। কেননা একবার আমাদের বাড়ির

পাশের বস্তিতে একটা লোক তার স্ত্রীকে মারছিল। আমরা রেগেমেগে লোকটাকে শিক্ষা দিতে ছুটে গেলে সেই স্ত্রীলোকটিই স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বললে, আমার সোয়ামী আমায় মারছে তাতে পাড়ার নোকের মাথাব্যথার কী আছে ?"

শুনে সায়েব হাসলেন। বললেন, "সব দেশের বস্তিতেই ওরকম হয়। তবে আমাদের দেশের উচ্চতর সমাজের নিষ্ঠুরতা বোধ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে। এটা মানসিক নিষ্ঠুরতার যুগ। স্বামী একটু বেঁকিয়ে কথা বললে, কিংবা একলা সিনেমায় গেলেই বেজায় আঘাত লাগে।"

আমি হাসতে যাচ্ছিলাম। সায়েব বললেন, হাঁসছো কি ? এই তো সেদিন ওদেশে স্বামী রাত্রে ভয়ঙ্কর নাক ডাকান বলে একটা ডাইভোর্স হয়ে গেল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বেশিদিন এরকম নাক ডাকানো শুনলে স্ত্রীর স্নায়ুবিকার দেখা দিতে পারে।

আমেরিকার এক ভদ্রলোক ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ঘুমোন। ভোর হলেই এলার্ম-ঘণ্টা মিনিট পাঁচেক ধরে বাজতে থাকে। স্ত্রী বললেন, ওসব চলবে না। এলার্ম আমার ঘুমের মৌজ নষ্ট করে দেয়। সকালের দিকেই আমার যা একটু ঘুম আসে। স্বামী রাজী হন না। দিন কয়েকের মধ্যে ভদ্রমহিলা কোর্টে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করলেন।"

"সুনন্দা স্বামীর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনলেন ?"

"নিষ্ঠুরতার অভিযোগ। অবশ্য নাক ডাকানো বা এলার্ম-ঘড়ি রাখার মতো অভিযোগ নয়। ভেবে-ভেবে সে আমাকে যে সব ঘটনা বলেছিল, সেগুলোই সাজিয়ে-গুছিয়ে কোর্টে ফাইল করা হলো।"

"তারপর ?"

"নাগপুরের বর কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। কেন করেননি বলতে পারবো না, তবে সম্ভবত যে-মেয়ে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করতে চায় না তাকে তিনি বেঁধে রাখতে চাননি। সুনন্দার মামলার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করে লাভ নাই। আইন ও ঘটনার মারপ্যাঁচে সুনন্দা জিতে গেল। হাইকোর্ট ডিক্রি দিলেন,

তুমি মুক্ত। নাগপুরের সেই ছেলেটি, যাকে তুমি একদিন লজ্জাবনত চোখে স্বামীরূপে গ্রহণ করে চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে সে এখন তোমার স্বামী নয়।

অসিত সেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তার অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছি বলে আমিও আনন্দিত হলাম।

মামলা জিতবার পর সুনন্দা কয়েকবার কলিকাতায় এসেছে। কিন্তু হোটেলে উঠেছে, আমার ফ্ল্যাটে থাকেনি। দু'-একবার আমার সঙ্গে দেখা না করেই গৌহাটি ফিরে গিয়েছে, এমন খবরও আমার কানে এসেছে।

ছ'মাসের মধ্যে বৈরাগী তিনবার শিলং পাড়ি দিয়েছে। আমার সঙ্গে মিঃ নর্টনের ফ্ল্যাটে তার দু'-একবার দেখা হয়েছে। কিন্তু শিলং প্রসঙ্গ সে একেবারে চেপে গিয়েছে।

কিছুকাল পরে একটা চিঠি পেলাম। সুনন্দা লিখেছে, সে আবার বিয়ে করেছে। এতোদিনে সে মনের মতো পার্টনার পেয়েছে, তার নাম শৈলেন বৈরাগী। দু'জনের প্রথম পরিচয় আমার মাধ্যমে হয়েছিল, সুতরাং একটা স্পেশাল কেক আমার পাওনা।

অসিত সেনও সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছেন। এই বিয়েতে তিনি ও মিসেস সেন খুশি হয়েছেন জেনে আমিও আশ্বস্ত হলাম। কেননা বৈরাগী সম্বন্ধে অনেক কিছুই অসিত সেন একবার আমার মুখে শুনেছিলেন। যা করবার, তাঁরা জেনেশুনেই করেছেন।

বৈরাগীর চৌরঙ্গীতে যে ফ্ল্যাট ছিল সুনন্দা বিয়ের পর সেই-খানেই উঠলো। একদিন ডিনারে দু'জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সুনন্দাও একদিন ওদের ফ্ল্যাটে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ফ্ল্যাটটা মন্দ নয়। ফার্নিচারগুলো সুরুচির পরিচায়ক। তাছাড়া মিস্টার নর্টন অবসর নিয়ে বিলেত যাবার আগে বৈরাগীকে কিছু দামী ফার্নিচার দিয়ে গিয়েছে। সুনন্দা সেগুলি সুন্দর করে সাজিয়েছে।

একবছরের কিছু বেশি সুনন্দা ওই ফ্ল্যাটে ছিল। মধ্যিখানে কয়েক মাস মোটেই তার সঙ্গে দেখা হয়নি। একদিন তার বাড়িতে টেলিফোন করলাম। সুনন্দাই টেলিফোন ধরেছিল। সন্তানসম্ভবা সে, তাই বাড়ি থেকে বেরোয় না। অন্য খবরটবর কেমন, জিজ্ঞাসা করলাম। সুনন্দা বললে, "এই একরকম।"

মাসখানেক পরে আবার টেলিফোন করতে গিয়ে একেবারে নতুন গলা শুনতে পেলাম—"কাকে চাই?" "সুনন্দা বৈরাগীকে একটু দিন না।" উত্তর এল, "তাঁরা তো এ-মাসের গোড়াতেই কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ-ফ্ল্যাটে আমরা নতুন এসেছি। যতোদূর জানি মিস্টার বৈরাগী অন্য কোথায় আরও ভালো চাকরি পেয়েছেন।"

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। হাইকোর্টে আমার কাজ এতো বেড়ে গিয়েছে যে, বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষ খবরাখবর নেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজের চাপের মধ্যেও একবার অসিত সেনকে সুনন্দার সংবাদ জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর পাইনি।

বলতে লজ্জা নেই, নানান কাজে তারপর সুনন্দাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদিন সকালে টেলিফোন বেজে উঠলো। সুনন্দা কথা কইছে। দেখা করতে চায় সে, খুব জরুরী প্রয়োজন।

সুনন্দা এল। এ কোন্ সুনন্দা? কী অবস্থা হয়েছে তার। চোখের কোণে কালি, রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ। শরীরের বাঁধুনি ভেঙে গিয়েছে, কঙ্কালসার চেহারা। চমকে উঠলাম। একি সেই সুনন্দা যে একদিন শিলঙে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাতো! একি সেই সুনন্দা যে বাবার সঙ্গে শিকারে বার হতো!

"কেমন আছো সুনন্দা?" জিজ্ঞাসা করলাম।

সুনন্দা ম্লান হাসলো।

"অসুখ হয়েছিল নাকি? একদম চেনা যায় না যে।"

সে আবার ম্লান হাসলো, কিন্তু উত্তর দিলে না।

"বাবার খবর কি? অনেকদিন তাঁর সংবাদ পাইনি।"

সুনন্দা মুখ নিচু করলে। "বাবার অবস্থা নাই বা বললাম। আলোক ও অসীম দু'জনেই ফ্রন্টে। মা বছরখানেক মারা গিয়েছেন।"

কোনো কথা বলতে পারলাম না।

সুনন্দা ফুঁপিয়ে উঠলো। "আপনার কাছে আবার আসতে হলো। যাতে না আসতে হয় তার জন্য ভগবানের কাছে প্রতিদিন

প্রার্থনা করেছি। পাঁচবছর মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু আর পারছি না।"

তার মাথায় হাত রাখলাম। "কী হয়েছে সুনন্দা? আমার কাছে আসতে লজ্জা কী? তোমার কথা কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, সুনন্দা। লক্ষ্মীটি, ভালো করে সমস্ত বলো।"

চোখ মুছলো সে। "তখন আপনার কথা না শুনে যা ভুল করেছি।"

"ভুল তো মানুষ মাত্রেই করে সুনন্দা। সুতরাং তার জন্য দুঃখ করো না।"

সুনন্দার পাঁচবছরের ইতিহাস শুনলাম সেদিন।

তারা ইচ্ছে করে কলকাতা ছাড়েনি। চারিদিকে বৈরাগীর দেনা। ছোট আদালত থেকে প্রায়ই আপিসের মাইনে কোর্টে জমা দেবার হুকুম আসে। কোম্পানী এসব সহ্য করবে কেন? চাকরি গেল।

রাঁচীতে সামান্য একটা চাকরি মিললো। কিন্তু মদের বিল্ দিতেই সব চলে যায়। সুনন্দার প্রতি বৈরাগীর মোহভঙ্গ হয়েছে। খোলাখুলি সে বলে দিয়েছে, তুমি যেতে পারো, কোনো প্রয়োজন নেই আমার। সুনন্দা চোখে অন্ধকার দেখে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে শিউরে ওঠে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলেও বৈরাগী প্রতিবছর অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান ডেকে আনছেন। একে-একে ওরা চারজন এল। এদিকে পাওনাদারদের ভয়ে মিস্টার বৈরাগী রাঁচী ছেড়ে মাদ্রাজে হাজির হলেন। সেখানকার বাজারেও বেশ কিছু দেনা বাঁধিয়ে অবশেষে রেঙ্গুনের পথে পাড়ি দিলেন। স্ত্রী-পুত্র মাদ্রাজে পড়ে রইলো। যাবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, টাকার ভাবনা নেই, বড়ো চাকরি পেয়েছি। মাসে-মাসে টাকা পাঠাবো। সুনন্দার নিজের যা কিছু সঞ্চয় ছিল যাবার আগে জাহাজ খরচের অছিলায় তা হস্তগত করতেও মিস্টার বৈরাগী ভোলেননি।

রেঙ্গুন থেকে একটি পয়সাও আসেনি।

কিছুদিন পরে খবর এল বৈরাগী-সায়েব রেঙ্গুনে যাননি। গোপনে কলকাতাতেই আবার আড্ডা গেড়েছেন।

সুনন্দার কান্না আর বাধা মানলো না। “আমি মুক্তি চাই, শয়তানটার হাত থেকে বাঁচতে চাই।”

বছর পাঁচেক আগেও একদিন সুনন্দা এই রকম মুক্তি চেয়েছিল। সেদিনের সুনন্দা ছিল সত্যই মুক্ত। কোনো দায়িত্ব ছিল না তার। আজ সে চারটি সন্তানের জননী। তবু সে মুক্তি চায়। জীবনে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়।

শোকে মুহ্যমান অসিত সেন চিঠি লিখলেন—“আমার দুর্ভাগ্য, মেয়েটাকে সুখী দেখতে পেলাম না। শয়তানটার হাত থেকে সুনন্দাকে বাঁচাতেই হবে। তোমার কাছে বোধ করি আমার এই শেষ অনুরোধ।

আবার মামলা শুরু হলো। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। এবারের অভিযোগ আগেকার মতোই, নিষ্ঠুরতা।

সুনন্দাকে কোর্টে দাঁড়াতে হলো। চারটি নাবালক শিশুকেও বিচারকের সামনে আনতে হলো। জজকে আইন দেখালাম, সাক্ষী তো আছেই। কাগজের রিপোর্টাররা তাঁদের পাঠকদের জন্য মনোমতো খবর যোগাড় করলেন। সুনন্দা আবার মুক্তি পেলো।

জীবনের অন্তহীন যাত্রাপথে আবার একাকী যাত্রা শুরুর অনুমতি মিললো।

“তারপর ?” গল্পের ঝোঁকে আমি জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

নিস্পৃহভাবে সায়েব হাসলেন। জীবনে এতো দেখেছেন তিনি যে, এখন সহজে আশ্চর্য হন না। বললেন—

সুনন্দারা এমন মেয়ে যারা বার-বার আঘাত পেয়েও হতোদ্যম হয় না। বার-বার তারা ঝড়ের মাঝেও জীবনপদ্মের পাপড়িগুলো মেলে ধরতে চায়। স্বাদ পেতে চায় রূপ-রস-গন্ধ-গানে ভরা জীবনের।

সুনন্দাকে ভাগ্যবতী বলবো। কিছুদিনের মধ্যেই এক বিপত্নীক ইংরেজ তাকে বিয়ে করলো। রবার্ট উইলসন সুনন্দাকে ভালোবাসে, তাকে সুখী করতে চায়। সুনন্দা আবার পুরনো দিনের সুনন্দার মতোই টেনিস খেলে, মোটর ড্রাইভ করে। আশা করি, সাগরপারেও তেমনি পূর্ণ আনন্দেই সে দিন কাটাবে।”

এ-গল্প সায়েবের কাছে অনেকদিন আগে শুনেছিলাম। যুদ্ধের সময় মিঃ বৈরাগী প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এখন তিনি প্রখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর নাম প্রায়ই কাগজে দেখি। পণ-প্রথা নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষাদান, নারী ও শিশুমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কাজে তাঁর খ্যাতি দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। খবরের কাগজে প্রকাশিত তাঁর ছবি আজও আমাকে মাঝে-মাঝে বিদেশবাসিনী সুনন্দার কথা মনে করিয়ে দেয়।

চোখ আর কান, দেখা আর শোনা দুই থেকেই শিখছি। চোখ দিয়ে দেখছি নতুন মক্কেল, নতুন এটর্নি, নতুন ব্যারিস্টার আর কান দিয়ে শুনছি নতুন-নতুন কাহিনী। ছোকাদা নাকি আগে এতো গল্প বলতেন না। আমাকে কেমন একটু সুনজরে দেখেছেন, অন্ততঃ অর্জুনবাবু তাই বলেন। তাই একটু ধরলেই গল্প বলতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু আরও অনেক বেশি শুনেছি ও জেনেছি সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব ও আমি—এক ব্যারিস্টার ও তাঁর বাবু। কিন্তু যখন তিনি কথা বলতে আরম্ভ করেন, সম্বন্ধটা খেয়াল থাকে না। আর গল্পের বিষয়বস্তুও সবসময় হাইকোর্টকে কেন্দ্র করে পড়ে থাকে না। মাঝে-মাঝে অনেক দূরে সরে যায়। তিনি বর্ণনা করেন এই কলকাতা কেমন ছিল জব চার্নকের সময়, কেমন মেজাজী লোক ছিলেন স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, কেমন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

ছুটির দিন ভোরবেলায় হয়তো আমাকে নিয়ে কবরখানা দেখাতে বেরিয়ে পড়লেন। সেণ্ট জন্স চার্চের পিছনে শতাব্দী প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে পার্ক স্ট্রীটের অতি আধুনিক সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত আমরা গিয়েছি। সেণ্ট জনে কেউ নেই, শেওলা পড়েছে কবরে। আর পার্ক স্ট্রীটে সদ্য-আনা এক কফিনকে ঘিরে কয়েকটি ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

কখনও সায়েব বলেছেন, "চলো তোমাদের কালীঘাট দেখে আসি। এতোদিন কলকাতায় রয়েছি অথচ মাত্র একবার গিয়েছি সেখানে।" কালী-দর্শন করে ফেরার পথে প্রাচীনকালের ইংরেজদের যুদ্ধ জিতে এখানে পূজা দিতে আসার গল্প তাঁর কাছে শুনেছি।

এই কলকাতা শহরের উপর কেমন একটা আত্মীয়তার টান আছে সায়েবের, সেটা বেশ বুঝতে পারি। অবশ্য, ভালোবাসাটা সমগ্র ভারতবর্ষের উপর। বিভূতিদার মুখেই শুনেছিলাম সায়েব এই দেশকে নিজের দেশ করে নিয়েছেন। এই দেশেতে জন্ম না হলেও এই দেশেতে জীবনের শেষ ক'টাদিন কাটিয়ে এখানেই মরতে চান তিনি।

"এই কলকাতার সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেকদিনের পরিচয়।" সায়েবই বলছিলেন একদিন।

"তাই নাকি? জানতাম না তো।"

"বলতে গেলে এই শহরের গোড়াপত্তন থেকেই আমাদের বংশের কেউ-না-কেউ জড়িয়ে আছে। একজন ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর। তার অনেকদিন পরে আর একজন হেস্টিংসের পরিষদ-সভ্য হয়ে এলেন। প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন তিনি। কী উপায়ে, সেটা নিশ্চয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এদেশের নবাবদের দেখে-দেখে তাঁরাও এক-একটি নবাব বনে গিয়েছিলেন। খিদিরপুরে তিনি যে বাড়ি তৈরি করেছিলেন, সেটি অনেক রাজ-প্রাসাদকে লজ্জা দিতো। নদীতে বইতো তাঁর ময়ূরপঙ্খি। বিকেলে তিনি গঙ্গার শোভা দেখতে বেরোতেন। বাঁদীরা করতো সেবা, বাঈজীরা গাইতো গান—আর মাঝে-মাঝে বসতো জুয়ার আসর। বড়ো-বড়ো চাঁইরা আসতেন সে আড্ডায়, সারারাত ধরে চলতো খেলা। একরাতে কয়েক লাখ টাকা হেরে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কুছ পরোয়া নেই।

বিলেতে ফিরে গিয়ে বড়ো-বড়ো লর্ডদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, বহুলোক তা দেখতে আসতো। আর সে-যুগের সেরা চিত্রকর স্যার জোসুয়া রেনল্ডসকে দিয়ে নিজের তৈলচিত্র আঁকিয়েছিলেন। স্বভাবটি তাঁর ছিল ঠিক আরব্য উপন্যাসের আবু হাসানের মতো। বড়ো ডিনার পার্টিতে

তিনি লোককে নিমন্ত্রণ করে পাঠাতেন। শুধু তাই নয়, ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবস্থা ছিল। রাস্তা থেকে তারা গেস্ট ধরে নিয়ে আসতো এবং ইণ্ডিয়া-ফেরত বাড়ির মালিক চিৎকার করতেন, "আউর দো গাড়ি গেস্ট মাংতা।"

শেষপর্যন্ত কিন্তু জুয়াতে সব গেল। বাড়ি-গাড়ি সব খুইয়ে প্রায় পথে নামবার অবস্থা। বংশধরদের জন্য তিনি কেবল রেখে গেলেন স্যার জোসুয়ার আঁকা ছবিটা। সে-ছবি এখন বিলেতের জাতীয় আর্ট গ্যালারীতে আছে।

এরপরে আরও কয়েকজন এসেছেন। তবে ইতিহাসে নাম রেখে যাওয়ার মতো কেউ নয়।"

এসব গল্প সাধারণতঃ ছুটির দিনে হয়। ছুটির দিনে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। রবিবারের জন্য অনেক কাজ পড়ে থাকে। বিশেষ করে বাইরের লোকদের চিঠিপত্র লেখা, আগামী সপ্তাহের কেস্‌গুলোর কাগজপত্র তৈরি করে রাখা অন্যদিনে হয়ে ওঠে না।

এমনই এক রবিবারের রৌদ্রঝরা সকালে সায়েব ঘড়ির দিকে তাকালেন। সবে মাত্র ন'টা। লনে গাছের তলায় শরতের স্নিগ্ধ রোদ যেখানে উঁকি মারছে তার খুব কাছেই আমরা সামনা-সামনি বসে রয়েছি। সবুজ বেতের চেয়ারের সঙ্গে সবুজ ঘাসের রঙ এক হয়ে গিয়েছে। কয়েকখানা চিঠি টাইপ করেছি। দূরে একটা গাছের আড়াল থেকে একটা নাম-না-জানা পাখি মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে।

সায়েব হঠাৎ বললেন, "মানুষের রসবোধ সবচেয়ে কম। না হলে পাখির গানের তালে তালে সূর্য যখন শিশিরের সঙ্গে খেলা করছে, তখন তুমি ও আমি আকাট গণ্ডের মতন কাজ করে চলি কেন?" তারপর তিনি পেনের মুখটা বন্ধ করলেন। "ছুটির দিনে বেশি কাজ ভালো নয়। এখন বরং গল্প।"

আমি আনন্দে সায় দিয়ে টাইপরাইটার বন্ধ করলাম।

"কাজে ফাঁকি দিচ্ছি একথা কিন্তু কাউকে বলো না"—কানের কাছে মুখ এনে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সায়েব বললেন। আমি হেসে ফেলি। সায়েব বললেন, "ভাবে মনে হচ্ছে তুমি বিনা ঘুষে

রাজী নও। বেশ, বিপদে যখন পড়েছি তখন ঘুষ দেবো। কী ঘুষ চাও বলো—অরেঞ্জ না লাইম স্কোয়াশ ?"

"দুই-ই সমান, তবে অরেঞ্জ স্কোয়াশ শুধু খেতেই ভালো নয়, দেখতেও চমৎকার।"

বাঃ, এই না হলে বাঙালীর বুদ্ধি। একসঙ্গে রসনা ও চক্ষু পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা। এমন বুদ্ধিমত্তার জন্য তোমার প্রাইজ পাওয়া উচিত। প্রাইজটা হলো আজকের লাঞ্চ।"

আমি বললাম, "না না, লাঞ্চের দরকার নেই। কাজ শেষ হলেই বাড়ি চলে যাবো।"

চোখ বুজে ঘাড়টা নেড়ে সায়েব শুদ্ধ ভাষায় বললেন, "কী জিনিষ হারাইতেছেন আপনি জানেন না! ভুলে যাচ্ছেন যে ইস্ট বেঙ্গলের রান্না চীনের রান্নার সঙ্গে পাল্লা দেয়! আর আমাদের ক্লাবের কুক এসেছে ইস্ট বেঙ্গলের চট্টগ্রাম থেকে।"

বেয়ারা অরেঞ্জ স্কোয়াশ রেখে গেল। গ্লাশে চুমক দিয়ে বললাম, "ঘুষ নেওয়া কিন্তু অপরাধ, জেল পর্যন্ত হতে পারে।"

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সায়েব বললেন, "সেজন্য ভাবনা নেই। জেল দিতে হলে প্রথমে কোর্টে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে আসামী পক্ষ সমর্থন করবেন এমন একজন ব্যারিস্টার যিনি বর্তমানে তোমার সামনেই বসে রয়েছেন।"

মনটা আজ হাল্কা রয়েছে বুঝতে পারলাম। তাই আমার সাহস যেন আরও বেড়ে গেল। পরিহাস-ছলে বললাম, "সে তো সম্ভব হবে না। ঘুষদাতাকেও পুলিশ যে সাক্ষী হিসেবে কাঠগড়ায় তুলবে।"

হেসে উঠলেন সায়েব। "বাঃ, চমৎকার। ব্যারিস্টারের বাবুর মতোই কথা হয়েছে। আইন-টাইনগুলো বেশ শিখে নিচ্ছো বুঝতে পারছি।"

এরপরে আলোচনাটা ফৌজদারি মামলাকে কেন্দ্র করেই চলতে লাগলো। একটু পরেই ইংলণ্ডের ক্রিমিন্যাল কেসের বিচার পদ্ধতির কথা উঠলো। সায়েব বললেন, "ফৌজদারি কেসে বিলেতের সঙ্গে এখানকার অনেক তফাত। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। লণ্ডনে আমি যে ব্যারিস্টারের কাছে

কাজ শিখেছিলাম ফৌজদারি মামলায় তিনি প্রথিতযশা। বহু চাঞ্চল্যকর মামলায় আসামীদের খালাস করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এটর্নিরা মক্কেলের সঙ্গে যখন তাঁর চেম্বারে আসতেন, তখন তিনি গম্ভীরভাবে বলতেন, আজ কাগজপত্র রেখে যান আগামীকাল সন্ধ্যায় আসবেন। পরের দিন এটর্নি ও তাঁর জামিনে মুক্ত মক্কেল হাজির হলে, ব্রীফের লাল ফিতেটা খুলতে-খুলতে তিনি বলতেন, 'আপনার নথিপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। পুলিশের অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার কী বলার আছে ?'

কলকাতায় ব্যারিস্টারি আরম্ভ করার কিছুদিন পরেই এক এটর্নি মক্কেল-সহ আমার কাছে এলেন। ফৌজদারি মামলা। গুরুকে অনুসরণ করে আমিও এটর্নিকে পরের দিন দেখা করতে বললাম। দ্বিতীয় দিন তাঁরা চেম্বারে এলে খুব গম্ভীরভাবে বললাম, 'কাগজপত্র সব দেখেছি। পুলিশের অভিযোগও পড়লাম। এখন এর বিরুদ্ধে আপনি কী বলতে চান ?'

সঙ্গে-সঙ্গে এটর্নি ও মক্কেল আঁতকে উঠে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একটু পরে এটর্নি বিরক্তভাবে বললেন, 'আজ্ঞে সেইটাই যদি জানবো তা হলে আপনার কাছে আসবো কেন ? আসামীর বক্তব্য, অর্থাৎ খুনের সময় আসামী কোথায় ছিল ; নিহত ব্যক্তির সঙ্গে তার কতখানি পরিচয় থাকা উচিত, সে-সব আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

অনেকদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে হাইকোর্টের একজন ইংরেজ বিচারপতিকে এই গল্প বলেছিলাম। বিচারপতি শুনে বললেন, "আমি কিন্তু আরও লজ্জায় পড়েছিলাম। তখন পেশওয়ার হাইকোর্টে নতুন জজ হয়েছি। খুন, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি মামলায় পেশওয়ার বোধহয় ভারতবর্ষের এক নম্বর হাইকোর্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কৃতী আইনজ্ঞের সংখ্যা এই কোর্টে খুবই কম। কৌতূহল-বশবর্তী হয়ে একদিন ওখানকার এড্‌ভোকেট জেনারেলকে এর কারণ জিজ্ঞাসার লোভ সামলাতে পারলাম না। এড্‌ভোকেট জেনারেল প্রথমে উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। শেষে বললেন,—"এর কারণ অতি জটিল। আসল ব্যাপারটা হলো যে, এদেশের খুনী, আসামী ও ডাকাতরা

দেখেছে যে, বড়ো উকিল-ব্যারিস্টারদের পিছনে টাকা খরচ করা অপেক্ষা জুরিদের দিকে নজর দিলে, খরচ অনেক কম হয় অথচ দ্রুত ও নিশ্চিত ফললাভ।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে শুনে যাচ্ছি। অরেঞ্জ স্কোয়াশে আর একটা চুমুক লাগিয়ে সায়েব বললেন, "দেখো, এই জুরিদের নিয়ে সব দেশেই গণ্ডগোল। এমন কি ইংলণ্ডে পর্যন্ত মাঝে-মাঝে কথা ওঠে, জুরির বিচারে কিছু লাভ হয় কিনা। তা ছাড়া অসততার অভিযোগ খুব কম হলেও মাঝে-মাঝে যে শোনা যায় না এমন নয়। তবে হ্যাঁ, সততা সম্বন্ধে চীনদেশের জুরিদের বেজায় সুনাম!"

"বলা বাহুল্য ঘটনাটি চিয়াং কাইশেকী আমলের।" সায়েব অরেঞ্জ স্কোয়াশে আর একটা চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন—"চীনা জুরিরা সোজাসুজি কোনো বে-আইনী অর্থ নেন না। তবে প্রথমদিনে মামলা শেষে যখন জুরি আদালত থেকে বার হবেন তখন রাস্তার উল্টোদিক থেকে মস্ত এক ছাতা নিয়ে অন্য একজন লোককে আসতে দেখা যাবে। এই ছাতা জুরিবাবুর সিগন্যাল। জুরি জিজ্ঞাসা করবেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি কি পাগল? এই চমৎকার শুকনোদিনে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন!' ছাতাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে, 'না মশাই, অতো বোকা আমি নই। আমি আবহাওয়া ব্যাপারে পণ্ডিত লোক। এখনই পাঁচমিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি হবে, সেইজন্যই ছাতা নিয়ে বেরিয়েছি। বিশ্বাস না হয় বাজি লড়ে যান পাঁচহাজার ডলার।' জুরিবাবুও বাজি লড়ে যান। পাঁচমিনিটের মধ্যে কোথায় বৃষ্টি? ছাতাওয়ালা আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে পাঁচহাজার ডলার জুরির হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়!"

"চীনা আসামীদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে", আমি বললাম।

আলোচনাটা ঘুরে-ঘুরে জুরি থেকে সাক্ষীতে হাজির হলো। এদেশের একশ্রেণীর সাক্ষীদেরও সুনামের অভাব নেই। টাকার পরিমাণ অনুযায়ী তারা ঠিক করে কোন্ পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

সায়েব বলতে লাগলেন—"তখন স্বদেশী বোমার যুগ। আলিপুর কোর্টে জজরা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে খাসকামরা থেকে আদালত ঘরে যান। ইতিপূর্বে এই পথেই একজন জজের উপর বোমা ছোড়া

হয়েছিল। খাসকামরা থেকে বেরিয়ে একদিন সকালে জনৈক জজ-সায়েব দেখলেন, পথে একটি লোক দাঁড়িয়ে। লোকটির দুই হাতই চাদরের ভিতর। জজ-সায়েব মনে মনে যে ভয় পেলেন না এমন নয়, তবুও যথাসম্ভব সাহস সঞ্চয় করে, এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? জানো, এখনই তোমাকে পুলিশে দিতে পারি।" লোকটির কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। জজ-সায়েব তবুও সন্দেহমুক্ত হলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোর্টে এসেছো কেন?" লোকটি উত্তর দিলে, "সাক্ষী দিতে।" জজ-সায়েব সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ কেস্-এ? বাদী বিবাদীর নাম কি?" লোকটি আশ্চর্য হয়ে বললে, "আজ্ঞে যে কোনো কেস্ স্যার। পার্টি পেলেই সাক্ষী দিতে পারি।" জজ-সাহেব কোনোরকমে হাসি চেপে এজলাসে চলে গেলেন।

আলিপুরের সাক্ষীর কথায় জনৈক প্রখ্যাত হাস্যরসিক-অভিনীত নক্সায় সাক্ষী গড়গড়ি হাজরার কথা মনে পড়ে গেল। গড়গড়ি হাজরার পেশা সাক্ষ্যদান। বহুকালের ঘড়েল সাক্ষী সে এবং তাকে জেরা করতে গিয়ে উকিলের যে বিপত্তি হয়েছিল শুনে এককালে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

গড়গড়ি হাজরার কথা মনে আসতেই হাসি চেপে রাখা শক্ত হয়ে উঠেছিল।

আমাকে হাসতে দেখে সায়েব বললেন, "আসলে সাক্ষীর বক্তব্যের উপরেই সমস্ত মামলা নির্ভর করে। কিন্তু তারা যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তা হলে জজের পক্ষে নীরং তক্ত্যা ক্ষীরং গ্রহণ করা শক্ত হয়ে ওঠে। মিথ্যে সাক্ষ্যদান অবশ্য সবদেশেই কিছু-না-কিছু হয়। তবে এ-দেশে একটু বেশি।"

সামান্য অরেঞ্জ স্কোয়াশ তখনও গ্লাসের তলায় পড়েছিল। সেটা নিঃশেষ করে মুখ মুছতে-মুছতে সায়েব বললেন, "অবশ্য ফৌজদারি কেসে আসামীরাই যে একতরফা মিথ্যা সাক্ষী হাজির করে, বললে সত্যের অপলাপ হয়। উঁচু পুলিশ মহলে এই নিয়ে এক পকেটমারের গল্প চালু আছে। পকেট মারার জন্য যখন তার তিনমাসের জেল হলো, তখন পকেটমার ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিল, "হুজুর পকেট মেরেছি সত্যকথা। কিন্তু রাত সাড়ে-এগারোটায়

নির্জন রাস্তায় পকেট মারলাম, অথচ পুলিশ তিনজন সাক্ষী হাজির করলে কী করে বুঝতে পারছি না।"

আমার হাসিতে ফেটে পড়বার মতো অবস্থা। একটু থেমে সায়েব বললেন, "না, আলোচনা লঘু হয়ে যাচ্ছে। আমি আবার এমন সাক্ষী দেখেছি যে প্রাণের মায়া করে না। অদ্ভুত সাহস। অনেকদিন হয়ে গিয়েছে কিন্তু একটুও ভুলিনি তাকে।" সায়েব বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

"কে সে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"নরেন মণ্ডলের কথা তোমাকে কি আগে বলিনি?"

"না তো।"

তিনি আবার ঘড়ির দিকে চাইলেন। "লাঞ্চে বসতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। রৌদ্রটা বেশ চড়ে উঠেছে। চলো, ঘরের ভিতর যাওয়া যাক।"

ঘরের ভিতর বসে তিনি আরম্ভ করলেন নরেন মণ্ডলের গল্প—

সায়েবের ব্যারিস্টারি আরম্ভ করার কয়েক বছর পরের ঘটনা। মফস্বলের ছু'-একটা শহরে যাওয়া হলেও কলকাতার বাইরে বাঙলাদেশের সঙ্গে তাঁর তখনও বিশেষ পরিচয় হয়নি। তাঁর ড্রাইভার প্রভাত মণ্ডলের বাড়ি বরিশাল। ধর্মে খ্রীস্টান হলেও গ্রামের চাষ আবাদেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

একদিন ছুপুরে সায়েব চেম্বারে কাজ করছিলেন। হঠাৎ প্রভাত এসে কাঁদতে শুরু করলো—"আমার সর্বনাশ হয়েছে।" সায়েব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। প্রভাতের কান্না থামিয়ে বহু কষ্টে যা জানা গেল, তাতে চিন্তিত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

বরিশালে প্রভাতদের পাশের গ্রামে কেবল হিন্দুদের বাস। হিন্দুরা নাকি তাদের দেখতে পারে না। শেষপর্যন্ত হিন্দুরা দলবল নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্য বাধা দিতে গিয়ে অনেক হতাহত হয়। অথচ পুলিশ কেবল প্রভাতদের গ্রামের লোকদের গ্রেপ্তার করেছে। নরহত্যার ও দাঙ্গার অভিযোগ।

প্রভাত কান্নায় ভেঙে পড়ে। "আমার কাকা, জ্যাঠা, নিজের

ভাই সবার ফাঁসি হয়ে যাবে। আমরা যে খ্রীস্টান। হিন্দুরা কাউকে ছাড়বে না।”

ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে অবশেষে প্রভাতকে সঙ্গে করে সায়েব বরিশালের সুখদা গ্রামে রওনা হলেন।

সুখদা গ্রামকে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার জন্য আধুনিক যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। স্টীমারঘাট থেকে খাল বেয়ে নৌকাযোগে মাইল পাঁচেক যেতে হয়। সেখান থেকে পাল্কি একমাত্র বাহন।

সায়েব বলছিলেন, “ট্রেন থেকে বাঙলাদেশের শস্যশ্যামল রূপ এর আগে দেখেছি সত্য। কিন্তু সে-দেখা দূরের দেখা। সুখদার পথে পাল্কি থেকে বাঙলাদেশকে অতি নিকট থেকে দেখার প্রথম সুযোগ পেলাম। চালচলনে চাকচিক্য না থাকলেও এক সরল নিরাভরণ স্নিগ্ধতা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। পাল্কি দুলে-দুলে চলে, আমার অদ্ভুত লাগে। মনে হয় যেন বর্তমান থেকে ফিরে যাচ্ছি এক অতি প্রাচীন যুগে। বেহারাদের অস্পষ্ট গোঙানিতে ভয় পেয়ে থামতে বলি। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বোধ হয় খুব ক্লান্ত? তারা হাসতে থাকে। প্রভাত বলে, না সায়েব, ওরা মুখে অমন আওয়াজ করে। তাতে ওদের চলতে সুবিধা হয়।”

গ্রামাঞ্চলের দিবাবসান। এই বিদেশীকে বহন করে পাল্কি চলেছে আলের উপর দিয়ে। সুখদা গ্রামের খুব কাছেই ডাক-বাংলো। সেখানে যখন পাল্কি থামলো সূর্য তখন পৃথিবীর কাজ শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছেন। দীর্ঘ ভ্রমণে সায়েব ক্লান্ত, তাই সময় নষ্ট না করে সামান্য কিছু খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একদল পোকা তাদের নাইট-ক্লাবে কনসার্ট বাজাতে ব্যস্ত।

ঘুম ভাঙলো মোরগের অবিশ্রান্ত ডাকে। সূর্যের আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুপারি গাছগুলো যেন ঘুম থেকে উঠে রোদ পোয়াচ্ছে। বারান্দায় চেয়ারে বসে সায়েব দেখছিলেন একটা লোক কোমরে গামছা বেঁধে তরতর করে খেজুর গাছের মাথায় উঠে গেল। সেখানে লালরঙের মাটির পাত্র ঝুলছে। স্নানের ডাক পড়েছে, সায়েব ভিতরে চলে গেলেন।

স্নানঘর থেকেই বেশ কিছু লোকের গলার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। বেরিয়ে এসে দেখলেন, সুখদা গ্রামের অনেকে দেখা করতে এসেছে। বাঙালী প্রথায় হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সায়েব সবার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজন ভয়ে দূরে সরে গেল, খুব কাছে গেলে পাছে সায়েব চটে যান। দু'-একজন সঙ্গে ডাব এনেছে। "কোকোনাট স্যার, ভেরী গুড্ ভেরী সুইট।" সায়েব হেসে বললেন, "বোঝাতে হবে না, কলকাতায় অনেক ডাব খেয়েছি। বিলেতেও পাওয়া যায়।"

দলের কয়েকজনের ডাক পড়লো। সেদিনের ঘটনার বিবরণ তাদের মুখে সায়েব শুনতে চান।

গ্রামের মোড়লদের চোখ বড়ো-বড়ো হয়ে উঠলো। "আমরা নিরপরাধ। পাশের গাঁয়ে হিন্দুদের বাস। সেখানে আমাদের ধীরেন এক বিঘে জমি কেনে। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের দেখতে পারে না। সকালে ধীরেনরা লাঙ্গল দিতে যাবার কিছু পরেই ওরা দল বেঁধে তেড়ে আসে ; বলে জমিতে চাষ করতে দেবে না। সঙ্গে তাদের লাঠি-সোটা। মারামারিতে আমাদের অনেকে জখম হয়েছে। কিন্তু পরেরদিন পুলিশ গাঁয়ের অর্ধেক লোককে চালান দিলো। আমরা শুনলাম, হিন্দুদের কে একজন খুন হয়েছে। হিন্দু পুলিশ, সে-তো আমাদের ধরবেই, কিন্তু আমরা কিছুই জানি না।"

"আপনারা একদম কিছু জানেন না, কেমন করে সম্ভব ?"

উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, "সত্যি আমরা নিরপরাধ। খ্রীস্টানদের এখানে কেউ দেখতে পারে না!"

সায়েব আবার বললেন, "দেখুন, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন যারা এখন হাজতে রয়েছে, তাদের বাঁচাতে হলে আমাকে সব কিছু জানতে হবে। হিন্দুদের একজন খুন হয়েছে, অথচ আপনাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, কী করে বিশ্বাস করি ?"

সবাই ভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। তারা যে কিছু চেপে রাখতে চেষ্টা করছে তা সায়েবের বুঝতে দেরি হলো না।

"সত্যকথা না বললে এ-মামলায় আমি কিছুই করতে পারবো না। হিন্দুরা দল বেঁধে মারতে এল, আপনারা নিরস্ত্র, অথচ তাদের একজনের মৃত্যু হলো—অবিশ্বাস্য। আসল ঘটনা আপনারা যদি

না বলেন, আমি আর সময় নষ্ট করতে পারবো না, আজকেই কলকাতায় ফিরবো।"

ফিসফিস করে বাংলায় আলোচনা চলতে থাকে। এমন সময় পিছনের একটি ছেলের দিকে সায়েবের নজর পড়লো। সে যেন সামনে আসতে চাইছে, অথচ কয়েকজন লোক তাকে জোর করে ধরে রেখেছে। কিছুতেই এগোতে দিচ্ছে না। সায়েব তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ডাকলেন। সে এবার লোকগুলোর হাত ছাড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। পিছনের এক বৃদ্ধ হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো, "ও বাবা, তুই যাস না। ও বাবা তুই যাস না।"

ছেলেটি একবার পিছন ফিরে আবার সামনে তাকালো। সুঠাম ইস্পাতের মতো চেহারা। বয়স বোধ হয় আঠারো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের দীর্ঘ শরীর যৌবন-দীপ্তিতে পরিপূর্ণ।

সবাইকে চলে যেতে বলে সায়েব ঘরে ঢুকে গেলেন, পিছনে ছেলেটি। নাম নরেন। সায়েব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আধঘণ্টা পরে সায়েব দরজা খুলে নরেনের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। "পারবে তো বলতে?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন। "নিশ্চয়ই পারবো। সত্যকথা বলার সৎসাহস আমি রাখি।" বুক ফুলিয়ে নরেন উত্তর দিলে।

"বাঃ, এই তো স্পোর্টসম্যানের মতো কথা।"

ছেলেটি নমস্কার করে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

কী যেন ভাবলেন সায়েব। ডাকলেন, "নরেন, নরেন শুনে যাও।" নরেন আবার ফিরে এল। তিনি বললেন, "তোমাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি। কোর্টে গিয়ে পিছিয়ে আসবে না তো?"

নরেন বোধ হয় সামান্য বিরক্ত হলো। বললে, "আমি যে মুগুর দিয়ে ব্যায়াম করি সেটা ছুঁয়ে বলতে পারি, পিছিয়ে আসবো না।"

পিঠে স্নেহভরে একটা চাপড় দিয়ে সায়েব বললেন, "কিন্তু মনে থাকে যেন স্বেচ্ছায় তুমি এই পথে এসেছো। সমস্ত বিপদ জেনেই তুমি মত দিয়েছো। সেটা তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"যা সত্য তা বলার স্পর্ধা আমি রাখি। তাতে যা হয় হবে," নরেন বুক ফুলিয়ে বললে।

শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে সায়েবের চোখ দুটো বড়ো-বড়ো হয়ে উঠলো। নরেনকে বললেন, "কিন্তু খুব সাবধান। এখন যেন ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশ না হয়। তা হলে সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে। কেউ যেন না জানতে পারে।"

নরেন সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলো।

কিছুদিন পরের কথা। বরিশাল কোর্টে তিল ধারণের স্থান নেই। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার এসেছেন, ভয়ঙ্কর মামলা। সমস্ত শহরে চাঞ্চল্য। সবাই দেখতে চায় ব্যারিস্টাররা কেমন করে কেস্ করে। কাঠগড়ায় সতেরোজন আসামী, ঘোরতর অপরাধে অভিযুক্ত। অভিযোগ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিশ্চিত।

পাবলিক প্রেসিকিউটর রজত সেন মামলার উদ্বোধন করলেন। পুলিশের ঘোরতর অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। গত দশই জানুয়ারী সুখদা গ্রামের একদল খ্রীস্টান দলবদ্ধভাবে পাশের গ্রামের একটি অসহায় হিন্দু পরিবারকে আক্রমণ করে। আসামীদের হাতে ছিল তীক্ষ্ণ ও বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র। হিন্দু ও খ্রীস্টান পরিবারদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেকদিনের। এই ঘটনার পূর্বে খ্রীস্টানদের মধ্যে বহু গোপন বৈঠকের সংবাদ পুলিশের জ্ঞাত। রাতের আঁধারে তাদের অধিকাংশ কার্যকলাপ।

হিন্দুদের বাড়ির কর্তা যখন বাধা দিতে এসে নিহত হন বাড়িতে তখন শুধু স্ত্রীলোকেরা ছিলেন। তাঁদেরই একজন শুধু আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে বেরিয়ে আসেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শিনী সেই ভদ্রমহিলাটিকেও সরকার সাক্ষ্য দেবার জন্য সময় মতো আহ্বান করবেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির অমুক অমুক ধারায় এক, তিন ও সাত নম্বর আসামী অভিযুক্ত। ভারতীয় দণ্ডবিধির অমুক ধারায় অমুক উপধারায় চার, ছয়, বারো ও চৌদ্দ নম্বর আসামী অভিযুক্ত। এমন করে রজত সেন সতেরোজন আসামীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ পাঠ করে গেলেন।

বক্তৃতায় যতি পড়লো। জজ-সায়েব চোখের চশমা নামিয়ে নথিপত্রের দিকে নজর দিলেন। জুরিরা তাঁদের সামনের কাগজে কি সব লিখলেন। জজ-সায়েব একে-একে প্রত্যেক আসামীকে সম্বোধন করলেন, "তোমাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এসেছে সে

সম্বন্ধে কোনো কিছু বলার আছে?” ধীরে-ধীরে সবাই বললে, “ধর্মাবতার, অভিযোগ মিথ্যা, আমরা নিরপরাধ।”

সাক্ষ্য শুরু হয়। অনেক সাক্ষী। কেউ খ্রীস্টানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রমাণে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো। কেউ হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাস্থলের বর্ণনা দিলো। দূর থেকে তারা একটি দলকে পালাতে দেখেছে। তাদের মুখ চেনা সম্ভব নয়, তবে তারা সুখদা গ্রামের দিকেই পালায়। ডাক্তার সাক্ষ্য দিলেন, কোনো গুরুভার অস্ত্রের আঘাতের ফলেই অঘোর রায়ের মৃত্যু হয়। আঘাতের কয়েকমিনিটের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। তবে দেহের অন্যান্য অংশেও সামান্য আঘাতের চিহ্ন ছিল। আরও অনেক সাক্ষী কাঠগড়ায় এল। ঈশ্বরের নামে শপথ করে তাদের বক্তব্য জজ-সায়েবকে শোনালো।

এবার প্রত্যক্ষ্যদর্শিনীর সাক্ষ্য। পাবলিক প্রসিকিউটর রজত সেন জানালে, “ধর্মাবতার, এবার এই নাটকীয় ঘটনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে আপনার সম্মুখে হাজির করবো।”

রাইমণি দেবী কাটগড়ায় দাঁড়ালেন, তাঁর দেহের কিছুই দেখা যায় না। টানা ঘোমটা—যেন একটা শাড়ি ধীরে-ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সবার চোখের সামনে হাজির হলো। রাইমণি দেবীর ভয়ানক লজ্জা, অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার সাধতে হয়। তখন আস্তে-আস্তে উত্তর দেন। প্রশ্ন মনঃপুত না হলে তাঁর মাথাটা নড়ে ওঠে। চুড়ির ঠিনিঠিনি আওয়াজ হয়।

রজত সেনের প্রশ্নপর্বের পর সায়েব উঠলেন। জেরা করতে হবে। একজন ইণ্টারপ্রেটার সায়েবের প্রশ্ন বাংলা করে সাক্ষীকে শোনান ও তাঁর উত্তর ইংরেজীতে জজ-সায়েবকে বলেন।

“রাইমণি দেবী, মৃত অঘোর রায় আপনার কে?” সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তর—“আমার ভাশুর।”

“আপনার বয়স কত?”

চুড়ির ঠিনিঠিনি আওয়াজ হয়, মাথাটা নড়ে ওঠে। ইণ্টারপ্রেণ্টার বললেন, ধর্মাবতার, উনি লজ্জা পেয়েছেন উত্তর দিতে চাইছেন না।

আবার প্রশ্ন, "রাইমণি দেবী, আপনার বয়স কত ?"

আবার চুড়ির ঠিনিঠিনি। তবে উত্তর এল, "অনেক।"

"এই দাঙ্গা যখন ঘটে তখন আপনি কী করছিলেন ?"

"মুড়ি ভাজছিলাম।"

"তখন সময় কত ?"

"আমাদের বাড়িতে ঘড়ি নেই ?"

"তবু আন্দাজ।"

"সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পরে।"

রাইমণি দেবী ক্রমশঃ বললেন, ভয়ানক আওয়াজ শুনে তিনি বাইরে ছুটে আসেন। সত্তর-আশিজন লোক পাগলের মতো তাঁদের পাশের জমির দিকে ছুটে আসছে। হাতে তাদের কতরকমের যন্তর। লাঠি-সোটা তো আছেই। একসঙ্গে তাদের দেখেছেন, তাই সকলকে চিনে রাখা সম্ভব নয়। তবে যারা কাছাকাছি ছিল রাইমণি তাদের মুখ ভোলেননি।

"ওই যে ছ' নম্বর আসামী, ওই আমার ভাশুরের হাত চেপে ধরে। চার নম্বর আসামী তাঁর চুলের মুঠিতে হাত দেয়। তিন নম্বর তখন লাঠি ঘুরিয়ে নাচছিল। দু'নম্বর তাঁর মুখে ঘুষি মারতে থাকে।" এসব রাইমণি দেবীর ছবির মতো মনে আছে। তারপর কোথা থেকে এক নম্বর আসামী তীরের মতো ছুটে এল। হাতে তার একটা অদ্ভুত যন্ত্র, রাইমণি দেবী তার নাম জানেন না।

সবাইকে সরিয়ে দিয়ে দুরন্ত পশুর মতো সেই যন্ত্রটা দিয়ে এক নম্বর আসামী আমার ভাশুরকে …" রাইমণি দেবী আর বলতে পারলেন না। কান্নার শব্দ শাড়ির আবরণ ভেদ করে কোর্ট-ঘরে ছড়িয়ে পড়লো।

"রাইমণি দেবী, এবার আপনার সামনে একটি ছেলেকে হাজির করবো।"

কোর্টের মধ্যে নরেনকে দেখা গেল। সে কাঠগড়ার খুব কাছে রাইমণি দেবীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

"ছেলেটিকে ভালো করে দেখুন, চেনেন কিনা।"

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একটি তীব্র দৃষ্টি নরেনের উপর এসে পড়ে। কিছুক্ষণ নীরবতা। "না একে কখনো দেখিনি।"

"খুব ভালো করে দেখুন, সেদিন ঘটনাস্থলে ছেলেটিকে দেখেছেন কিনা।"

"না, দেখিনি।" রাইমণি দেবী দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন।

সরকারপক্ষের সাক্ষ্য এখানেই শেষ। লাঞ্চের পর সায়েব উঠলেন। বললেন, "ধর্মাবতার, আমি মাত্র একটি সাক্ষী উপস্থিত করবো।" জজ-সাহেব চমকে উঠলেন, "সরকারপক্ষে যেখানে পঁচিশজন সাক্ষী সেখানে আপনার মাত্র একজন?" তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

"ইওর অনার, সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার সাক্ষীর বক্তব্য অনেককেই চমকিত করতে পারে। তার বক্তব্য অবিশ্বাস্য বলে অনেকের সন্দেহ হতে পারে। এই মামলার আসল সত্য উদ্ধারের জন্য প্রথম থেকে আমি আগ্রহশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সব সময় প্রকৃত সত্যের প্রতি আমরা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করি না। এদেশের বিচারকের পক্ষে তাই প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা ও অতিভাষণের খাদ থেকে মুক্ত করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটি বিশেষ পক্ষের হয়ে এখানে উপস্থিত হলেও আমি বিচারকের সেই কঠিন কর্তব্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।"

নরেন কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। তার দৃষ্টি কঠিন, মুখাবয়ব ভয়লেশহীন।

"নরেন, এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তুমি কী জানো?"

"এই হত্যার জন্য দায়ী আমি নিজে। আমিই হত্যাকারী।"

ঘরে যেন বাজ পড়লো। জজ-সায়েব চমকে উঠলেন। জুরিদের ফোরম্যান নিজেদের অজান্তে বলে উঠলেন "এ্যাঁ"। রজত সেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

"হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি। সেদিন খুব সকালে আমার দুই কাকার সঙ্গে হিন্দুদের গাঁয়ে আমাদের নতুন জমিতে লাঙ্গল দিতে যাই। আমি নিজে চাষ করি না। শুধু শখ করে কাকাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। সকালে খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা আমার অনেক দিনের অভ্যাস। জমিতে এসে ছোটোকাকা লাঙ্গল ধরলেন, মেজোকাকা হুঁকা টানতে লাগলেন। আমি একটু দূরে মুগুর

ভাঁজতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে মেজোকাকা লাঙল ধরলেন, এবার ছোটোকাকার বিশ্রাম। জমির লাগোয়া যাঁদের বাড়ি সেই অঘোর রায় ছুটে এলেন। জমিতে লাঙল চালানোয় তাঁর আপত্তি; এ-জমির জন্য তিনি নাকি আগেই বায়না দিয়েছেন। ছোটোকাকা মানতে রাজী নন। টাকা দিয়ে তাঁরা জমি নিয়েছেন। কে আগে বায়না করেছিল তাতে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ক্রমশঃ বচসা বেড়ে উঠে। অঘোর রায় হঠাৎ ছোটোকাকার পেটে সজোরে লাথি মারলেন। ছোটোকাকার চিৎকারে আমি দ্রুতবেগে ছুটে এলাম। অঘোর রায় তখন ছোটোকাকার বুকের উপর বসে তাঁর গলা টিপে ধরায় চেষ্টা করছেন। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। দুরন্ত রাগে কোন্ সময় ডান হাতের মুগুরটা অঘোরের মাথায় বসিয়ে দিয়েছি নিজেই জানি না। অঘোর মাটিতে শুয়ে পড়তে সম্বিত ফিরে পেলাম। একি করেছি! অঘোরের মাথা ফেটে রক্তের নদী বইছে। দেহ নিশ্চল। লাঙল নিয়ে আমরা তিনজন দ্রুতবেগে পালালাম।

তারপর পুলিশের অনুসন্ধান। আমাদের গ্রামের প্রায় সবাইকে তারা হাজতে নিয়ে যায়। শুধু আমিই কেমন করে বাদ পড়ে যাই। আমি তখন পাশের গ্রামে বোনের বাড়িতে রয়েছি।"

কোর্টঘর নিস্তব্ধ। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে হত্যাপরাধ স্বীকার, এর আগে কেউ দেখেনি। ছেলেটির আইনের হাতে পরিণামের কথা কল্পনা করে অনেকে শিউরে উঠলো। আহা রে, কতই বা বয়েস!

সায়েব আবার দাঁড়ালেন। "ধর্মাবতার, আমি আর কোনো সাক্ষী উপস্থিত করবো না। আসামী পক্ষের মামলা এইখানেই শেষ।"

জজ জুরিদের দিকে তাকালেন। ধীরে-ধীরে মামলার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করার কর্তব্য তাঁরই, দোষী নির্দোষ নির্ধারণের ভার জুরিদের। রুদ্ধদ্বার আলোচনার জন্য জুরিরা কোর্টঘর ত্যাগ করলেন। অধীর আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করছে। জুরিদের কত দেরি হবে কে জানে?

কিন্তু বেশি দেরি হলো না মাত্র পাঁচ মিনিট। জুরিরা ফিরে এসেছেন। জুরিদের ফোরম্যান উঠে দাঁড়ালেন।

মিস্টার ফোরম্যান, এণ্ড জেন্টলমেন অফ দি জুরি, হ্যাভ ইউ কাম টু এ ডিসিশন?

"ইয়েস ইওর অনার।"

"নট গিল্টি।"

আসামীরা মুক্ত।

কোর্টঘরের বাইরে সুখদা গ্রামের অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মুখে হাসি। গম্ভীরমুখ নরেনও তাদের মধ্যে রয়েছে। সায়েব তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "তুমি আমাদের হিরো। সত্যকথা বলবার এমন সৎসাহস আমি কখনও দেখিনি। তোমার জন্যই এতোগুলো নিরপরাধ লোকের মুক্তি হলো।"

কিন্তু সবার মুখ হঠাৎ আবার কালো হয়ে উঠলো। নরেনের বাবা কাঁদছেন। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "কিন্তু আমার যে সর্বনাশ হলো। নরেনের তো ফাঁসি হয়ে যাবে।"

সায়েব হাসলেন। নরেনের বাবাকে বললেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনার ছেলে হত্যাকাণ্ডের দিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। কিন্তু আর বিশেষ ভয় নেই। আপনার ছেলেকে এখন পুলিশ ধরে কিছুই করতে পারবে না।. কেননা কেবল আদালতে নরেনের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে শাস্তি-বিধান আইন-সঙ্গত নয়। তার জন্য আরও সাক্ষ্যের প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ সাক্ষী কোথায় পাবে? এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী রাইমণি দেবী তো আদালতে বলেই দিয়েছেন নরেনকে তিনি ঘটনাস্থলে দেখেননি। নরেনের বিরুদ্ধে নতুন কেসে তিনি আবার বলতে পারেন না যে, নরেনকে তিনি দেখেছেন। সুতরাং···।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন সায়েব। বললেন, "চলো, এবার মধ্যাহ্ন ভোজনপর্বটা শেষ করে নেওয়া যাক।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পুলিশ নরেনকে তারপর কী করলো?"

সায়েব বললেন, "আমরা কয়েকমাস অপেক্ষা করলাম। কিন্তু পুলিশ কিছু করতে সাহস করলো না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো? কলকাতার তখনকার পুলিশ কমিশনারকে একদিন আমি এই গল্পটা শুনিয়ে বলেছিলাম, এই রকম সাহসী ছেলে, যে

ফাঁসিকাঠের ভয় না করে কোর্টে সত্যকথা বলতে পারে, তাকে পুলিশবাহিনীতে নেওয়া উচিত। পুলিশ কমিশনার আমার কথা রেখেছিলেন। নরেন পুলিশে কাজ করে।"

বেশ লম্বা ছুটি। হু'মাসের কিছু বেশি। পূজার আগেই হাইকোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে। হঠাৎ যেন যাহুকরের মন্ত্রে ঘুমিয়ে পড়বে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীট। রাস্তায় একজন লোকও দেখা যাবে না। চায়ের দোকানগুলোও মাসখানেকের জন্য ঝাঁপ বন্ধ করে দেবে। টেম্পল চেম্বারের একতলার পানওয়ালাও দোকান বন্ধ করে তার লালরঙের টিনের স্যুটকেসে বউ-এর শাড়ি, ছেলের ইজের ও জামা, একটা গন্ধ তেল ও চিত্রতারকাদের প্রিয় সৌন্দর্য-সাবান বোঝাই করবে। তারপর সোজা চলে যাবে হাওড়া স্টেশন। ঝিমিয়ে পড়বে টেম্পল চেম্বার। একজন বাদে লিফটম্যানরা ছুটি পেয়ে যাবে। হাইকোর্টেও হু'জন বাদে অন্য জজদের ছুটি। তাঁরাও ছুটবেন দূরদূরান্তে নতুন বায়ু সেবনের লোভে। যে হু'জন জজ কলকাতায় পড়ে থাকেন, তাঁদের নাম ভেকেশন জজ। কলকাতার হুর্গাপূজা দেখেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জরুরী কেসগুলোর বিচারের দায়িত্ব তাঁদের। জরুরী না হলে কিন্তু তাঁরা কেস ধরবেন না। কেউ এসে বলবে, ধর্মাবতার অমুক বাড়িটা আমার অমুক আত্মীয় বেআইনিভাবে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু আসলে বাড়িটা ওর একার নয়। জজ-সায়েব বললেন, "ঠিক্ আছে। হাইকোর্ট খুললে হু'পক্ষের মতামত শোনা যাবে। এখন বাড়ি ভাঙা বন্ধ থাক। ইনজাংশন দিলাম।"

ছুটির আগে বেজায় কাজ সবার। বাবুরা দিনরাত ছুটোছুটি করছেন। সায়েবরা এটর্নির বিল্ পাঠিয়েছেন, সেসব আদায় করতে হচ্ছে। সারাবছরের হিসেব চুকিয়ে দেওয়া হয় এই সময়। এটর্নি আপিসে সন্ধ্যার পরও কাজ হচ্ছে। টাইপিস্টরা রাত আটটা অর্যন্ত বিল্ তৈরি করছে, ক্লায়েন্টদের কাছে তাড়াতাড়ি বিল্ পাঠাতে হবে। নাকে চশমা লাগিয়ে বিলবাবু বিলে টিক দিয়ে যাচ্ছেন। এ-ক'দিন আপিসের খরচায় চারখানা কচুরি, এক

আনার আলুর দম ও একটা দানাদার বরাদ্দ। তাছাড়া চা তো আছেই। এটর্নি আপিসে বিলবাবুর খাতির সব চেয়ে বেশি। আপিসের কাজকর্মের নাড়ীনক্ষত্র তাঁর জানা। কানে কলম গুঁজে টুলের উপর অনেক সময় উবু হয়ে বসে তিনি বিড়ি ধরান। টাইপিস্ট চক্রবর্তীকে ডেকে বললেন, "চক্কোত্তি কাজে যে বড্ডো আঠা দেখছি। একটা বিড়ি খেয়ে নাও।" চক্রবর্তী বলে, "এই যে দাদা, অরিজিনেটিং সামনস্‌টা আজকে এনগ্রোস্ করে রাখতেই হবে। কাল সকালে ফাইল হবে। তা বারো আনা মেরে দিয়েছি। আচ্ছা থাক, বাকী চার আনা একটু জিরেন দিয়েই করা যাবে।" পকেট থেকে পুরনো টাইপরাইটার রিবনের একটা কৌটা থেকে চক্কোত্তি বিড়ি বার করে ধরায়। তারপর চেয়ারটা একটু বিলবাবুর দিকে বেঁকিয়ে নিয়ে বলে, "কি রকম হালচাল বুঝছেন দাদা?" ঠোঁট তুমড়ে হতাশার ভাব প্রকাশ করে বিল্‌বাবু বললেন, "আর ভায়া, এবারে মাত্র পনেরো হাজার টাকার বিল্। গতবার কুড়ি হাজার হয়েছিল। তার আগের বারে বাইশ হাজার।"

চক্কোত্তি বললে, "জেনারেল মার্কেটই খারাপ দাদা। খেতে পেলে তবে তো লোকে কেস্ করবে।"

বিল্‌বাবু রাজকেষ্ট হাজরা একমত হলেন না। একটু রেগেই বললেন, "কচু জানো তুমি। এ শালা এমন জিনিস যে খেতে না পেলেও লোকে কেস্ করবে। দশ নম্বরের এ. পি. বাসু কোম্পানি এবার কত বিল করেছে জানো? একলাখ পঁচিশ হাজার!"

"এক লা-আ-খ পঁ-অ-চিশ হাজার!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের মতো চুনোপুঁটি নিয়ে ওরা কারবার করে না! বড়ো-বড়ো রাজামহারাজা মারোয়াড়ী ওদের ক্লায়েন্ট।"

"কেন আমাদের তো সোহনলালজী রয়েছেন, দুটো তেল-কলের মালিক।" চক্কোত্তি নিজের আপিসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য বেশ উদ্‌গ্রীব হয়েই বললো।

"ওদের রামদাস হরিরাম তোমার দশটা সোহনলালকে কিনে রাখতে পারে। সোহনলাল একটা পার্টি নাকি, প্রতিবার বিল্ কমাবার জন্য লেখে। আর ওদের পাটকল, চিনিকলের মালিকরা বিল্ কখনো উল্টিয়ে দেখে না। সঙ্গে-সঙ্গে চেক পাঠিয়ে দেয়।"

"বলেন কি ?"

চক্রবর্তীর কথায় বোধহয় সামান্য অবিশ্বাসের ভঙ্গি মেশানো ছিল। কেননা, রাজকেষ্টবাবু বেশ রাগতস্বরে বললেন, "বাপু, এসব পরের মুখে ঝাল খাওয়া খবর নয়। আমার ভায়রাভাই ছেনো সামন্ত ওখানকার কোর্ট-ক্লার্ক।"

এবার অবিশ্বাসের আর কিছু রইলো না। চক্রবর্তী বললে, "স-সব যাক দাদা, এবার বোনাসের হাওয়া কি রকম বুঝছেন ? আর ক'টা দিনই বা আছে।"

বোনাসের খবরে, অন্য যারা এতোক্ষণ কাজ করছিল তারাও কাজ বন্ধ করে রাজকেষ্টর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রাজকেষ্টবাবু বললেন, "এবার কিন্তু একমাসের হচ্ছে না। বড়ো, মেজো ও ছোটোকর্তার মধ্যে আলোচনা হচ্ছিলো সেদিন। ছোটোবাবু বললেন, ঢালা পঁচিশ টাকা করে প্রত্যেককে দেওয়া হবে। একমাসের দেওয়া হবে না। বড়োকর্তা তবু একবার বলেছিলেন, অন্ততঃ তিন সপ্তাহের মাইনে দাও। তা ছোটো ও মেজোকর্তা কেউ রাজী হলেন না।"

সকলের মুখে যেন কালি ছিটিয়ে দিয়ে গেল। কোর্ট-ক্লার্ক হরিসত্য একটা অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, "শালা পঁচিশ টাকায় মাগের একটা শাড়িও হবে না যে। বড়োকর্তার তবু প্রাণটা ভালো ; কিন্তু ওই কেমন মিনিমিনে স্বভাব, ছোটোভাইদের কথার উপর কথা বলবে না।"

রাজকেষ্টবাবু এবার একটু মালিকের পক্ষ ঝুঁকে কথা বললেন। "আরে বাপু, দেবেই বা কী করে ? শুনতে পনেরো হাজার টাকার বিল্। ওর মধ্যে এগারো হাজার তো 'আউট অফ পকেট' খরচা। দশ হাজার তো ব্যারিস্টারের পেটে চলে যাবে।

রাজকেষ্টবাবু এবার একটু জোর দিয়ে বললেন, "অশোক দাশগুপ্ত তো অলরেডি ছ' হাজার টাকার বিল্ পাঠিয়েছে। ওখানে তো এক পয়সা কমানো যাবে না। ওঁর বাবুরই বা কি তেজ ! একমিনিট দেরি হলেই বলবেন, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। অন্য কাজ আছে।"

সকলের রাগটা শেষপর্যন্ত ব্যারিস্টারের উপর গিয়ে পড়লো। এবারে বোনাস না পাবার জন্য যেন ব্যারিস্টাররাই দায়ী।

এদিকে বাবুদের বেঞ্চিতেও জোর আলোচনা চলছে। দু'-একজন বাবু গালিগালাজে এটর্নির আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন—টাকা আদায় করা ঝকমারি কাজ। তাগাদা দিয়ে জুতোর হাফসোল ক্ষয়ে গেল অথচ টাকা আদায়ের নাম নেই। একজন বললে, "সামনে পুজো, অথচ একটা পয়সা তহুরী পাচ্ছি না। ছ'নম্বরে মিত্তিরের কাছে অনেকগুলো টাকা পাবার কথা ছিল। ব্যাটা এখন বলে, দাঁড়ান মশায় আপনার সায়েবের বিল্ মেটাই আগে। আপনারটা বড়োদিনের সময় দেওয়া যাবে।"

তারপর আলোচনা আরম্ভ হলো, আগামী ছুটিতে কে কোথায় যাবে। হারুবাবু বললেন, "আমার সায়েব এবার শিলং যাচ্ছেন।" অর্জুনবাবু বললেন, "আমার সায়েব আরও দূরে, মুসৌরী।" ভবানীবাবু বললেন, "আমার সায়েব আরও দূরে কাশ্মীর যাচ্ছেন।"

কিন্তু সবাইকে হারিয়ে দিলেন অশোক দাশগুপ্তের বাবু। "আমার সায়েব এবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বছরকয়েক যাওয়া হয়নি। ছুটি হবার আগের দিনই বোম্বাই চলে যাচ্ছেন। ওখান থেকে জাহাজ ধরবেন। অবশ্য ফিরবেন উড়োজাহাজে।" অশোক দাশগুপ্তের শ্বশুরবাড়ি যে বিলেত সবাই জানে। অর্জুনবাবু আর লোভ সামলাতে পারলেন না। বললেন, "তা তোমার সায়েব মাইরি দেখে-দেখে ভালো জায়গায় শ্বশুরবাড়ি করেছেন। বিলেতের মতো জায়গায় শ্বশুরের ঘাড়ে থাকবেন।"

বাগচী সায়েবেরও শ্বশুরবাড়ি বিলেতে। তাঁর বাবু সুনীল বললে, "না হে না, বিলিতী শ্বশুররা জামাইদের বিশেষ খাতির করে না। এই তো আমার সায়েবের শাশুড়ী প্রায়ই চিঠি লেখে, কিন্তু কখনও জামাই-ষষ্ঠীতে নেমতন্ন করেছে?"

হাহা করে হেসে উঠলো সবাই। তারপর একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের সায়েবরা তো হিল্লী-দিল্লী যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

অর্জুনবাবু বললেন, "আমি যাচ্ছি ডোমজুড়ে। অনেকদিন দেশে ঘরে যাওয়া হয়নি। তা হারু কোথায় যাবে? তুমি তো হাজরা সায়েবের কাছ থেকে একমাসের বোনাস বাগিয়েছো।"

হারুবাবু একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "জিজ্ঞাসা করে লজ্জা

দিচ্ছো কেন, সবই তো জানো। আমার ওয়াইফ যে কোনো মোমেণ্টে চাইল্ড এক্সপেক্ট করছে। আর ভাই, তা ছাড়া যা দেনা বাঁধিয়ে রেখেছি। তার উপর ক'টা মাস এক পয়সা তহুরী মিলবে না।"

ছোকাদা এতোক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। একটু কাব্য করে বললেন, "মহাকালের মাপকাঠিতে এই আড়াই মাস তো বিন্দুমাত্র। আমি কোথাও যাবো না। কাসুন্দেতেই পড়ে থাকবো, আর পাড়ার রামকেষ্ট আশ্রমের দুর্গাপুজো দেখবো। যাক, অনেকদিন পরে আবার সব দেখা হবে। কেউ কারুর অপরাধ নিও না। সব ভুলে খোলা মনে চলে চলো।"

সায়েব যাচ্ছেন রাণীক্ষেত। প্রতিবার ছুটির সময় তিান রাণীক্ষেতে যাবেনই। হিমালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শৈলাবাসে তাঁর একটা বাংলো আছে। রাণীক্ষেতের অজস্র গল্প শুনেছি তাঁর মুখে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুইজারল্যাণ্ডকে নাকি হার মানায়।

তাই হঠাৎ যখন সায়েব বললেন, চলো রাণীক্ষেত দেখে আসবে, তখন আনন্দে কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিলো না। সায়েব বললেন, "পুরো ছুটি না থাকো, অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে আসবে। আমারও সুবিধা হবে। তুমি থাকলে কিছু কাজ করতে পারবো।"

সে-এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় আড়াইশ' মাইল দূরে কাঠগুদাম। সেখান থেকে হিমালয় শুরু। তারপর পার্বত্য পথে, দেওদার ও পাইন বনের পাশ কাটিয়ে, পাহাড়ী নদীর বুকের উপর তৈরি পোল পেরিয়ে, কখনো চড়াই, কখনো উতরাই-এর বাহান্ন মাইল পথ। আমার জীবনের সে-এক স্মরণীয় অধ্যায়।

বাড়ির নামটিও সুন্দর—ফেয়ারল্যাণ্ডস। চারিদিকে বন্য পাইন ও দেওদারের সমারোহ। বাগানে বিচিত্র বর্ণের অজস্র ফুলের মেলা বসেছে। নয়নাভিরাম পার্বত্য পথ। ভোরে গাছের ডালে এক ঝাঁক পাখীর কলতান। দূরে চিরতুষারাবৃতা নাগাধিরাণী নন্দাদেবী। চারিপাশের ধূসর পর্বতশ্রেণী যেন নন্দাদেবী অনুগত প্রজাবৃন্দ। তারাও শীঘ্র তুষারের মুকুট পরবে।

সায়েব বলেছিলেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। মিলিটারীতে থাকতেই প্রথম এখানে এসেছিলাম। এবং

প্রথম দর্শনেই প্রেম। কেমন এক নাড়ির টান অনুভব করেছিলাম। যেন কতবার এখানে এসেছি। তারপর এই দীর্ঘ ত্রিশবছরে প্রায় প্রতিবার এসেছি এখানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ একমনে দেখেছি হিমালয়কে। কখনও শিশুর মতো শূন্য মনে দেখেছি, কখনও দার্শনিকের নিবিষ্ট চিত্তে। কিন্তু তবু ভরিলো না চিত্ত। আজও আমার তৃপ্তি হয়নি।"

একমাস কাটিয়েছিলাম রাণীক্ষেতে। যা দেখেছিলাম, তার প্রকৃত বর্ণনা দিতে গেলে আর একখানা বই লিখতে হয়।

একমাস পরে যখন ফিরে এলাম তখন শুধু প্রকৃতিকেই দেখিনি, অন্ততঃ একটি মানুষকে—একটি বিচিত্র স্ত্রীলোককে দেখে এসেছি। কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। মর্তের স্বর্গে গিয়েও সায়েব আইনের কাজ করেছিলেন। সেই সুযোগে আমিও কিছু-কিছু টাইপ করেছিলাম।

মহিলাটির নাম মিস্ ট্রাইটন। যে কাহিনী বলবো তাতে আইনের স্পর্শ অতি সামান্য। তবু ট্রাইটনকে আমি যে ভাবে দেখেছি ও তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

রাণীক্ষেতে থাকবার দিন কয়েক পরেই একদিন বিকেলে দেখি বাগানে ছড়ি হাতে সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে বললেন, "আজ একটু দূরে বেড়াতে যাবো। তুমিও চলো, মিস্ ট্রাইটনকে দেখে আসবে। অন্যবার এখানে এসেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।"

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে-হাঁটতে সায়েব বললেন, "মিস্ হলেও ফ্যানি ট্রাইটনকে যুবতী ভেবো না। তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কি এখানেই সারাবছর থাকেন?"

সায়েব বললেন, "হ্যাঁ, ওঁর নিজের একটা ছোট্ট বাড়ি আছে, সেখানেই সারাবছর পড়ে থাকেন। শীতকালে যখন চারিদিকে বরফ পড়ে, এখানে প্রায় কেউ থাকে না। স্থানীয় লোকরা পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। কিন্তু মিস্ ট্রাইটন কোথাও যায় না। এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন।"

এতোক্ষণ আমরা উপরের দিকে উঠছিলাম। পাহাড়ী পথ-চলায় আমি অনভ্যস্ত, এইটুকুতেই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। সায়েবের তখনও ক্লান্তি আসেনি। আমার অবস্থা দেখে বললেন, "চলো একটু বসা যাক। রাস্তার মাঝে-মাঝে ওই জন্য বেঞ্চি বসানো আছে।"

আমি অসম্মতি জানালাম। বললাম, "আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবো।"

এবার পথটা ঢালু। গড়গড় করে রাস্তা ধরে নেমে যাচ্ছি আমরা। মিস্ ট্রাইটনের কথা উঠলো আবার। সায়েব বললেন, "সখ করে কেউ এই জনহীন দেশে শীতকালে পড়ে থাকে না। বেচারার জামাকাপড়ের দিকেই চাওয়া যায় না। শতছিন্ন অবস্থা।"

মিনিট কুড়ি হাঁটবার পর সায়েব এক জায়গায় থামতে বললেন। প্রধান রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটা সরু এবড়োখেবড়ো পথ বনের মধ্যে মিশে গিয়েছে। এই পথ ধরে যেতে হবে। আমরা প্রায় এসে গিয়েছি। কিন্তু সাবধান, পথটা পিছল হয়ে আছে।"

একটু হাঁটতেই পাইনবনের ফাঁক দিয়ে একটা বাড়ি দেখা গেল। ছোট্ট বাড়ি, সংস্কারের অভাবে জীর্ণ অবস্থা। কিন্তু বেশ পরিষ্কার। আর চারিদিকে ফুলের বাগান। সেই বাগানের মধ্যে আরাম কেদারায় এক বৃদ্ধা বসে আছেন। একমনে তাকিয়ে আছেন দূরে ত্রিশূল পর্বতের দিকে। ইঙ্গিতে সায়েব পা টিপে-টিপে চলতে বললেন। সন্তর্পণে আমরা তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালাম। তাঁর মাথায় সিল্কের রুমালের মতো কী একটা বাঁধা। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। মিস্ ট্রাইটন প্রকৃতির শোভার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পরও আমাদের উপস্থিতি তিনি টের পেলেন না।

সায়েব এবার সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "গুড্ আফটারনুন মিস্ ট্রাইটন। কেমন আছেন? অনেকদিন পরে আবার দেখা।"

মিস্ ট্রাইটন প্রথমে চমকে উঠলেন। কিন্তু সায়েবকে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে চাকরকে ডাকতে লাগলেন, "একবাল সিং, ছুটো চেয়ার নিয়ে এসো।" তারপর একগাল হেসে বললেন, "কী

সৌভাগ্য আমার কর্নেল। একবালের কাছেই শুনলাম আপনি রাণীক্ষেতে এসেছেন। খবর ভালো তো?"

সায়েব চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, "মন্দ চলছে না। তবে বয়স তো কম হলো না। সুতরাং চোখের দৃষ্টি পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। পৃথিবীটাও আমার সঙ্গে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাই সব কিছুতেই আর আনন্দ পাই না।"

"কী যে বলেন কর্নেল" যুবতী মেয়ের মতো সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে মিস্ ট্রাইটন বললেন। "এই বয়সে আপনার মতো হাসিখুশি লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" মিস্ ট্রাইটন মাথার রুমালটা ঠিক করে নিলেন।

আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিস্ ট্রাইটন। বললেন, "একটু পায়চারি করা যাক।"

এবার ভালো করে দেখতে পেলাম তাঁকে। দীর্ঘ দেহ বয়সের ভারে সামান্য বেঁকে গিয়েছে। শরীরের জলুস চলে গেলেও সহজে বোঝা যায়, বয়সকালে তিনি সুন্দরী ছিলেন। দেহের গঠন, মুখের শ্রী ও চামড়ার রঙ থেকে বিগত দিনের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মিস্ ট্রাইটনকে কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। তাঁর চোখের চাহনিতে কিন্তু আজও মাদকতা আছে।

বেড়াতে-বেড়াতে মিস্ ট্রাইটন জিজ্ঞাসা করলেন আমরা চা খাবো কি না। আমরা বললাম, এইমাত্র খেয়ে এসেছি।

তারপর উঠলো ছবির কথা। মিস্ ট্রাইটন বললেন, "কর্নেল, অনেকগুলো নতুন ছবি এঁকেছি। একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আঁকা।"

আমার দিকে ফিরে সায়েব বললেন, "তোমাকে বলা হয়নি, মিস্ ট্রাইটন একজন প্রতিভাবান শিল্পী। সুন্দর ছবি আঁকেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন মিস্ ট্রাইটন। তারপর তাঁর আঁকা ছবি দেখাতে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

একটা ঘরের মধ্যে প্রায় শ'খানেক ছবি। কিন্তু ছবি দেখে আমি একেবারে হতাশ হলাম, অতি সাধারণ, সস্তা ধরনের ছবি। প্রতিটি বিষয়বস্তু প্রায় এক। চাঁদনীরাতে নদীর বুকে পালতোলা নৌকা; কিংবা পাহাড়ের পিছনে সূর্যাস্ত। সায়েব ছবিগুলোর খুব

প্রশংসা করলেন। একটা ছবি আমাকে দেখিয়ে বললেন, "কি অদ্ভুত রঙের খেলা দেখেছো।" আমিও বললাম, "সত্যি অপূর্ব।" আর একখানা ছবির কাছে মিস্ ট্রাইটন আমাদের নিয়ে গেলেন। "এ-ছবিটা আপনার কেমন লাগছে, কর্নেল?" সায়েব বললেন, "সুন্দর ছবি হয়েছে। নেচারের এমন মাইনিউট স্টাডি অনেকদিন দেখিনি।" মিস ট্রাইটন বললেন, "গত ডিসেম্বরে একদিন ভোরে পাহাড় দেখছিলাম। হঠাৎ আঁকার অনুপ্রেরণা পেলাম। প্রকৃতিকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম সেদিন। মনের সেই ভাবটাই এই ছবিটিতে ফুটিয়েছি।"

সায়েব ছবিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন, "মিস্ ট্রাইটন, এই ছবিটা আমার চাই। কত দাম হবে বলুন।"

"কর্নেল, বাইরের লোকের কাছে আমি তো ছবি বিক্রি করতে চাই না। তবে আপনি পরিচিত বন্ধু, কুড়িটা টাকা দেবেন।"

সায়েব বললেন, "না-না আপনি দর কমিয়ে বলছেন। অন্ততঃ পঁচিশ টাকা দাম এ-ছবির।" পকেট থেকে পঁচিশটা টাকা বার করে তাঁর হাতে দিলেন সায়েব। পুরনো স্টেটসম্যান কাগজে ছবিটা মুড়ে সায়েবের হাতে দিয়ে মিস্ ট্রাইটন বললেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ কর্নেল। এই টাকা না পেলে এবারে দুধের বিল্‌টা যে কিভাবে দিতাম জানি না।"

আমরা আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তাঁর ফুলগাছগুলো আমাদের দেখালেন। বাগান দেখতে দেখতে অনেক কথা হলো দু'জনে। বেশ স্ফুর্তিতে রয়েছেন মিস্ ট্রাইটন। মাঝে-মাঝে যুবতীসুলভ লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তিনি। তারপর হাসছেন। হাসির কথা বলছেন। এদিকে সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। পাহাড়ের পিছন থেকে অস্তমিত সূর্যের বিগতপ্রায় রশ্মি সমস্ত আকাশকে রাঙিয়ে তুলেছে। কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন ট্রাইটন একটু মনমরা হয়ে পড়েছেন যেন।

সে-দিনের মতো বিদায় নিয়ে পাইনবনের মধ্যে দিয়ে আমরা আবার বড়োরাস্তায় হাজির হলাম। হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছবিটা আপনার ভালো লাগলো কেমন করে?"

সায়েব হাসলেন। বললেন, "টাকাটা কোনরকমে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বেচারার কি অবস্থা দেখলে তো। এখানে যে-সব ইংরেজ বেড়াতে আসে তাদের অনেকের কাছেই উনি ছবি বেচেন। আমিও অনেকবার কিনেছি। মিস্ ট্রাইটনের সমাজ নেই, সংসার নেই, আত্মীয়-স্বজনও আছে মনে হয় না। এখানকার ক্লাবেরও মেম্বার হতে পারেন না, অনেক চাঁদা।"

বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু একেবারে নির্জন পথ। অনেকটা হেঁটেছি। বেশ শ্রান্তি অনুভব করছিলাম। হাঁটতে হাঁটতেই সায়েব বলে যাচ্ছেন, "এই বয়েসে বুড়ী রোজ মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ায়। কোনোদিন হয়তো রাস্তাতেই মরে পরে থাকবে। বাড়িতেও কেউ দেখবার নেই। একটা বেয়ারা ও একটা খানসামা আছে। কিন্তু তাদের অবস্থাও মনিবের মতো। অতি সামান্য মাইনে। এই দুর্মূল্যের বাজারেও উনিশ শ' চোদ্দ সালের হারে মাইনে পায় তারা। কিন্তু বুড়ীর প্রতি তাদের এমন মমতা যে, চাকরি ছাড়তে পারে না। ওরা বলে, আমরা না থাকলে বুড়ীর কষ্ট হবে। কিন্তু মিস্ ট্রাইটন তাদের মোটেই বিশ্বাস করেন না। লোক পেলেই বলেন, 'আমাকে বোকা পেয়ে ওরা চারিদিক থেকে চুরি করছে।' দোকানবাজার অথচ উনি নিজেই করেন। যতোদূর জানি চাকররা শুধু সপ্তাহে একবার কেরোসিন তেল কিনে আনে।"

বেচারা মিস্ ট্রাইটনের জন্য আমারও বেশ দুঃখ হচ্ছিলো। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার জীবনের বেদনা মনে-প্রাণে অনুভব করবার চেষ্টা করেছি।

দু'-একদিন তাঁর সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে। মাথায় স্ট্র হ্যাট চাপিয়ে ও হাতে একটা লাঠি নিয়ে চলেছেন। বাজারেও তাঁকে দেখেছি। তিন মাইল পথ হেঁটে তিনি রোজ বাজারে যান। আলু থেকে ঢেঁড়স পর্যন্ত সব কিছু দরাদরি করেন। দোকানদাররা অস্থির হয়ে পড়ে। কলকাতার গঙ্গাস্নান ফেরত বুড়ীদের মতো ফাউ না পাওয়া পর্যন্ত মিস্ ট্রাইটন তাদের নিষ্কৃতি দেন না।

আমাদের বেয়ারা ত্রিলোচন সিং-এর কাছে শুনেছি মিস্ ট্রাইটনকে নিয়ে স্থানীয় লোকদের নানা গল্প হয়। কেউ বলে

বুড়ী ইংরেজ নয়, ফিরিঙ্গী। কেউ বলে, না বুড়ী আসল মেম, কিন্তু এখানে গুপ্তচরের কাজ করে। ত্রিলোচন সিং চোখ পাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, "বাবু, বুড়ী মেমসায়েব একটা ডাইনী। যে কোনো লোককে ছাগল করে দিতে পারে। বুড়ী মন্তর দিয়ে একবাল সিংকে বশ করে রেখেছে। ও মাইনে না পেলেও চাকরি ছেড়ে যেতে পারবে না।"

ত্রিলোচন আরও বলেছিল, বুড়ী ভয়ঙ্কর খিটখিটে। আর ছোটোছেলেদের মোটেই দেখতে পারে না। ছেলেরা নাকি নোংরা আর ভয়ানক গোলমাল করে।

কয়েকদিন পরে লাঞ্চে মিস্ ট্রাইটনকে সায়েবের স্ত্রী নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। একটার সময় তাঁর আসবার কথা। কিন্তু তিনি আসেননি। দেখা গেল পরিবর্তে চাকরকে পাঠিয়েছেন। লিখেছেন তাঁর শরীর খুব খারাপ, হেঁটে আসতে পারবেন না। কিন্তু ডাণ্ডীতে আসবারও উপায় নেই, ডাণ্ডীওয়ালারা ছ'টাকা চাইছে। সায়েব চিঠি লিখে দিলেন—"আমরা এখানকার একটা ডাণ্ডী পাঠাচ্ছি। আসতেই হবে।" ছ'টাকা দিয়েই ডাণ্ডী ভাড়া করে ত্রিলোচন সিং নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মিস্ ট্রাইটনকে আনতে চললো।

আধঘণ্টার মধ্যে তিনি এলেন। চকচকে ফুল-লতাপাতাওয়ালা জামা পরেছেন। খাওয়ার সময় তিনি অনেক কথা বললেন। হোমের আলোচনাই বেশি হলো। হোমে ডিমের র‍্যাশন উঠলো কিনা, অমুক পার্কে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হলো; সে নিয়ে মিস্ ট্রাইটনের চিন্তার অন্ত নেই।

লাঞ্চে সেদিন আরও একজন ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জনৈক মিশনারীর স্ত্রী, নতুন ইংলণ্ড থেকে এসেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন "যাই বলেন এদেশের কালী ঠাকুরের মূর্তি দেখলে ভয় লাগে। একটি বীভৎস সৃষ্টি।"

মিশনারীর স্ত্রীকে কালী মাহাত্ম্য বোঝানোর চেষ্টা বাতুলতা জেনেই আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম মিস্ ট্রাইটনের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। মনে হলো যেন তিনি ভয় পেয়েছেন। তাঁর হাতের কাঁটা ও ছুরি যেন কাঁপছে। কোনো রকমে বললেন, "এ সব আলোচনা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

আমি খ্রীস্টান। কিন্তু আপনি জানেন না, দীজ ইণ্ডিয়ান গডেসেস কেন বি ডেঞ্জারাস।"

মিশনারীর স্ত্রী বোধহয় অপমানিত বোধ করলেন। বললেন, "আপনার কথা তো বুঝতে পারলাম না।"

রেগে উঠলেন মিস্ ট্রাইটন। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে-মুছতে, বললেন, "আমি আর বোঝাতে পারবো না।" তাঁর মুখ তখনও বিবর্ণ হয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ তুলে সায়েব আলোচনার মোর ফিরিয়ে দিলেন। ক্লাইমেট নিয়ে কথা আরম্ভ হলো। আলোচনা কিন্তু জমলো না। মিশনারীর স্ত্রী কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলেন। মিস্ ট্রাইটনও আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারলেন না।

এরপরে মাত্র দু'দিন মিস্ ট্রাইটনকে বাজারে দেখেছিলাম। তারপর আর দেখা হচ্ছিলো না। মেমসায়েবের মুখে শুনলাম তাঁর অসুখ।

মেমসায়েব ও মিস্ ট্রাইটনের মধ্যে খুব ভাব। দু'জনের প্রকৃতিতে কিন্তু বিরাট পার্থক্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি সায়েবের স্ত্রীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ভারতের অধ্যাত্মজীবনকে তিনি শুধু শ্রদ্ধা করেন না, মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। মিস্ ট্রাইটন এসব মোটেই পছন্দ করেন না। তবু দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতি গড়ে উঠেছে। মিস্ ট্রাইটনের বাড়ি মেমসায়েবকে রোজ যেতে হয়। একটু দেরি হলে মিস্ ট্রাইটন বেয়ারা পাঠিয়ে খবর নেবেন।

ইদানীং মিস্ ট্রাইটন আর হাঁটাহাঁটি করতে পারছেন না। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকেন। শুধু বিকেলে বাগানে আরাম কেদারায় বেয়ারারা ধরে এনে বসিয়ে দেয়।

বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। শরৎকালে এই পাহাড়ে মাঝে-মাঝে একদল মেঘ যেন দল ভেঙে পথ হারিয়ে এসে পড়ে। তারপর শুরু হয় বারিবর্ষণ। সে-দিনও তেমনি আচমকা বৃষ্টি নেমেছে। ড্রইংরুমে আমরা দু'জনে চুপচাপ বসে আছি। ঝড়বাদল মাথায় করেই মেমসায়েব মিস্ ট্রাইটনকে দেখতে গিয়েছেন। কাঁচের

শার্সি বন্ধ করে আমরা চুপচাপ বসে আছি। একঘেয়ে বৃষ্টিপড়ার টিপ-টিপ শব্দ কানে আসছে। কেরোসিনের আলোটা টেবিলে জ্বলছে। সায়েব মাঝে-মাঝে কথা বলছিলেন। কিন্তু নীরবতার অংশই বেশি। একবার বিদ্যুৎ চমকালো, ঘরের ভিতরটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠলো, একটু শীত-শীত লাগছে।

এমন সময় মনে হলো বাইরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। চাকরবাকর কেউ ছিল না। নিজেই দরজা খুলে দিলাম। ছাতা হাতে মিস্ ট্রাইটনের চাকর একবাল সিং দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির ছাঁটে জামা-কাপড় ভিজে গিয়েছে। হাতে একটা টর্চ। ভিজে জামার পকেট থেকে একবাল সিং একটা চিঠি বার করে সায়েবের হাতে দিলে। সায়েব পড়লেন। মেমসায়েব লিখেছেন, মিস্ ট্রাইটনের অসুখ বেড়েছে। একলা থাকতে ভয় পাচ্ছেন, মাঝে মাঝে ভুল বকছেন। সুতরাং মেমসায়েব আজ ওইখানেই থেকে যাবেন, রাত্রে বাড়ি ফিরবেন না। আরও লিখেছেন, বুড়ী উইল করবার জন্য জ্বরের মধ্যে ছটফট করছে। কাল ব্রেকফাস্টের পরই টাইপরাইটার ও কিছু ভালো কাগজ নিয়ে আমরা যেন এখানে আসি। অবশ্য যা অবস্থা বুড়ী ততোক্ষণ নাও টিকতে পারে। শেষে মেমসায়েব লিখেছেন, "একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। মনে হয় পৃথিবীতে সবই সম্ভব। কাল সকালে শুনে তুমিও আশ্চর্য হবে।"

সায়েব লিখে দিলেন, কাল সকালেই আমরা যাচ্ছি। একবাল সিং বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল।

আরও জোরে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে হাওয়া বইছে প্রবল বেগে সায়েব বললেন, "মেমসায়েব নতুন খবর কী পেলেন আন্দাজ করতে পারছি না।"

বললাম, "আমিও কিছু বুঝতে পারছি না।"

সায়েব বললেন, "বিচিত্র জীবন এই মিস্ ট্রাইটনের। সেদিন যা শুনলাম তাতেই অবাক হয়েছি। আরও কি রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে।"

"কেন উনি এখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকেন, সেইটাই এক রহস্য," আমি বললাম।

কেরোসিনের আলোটা তিনি একটু জোর করে দিলেন। তারপর বললেন, "রহস্যই বলতে পারো। তবে যারা কারণ জানে, তাদের কাছে এ-এক বেদনার কাহিনী।"

আমি চুপ করে রইলাম। কৌতূহল বাড়ছে।

"সেদিন লাঞ্চের সময় কালী ঠাকুরের প্রসঙ্গে মিস্ ট্রাইটন কী রকম হয়ে পড়েছিলেন লক্ষ্য করেছিলে?"

"নিশ্চয় করেছিলাম। কালীর প্রতি ওঁর কেমন যেন দুর্বলতা আছে মনে হলো।"

"সে-কাহিনী তোমায় বলবো। এখানে কেউ জানে না। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আমার স্ত্রীকে মিস্ ট্রাইটন তাঁর জীবন-কাহিনী বলেছিলেন। আমি তাঁর কাছে শুনেছি।"

বাইরে আবার বিদ্যুৎ চমকালো। সোফাতে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। শীত আরও বেড়েছে। "বলুন গল্পটা।"

"দাঁড়াও তার আগে দু'কাপ কফির ব্যবস্থা করা যাক। যেরকম ঠাণ্ডা পড়েছে।" ত্রিলোচন সিংকে ডাক দিয়ে সায়েব কফি আনতে বললেন।

কফি এল। দুধ চিনি মিশিয়ে একচুমুক খেতেই তৃপ্তি পাওয়া গেল। শীতের সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়াই করা যাবে। গল্প আরম্ভ হলো!

"ট্রাইটনরা তিন পুরুষ ধরে ভারতবর্ষকে জানেন। মিস্ ট্রাইটনের পিতামহ সিপাহী বিদ্রোহে যুদ্ধ করেছিলেন। মিস্ ট্রাইটনের বাবা ছিলেন বেঙ্গল পুলিশের বড়ো কর্মচারী।

একমাত্র মেয়েকে মিস্টার ট্রাইটন ভয়ঙ্কর ভালোবাসতেন। বাইরে তিনি ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার, যেমন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি রাগী। কিন্তু মেয়ের কাছে তিনি একেবারে ছোটোছেলেটির মতো।

মিস্টার ট্রাইটনের ছিল শিকারের নেশা। শিকারের নামে তিনি পাগল। তাই সময় পেলেই চলে যেতেন কাঠুরিকোটে। কাঠুরিকোট কুমায়ুন রেঞ্জের ছোট্ট শহর। তার খুব কাছেই ওক ও পাইনের ঘন বন। সেই বনে থাকে কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ। গ্রীষ্মের সময় দলে-দলে ইংরেজ পরিবার এখানে এসে শহরটা ভরিয়ে দেয়।"

সায়েব বলে যাচ্ছিলেন। "মেয়েকে সঙ্গে করে মিস্টার ট্রাইটন সেবারে কাঠুরিকোট এলেন। সেদিনের মিস্ ট্রাইটনকে কল্পনা করো। উদ্ভিন্নযৌবনা রূপবতী ইংরেজ-ললনা। চোখে-মুখে রূপলাবণ্য ও প্রাণচাঞ্চল্য ঝরে পড়ছে। কাঠুরিকোটে এমন সুন্দরী মেয়ে আর তুটি নেই। ফলে, মনে-মনে অনেকেই তাকে ঈর্ষা করে।

সবাই জানে ফ্যানি ট্রাইটনের খুব ভালো বর মিলবে। গভর্নরের এ. ডি. সি. ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ পাত্র হিসাবে মন্দ নয়। এখন প্রায় রোজই সে ট্রাইটনদের বাড়িতে আসে এবং কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে যায়। তাদের অনুরাগ যে জমে উঠেছিল সে খবর সবাই জানে। ফ্যানি ট্রাইটন বিকেলের দিকে ওয়েণ্টওয়ার্থের জন্য অপেক্ষা করে। দেরি হলে ওয়েণ্টওয়ার্থ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে, বলে তুঃখিত, বড্ডো দেরি হয়ে গেল।

ফ্যানি কপট রাগ দেখায়। বলে, "আপনার কত কাজ। এখানে যে এসেছেন সেই আমাদের সৌভাগ্য।"

"ও রাগ করা হচ্ছে। দাঁড়াও বাবাকে বলছি, আপনার মেয়ে সুযোগ পেলেই আমাকে কড়া-কড়া কথা শোনায়।" ওরেণ্টওয়ার্থ সত্যিই বাবাকে বলে দেবে এমন একটা ভাব দেখায়। হাতটা টেনে ধরে ফ্যানি বলে, "খুব অভিমান হয়েছে। সব কিছু বাবাকে লাগানো চাই। চা খাবে?"

চা আসে। মিস্টার ট্রাইটনও ওদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে চা খান। তারপর ওদের তু'জনকে একলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে যান।

মাঝে মাছে অভিমানের পালা চলে। তু'জনে খুব ঝগড়া করে। ওয়েণ্টওয়ার্থ তু'-একদিন চা খেতে আসে না। আবার মিটমাট হয়ে যায়। ফ্যানি চিঠি পাঠায়, আসছো না কেন? ওয়েণ্টওয়ার্থ তখন আসে, চা খায়, গল্প করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মিস্ ট্রাইটন একলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মনটা খারাপ। পরশু থেকে ওয়েণ্টওয়ার্থের সঙ্গে অভিমানের পালা চলেছ। এবার কিছুতেই সে চিঠি লিখবে না। দেখা যাক কতদিন পরে সে আসে। সব সময় ছেলেমানুষি ভালো লাগে না। ওয়েন্টি সেদিন ওকে খুকুমনি বলে ডেকেছিল বলেই তো ঝগড়া হলো।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজে ফ্যানি মুখ তুলে তাকালো। আবছা অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। মাথার টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামানো। কে ওয়েন্টি? না, সে তো অতো লম্বা নয়। আগন্তুকের পরিধানে শিকারীর পোশাক। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে আগন্তুক নেমে পড়লো। চেহারা বটে! একেবারে সোজা। ভারি-ভারি পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন।

বাবাকে ডেকে দিয়ে ফ্যানি সোফায় গিয়ে বসলো। দরজার কাছে গিয়ে মিস্টার ট্রাইটন বলে উঠলেন, "আরে যুবরাজ যে।" যুবরাজ! ফ্যানি ট্রাইটন চমকে উঠলো। দূর থেকে মনে হয়েছিল কোনো ইংরেজ।

টুপি হাতে করে যুবরাজ ভিতরে ঢুকলেন। "আগামীকাল শিকারে ক'জন বাজনাদার নেওয়া হবে ঠিক করলেন না। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই ভাবলাম নিজেই কথা বলে আসি।"

মিস্টার ট্রাইটন পরিচয় করিয়ে দিলেন। "আমার মেয়ে। আর ইনি ঝোলপুরের যুবরাজ, আমার শিকারীবন্ধু। এঁর কথা তোমাকে অনেক বলেছি। দুঃসাহসিক শিকারী।"

মিস্ ট্রাইটন ও আগন্তুকের দৃষ্টি-বিনিময় হলো। অপূর্ব সৌন্দর্যবান পুরুষ। চোখের তারা দুটি কুচকুচে কালো। মাথার চুলও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু সামনের কিছু চুল পাতলা হয়ে এসেছে, যেন টাকের পূর্বলক্ষণ। টুপি মাথায় থাকলে মনে হয় ওয়েন্টওয়ার্থের বয়সী। যুবরাজের ব্যক্তিত্বে এমন এক আকর্ষণ আছে যা মিস্ ট্রাইটনকে চঞ্চল করে তুললো।

এমন সময় বাইরে একজোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল। এ শব্দ ফ্যানির পরিচিত। "ফ্যানি, ফ্যানি" বলে ডাকতে-ডাকতে ওয়েন্টওয়ার্থ ভিতরে ঢুকছিল। হঠাৎ যুবরাজকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো সে, তারপর গম্ভীরভাবে বললে, "আরে যুবরাজ যে। অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।"

মিস ট্রাইটনের পাশে গিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থ বসলো। চায়ের আসর বেশ জমে উঠেছে। আড়ালে একসময় সে ফ্যানির হাতটা একটু টিপে দিলো। মিস ট্রাইটনের শরীরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিহরন জেগে উঠলো। একসঙ্গে দুটি পুরুষ যেন তাকে আকর্ষণ করছে।

চায়ের শেষে যুবরাজ বিদায় নিলেন। মিস্টার ট্রাইটনও নিজের কাজে ভিতরে চলে গেলেন। অতিক্রান্ত যুবরাজের দিকে বাঁকাচোখে ওয়েন্টওয়ার্থ তাকিয়ে রইলো। একটা সিগারেট ধরালো সে। তারপর বেশ কড়াভাবেই বললে, "ডার্টি নিগারগুলো আমাদের বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গেও ভাব জমাতে শুরু করেছে দেখছি!"

রাগের কারণ আন্দাজ করতে ফ্যানির সময় লাগলো না। ওয়েন্টিকে তার আরও রাগাতে ইচ্ছা করছে। তাই দুষ্টুমি করে সে বললে, "ওমন সুন্দর যার গায়ের রঙ, তাকেও তুমি কালা নিগার বলো।"

ওয়েন্টওয়ার্থ অবাক। বলে কি মিস্ ট্রাইটন!

মিস্ ট্রাইটন ওয়েন্টওয়ার্থের আরও কাছে সরে এসে বললো, "তোমাকে মানতেই হবে, যুবরাজকে হঠাৎ দেখলে ইংরেজ বলে মনে হয়।"

রাগে ওয়েন্টওয়ার্থের মুখ লাল হয়ে উঠলো। "তাই বটে। মুসলমান হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু এই হিন্দুগুলো…"

মিস্ ট্রাইটনের ওখানেই থামা উচিত ছিল। কিন্তু তার আরও দুষ্টুমি করতে ইচ্ছা হলো। তাই বললে, "ঘোড়ায় চড়লে যুবরাজকে যে কি সুন্দর দেখায়।"

"ঘোড়ায় চড়লে কি হবে, হতভাগাটা সুদখোরেরও অধম", ওয়েন্টওয়ার্থ উত্তর দিলে।

মিস্ ট্রাইটনের মাথায় সেদিন বোধহয় ভূত চেপেছিল। না হলে কি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "বিল, যুবরাজকে তুমি দেখতে পারো না কেন?"

"যুবরাজকে দেখতে পারি না বললে ভুল হবে। তবে ইংরেজ মেয়েদের—বিশেষ করে সমর্থা মেয়েদের এদেশে আসতে দেওয়া উচিত নয়।" সিগারেটটা শেষ না করেই এ্যাস্‌ট্রেতে ফেলে দিয়ে ওয়েন্টওয়ার্থ বললে, "যতোরাজ্যের অনাসৃষ্টি হয় তার থেকে। আর এই লোকগুলো ভারি চালাক। তাদের বাড়ির মেয়েদের মুখ পর্যন্ত আমাদের দেখায় না। অথচ আমাদের মেয়েদের সঙ্গে মেশার জন্য কী আগ্রহ!"

মিস্ ট্রাইটন বললে, "বিল, এদেশের মেয়েদের দেখলে তোমার খুব লাভ হবে না। তারা অসম্ভব লাজুক।"

"হতে পারে। কিন্তু শাড়ি-পরা মেয়েদের যা সুন্দর দেখায়, আমাদের অনেক বিউটি কুইন তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না।"

ফ্যানি বেশ আঘাত পেলো। বিলের মুখে ভারতীয় মেয়েদের সৌন্দর্য-স্তুতি তার মোটেই ভালো লাগলো না। ভারতীয় মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে তার এতো আগ্রহ কেন ?

রাগ বেশ চড়ে উঠেছিল। তাই বিলকে আঘাত করেই ফ্যানি বললে, "আসলে যুবরাজকে তুমি হিংসা করো।"

আশ্চর্য, ওয়েন্টওয়ার্থ তবুও রাগ করলো না। শুধু গম্ভীরভাবে বললে, "যাহোক, যুবরাজ যদি তোমার উপর বেশি আগ্রহ দেখায় আমাকে বলতে ভুলো না ডার্লিং। ও-রোগের ওষুধ আমার জানা আছে।"

"আগ্রহ দেখানো কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না", সোফায় হেলান দিয়ে অভিমানের সুরে মিস্ ট্রাইটন বললে।

ওয়েন্টওয়ার্থ চেয়ে দেখলো ফ্যানির চোখে জল। কষ্ট হলো তার। এইটুকু মেয়েকে এতোখানি আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। লণ্ঠনের স্তিমিত-আলোতে ফ্যানিকে সে আবার দেখলো। সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। ওয়েন্টওয়ার্থ তার সোনালী চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। যার চুল সেও প্রতিবাদ করলো না। তাকে সে আরও কাছে টেনে এনে আদর করতে লাগলো। তারপর অজস্র চুমায় ভরিয়ে দিলে তার মুখ। আর বললে, "ফ্যানি বড়ো দুষ্টু তুমি। দুষ্টুমি করলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখায়।"

যুবরাজের কথা মিস্ ট্রাইটন হয়তো ভুলে যেতো। কিন্তু সেদিনের ঘটনা আর ওয়েন্টওয়ার্থের ব্যবহার, যুবরাজকে তার মনের গভীরে বসিয়ে দিলো। কেমন এক আকর্ষণ আছে যুবরাজের মধ্যে। সেদিন নিশ্চয় যুবরাজকে দেখে ওয়েন্টওয়ার্থের হিংসে হয়েছিল। যুবরাজের কথা সে প্রায়ই ভাবে। কি সুন্দর সুগঠিত দেহ, কি গৌর কান্তি, কি সুন্দর চোখ।

যুবরাজের চিন্তা তার মাথায় প্রায়ই ঘোরে। ওয়েন্টওয়ার্থ

আসে। দু'জনে বেড়াতে যায়। কিন্তু তবুও মন পরিষ্কার হয় না। তারপর সেদিন ক্লাবের সেই ঘটনা। স্ফিয়ার ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছিলো মিস্ 'ট্রাইটন। হঠাৎ একটা ছবিতে চোখ পড়লো। আরে, এ-যে যুবরাজের ছবি। একটা নিহত বাঘের উপর পা দিয়ে যুবরাজ দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিখানা নেবার অদম্য ইচ্ছে তার বুকের মধ্যে চেপে বসলো। ক্লাবঘরে তখন কেউ নেই। সবাই বাইরে লন্ টেনিসে ব্যস্ত। ছবিটা সে আবার দেখলো। শিকারী যুবরাজ ছবিতে হাসছেন। চারিদিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে নিয়ে, মাথার কাঁটা দিয়ে ছবিটা সে দ্রুত কেটে নিলো। তারপর আরও দ্রুতবেগে সেটা ব্যাগের মধ্যে পুরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মিস্ ট্রাইটন।

বাড়ি ফিরে কিন্তু অনুশোচনা হলো। ছবি কাটা জঘন্য নোংরা স্বভাব। লজ্জাও লাগলো। এ-ছবি রাখবেই বা কোথায়। চাকর বাকরদের যা স্বভাব, ওরা সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখে। অন্য কেউ জানতে পারলে! জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মিস্ ট্রাইটন আবার ছবিটা দেখতে লাগলো। যুবরাজ হাসছেন। কি সুন্দর পেশীবহুল দেহ। প্রকৃত বীরের চেহারা। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছবিটা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

সবার আশা ওয়েন্টওয়ার্থ বিয়ের কথা তুলবে। বিয়ের বাজারে তার দাম আছে সত্য। কিন্তু মিস্ ট্রাইটনের মতো পাত্রীও সহজে মেলে না। হেমন্তের পাকা ফসলের মতো সোনালী চুল, টানা-টানা চোখ, নরম গড়ন, ওয়েন্টওয়ার্থকে মুগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ওয়েন্টওয়ার্থ আজকাল প্রায়ই আসে। দু'জনে গল্প করে। হাতে হাত রেখে ওয়েস্টভিউ পাহাড় থেকে সূর্যাস্ত দেখতে যায়। যুবরাজের কথা একবারও ওঠে না।

বাবা ও মেয়ে বিকেলে ড্রইংরুমে একদিন বসেছিলেন। ওয়েন্টওয়ার্থ এখনই আসবে। তারপর চা-পান। একটু পরেই সে এল। চা-পর্ব শেষ করে ওয়েন্টওয়ার্থ মিস্টার ট্রাইটনকে জিজ্ঞাসা করলে, "স্যার এণ্টনি ব্রেকনের জন্মোৎসবে যে চড়ুইভাতির আয়োজন হচ্ছে তাতে ফ্যানি যাচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন যাবে না। স্যার এণ্টনি নিজে বারবার বলে গিয়েছেন।" মিস্টার ট্রাইটন উত্তর দিলেন।

ওয়েণ্টওয়ার্থ একটু অভিভাবকী সুরে বললে, "না, স্যার এণ্টনির পার্টিতে ওকে যেতে দেবেন না। হতভাগা যুবরাজটাও ওখানে থাকবে।"

মিঃ ট্রাইটন নির্বিবাদী মানুষ। ভিতরের খবর কিছুই জানতেন না। তাই হেসে বললেন, "যুবরাজ তো খুবই ভদ্রলোক। শিকারীরা কখনও খারাপ হয় না। আর ফ্যানিকে দেখবার জন্য তুমি তো রয়েছো।"

ওয়েণ্টওয়ার্থ রাগতস্বরে বললে, "স্যার এণ্টনি যে কেন ইণ্ডিয়ানদের পার্টিতে ইনভাইট করেন বুঝি না।"

মিঃ ট্রাইটন বললেন, "যুবরাজ যে স্যার এণ্টনির কলেজ-জীবনের বন্ধু। দু'জনে একই সময়ে কেমব্রিজে পড়তেন।

চড়ুইভাতিতে সারাদিন খুব হৈ-চৈ হলো। স্যার এণ্টনি লোককে আপ্যায়িত করতে জানেন। অজস্র খাবারের ব্যবস্থা। স্যার এণ্টনি নিজে অত্যন্ত রসিক। সমস্ত দলটিকে সারাদিন হাসালেন। ম্যাজিক দেখালেন। উপস্থিত মেয়েদের হাতে একটা করে তাস দিলেন। হঠাৎ দেখা গেল সেগুলো ফুল হয়ে গিয়েছে। মোটা মিস্টার ওয়াকারকে নাচতে বললেন। তাজ্জব ব্যাপার। নাচার সঙ্গে সঙ্গে ডিম পড়ছে মাটিতে।

নানা রঙের বেলুন আকাশে ভাসছে। রামধনু রঙের পিকনিকের ছাতাগুলো দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন মেলা বসেছে।

ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসে। সারাদিনের আনন্দ শেষ হবার সময় এগিয়ে আসছে। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে এবার সবাই বেড়াতে শুরু করলো। কেউ চললো দূরে একটা পাহাড়ী ঝরনার দিকে। কেউ-বা স্থির হয়ে দিগন্তে সূর্যাস্তের সমারোহ দেখতে লাগলো।

মিস্ ট্রাইটন ও যুবরাজ দলছাড়া হয়ে পড়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এক কালীমন্দিরের সামনে হাজির হলেন।

মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কথায় কথায় মিস্ ট্রাইটন যুবরাজকে বললেন, "আপনাদের এই দেবীটিকে আমার মোটেই ভালো লাগে না।"

প্রথমে যুবরাজ কিছু বললে না। শুধু একটু বিষণ্ণভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, "চলুন না দেবীকে দেখেই আসি।"

"বেশ তো", বলে মিস্ ট্রাইটন যুবরাজের সঙ্গে মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়লো। ভিতরে কেমন থমথমে ভাব। লোকজন কেউ নেই। অথচ মেঝে তকতকে পরিষ্কার। গা ছমছম করে ওঠে। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাঙা আভায় লোলজিহ্বা দেবীকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। চারিদিকে যেন শ্মশানের অখণ্ড নীরবতা।

মিস্ ট্রাইটন বললে, "মাগো, এমন ভয়ঙ্কর দেবীকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না।"

যুবরাজ যেন শুনতে পেলেন না। তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি দেবীর দিকে নিবদ্ধ।

মিস্ ট্রাইটনের মনে হলো যুবরাজ যেন তাঁর কথায় কোনো গুরুত্ব আরোপ করছেন না। ভদ্রতার খাতিরেও যুবরাজের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল।

বেশ কয়েক মিনিট গিয়েছে। যুবরাজ তখনও চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছেন। মোটেই ভালো লাগছিল না মিস্ ট্রাইটনের। যুবরাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জোর গলায় সে বললে, "মাটি বা পাথরের মূর্তিতে আমি একটুও ভয় পাই না।" কিন্তু যতো জোরে কথাটা উচ্চারিত হলো মনে তার অর্ধেক জোরও ছিল না। ভারতবর্ষেই তার জন্ম। দূর থেকে অনেক কালীমন্দির সে দেখেছে। কিন্তু কখনও মন্দিরের ভিতরে ঢোকবার সুযোগ হয়নি।

মিস্ ট্রাইটন এবার ভালোভাবেই দেবীমূর্তির দিকে তাকালো। নানা অলঙ্কারভূষিতা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক নারীমূর্তি সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী বেশে এক পুরুষের উন্মুক্ত বক্ষের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা। কটিদেশে বিচ্ছিন্ন নর-হস্তের সারি। বাম হাতে উন্মুক্ত তরবারি, অপর হাতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড। সব থেকে বীভৎস নারীমূর্তির লোলজিহ্বা। অজানা ভয়ে মিস্ ট্রাইটনের বুক শিউরে ওঠে। এখানে না এলেই ভালো হতো। মনে হলো ওই বীভৎস নারীমূর্তি যেন তাকে গ্রাস করতে আসছে।

যুবরাজের উপর তার রাগ হচ্ছিলো। লোকটা তাকে ভিতরে এনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা পর্যন্ত বলছে না।

যুবরাজের নিস্পন্দ দেহ এবার নড়ে উঠলো। দেবীকে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর মিস্ ট্রাইটনকে বললেন, "দেবী হলেন জগৎশক্তি। জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি, ধ্বংস, সকল কিছুর প্রতিভূ তিনি। এক হাতে ধ্বংস করেন, অপর হাতে বর দেন।"

দেবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে যুবরাজ আবার চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। কেমন যেন ভয় লাগছে মিস্ ট্রাইটনের। রাগও হচ্ছে। সে বলে উঠলো, "সব মিথ্যে। এই কুৎসিত বিবসনা দেবীকে আপনি জীবনের প্রতিমূর্তি বলেন? মানসিক অসুস্থতা না থাকলে জীবনকে কেউ এমন ভাবতে পারে না।"

চোখ বন্ধ করা হলো না যুবরাজের। কথাটা শুনেই ফিরে তাকালেন তিনি। তিনি যেন বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মিস্ ট্রাইটনের আহ্বানে আস্তে-আস্তে যেন ফিয়ে আসছেন। একদৃষ্টিতে মিস্ ট্রাইটনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কিছু ভাবছেন। হয়তো উত্তরটাই ভাবছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, "আপনার বয়স সামান্য, আরও বয়স হোক। তাছাড়া, জীবনে আঘাত না পেলে জগৎশক্তিকে বোঝা যায় না, মিস্ ট্রাইটন।"

"জীবনে কেউ আঘাত পেয়েছে কি না পেয়েছে, সেটা অতো সহজে বলা যায় না যুবরাজ।"

চমকে উঠলেন যুবরাজ। আবার যেন দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি। "তা সত্যি, আমি দুঃখিত," যুবরাজ ধীরে-ধীরে উত্তর দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন রহস্যময় মনে হলো। তিনি যেন কাছে নেই। লক্ষযোজন দূর হতে যেন তার বাণী ভেসে আসছে।

মিস্ ট্রাইটন যুবরাজের মুখের দিকে তাকালো। বাইরের প্রকৃতির মতো যুবরাজের মুখমণ্ডলে দুঃখের নিবিড় অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘোড়ার পিঠে শিকারীর বেশে যে যুবরাজকে সে দেখেছিল এ যেন সে-লোক নয়। অন্য কেউ। একটা অসহায় অথচ রহস্যময় মানুষ। হয়তো সে একটা শিশু কিংবা যুবক, কিংবা পঙ্গু বৃদ্ধ।

মিস্ ট্রাইটন বুঝতে পারছে তার মনের মধ্যে বেশ পরিবর্তন আসছে। সমস্ত দেহ শিরশির করে উঠছে। এক বিচিত্র অনুভূতির জোয়ারে হৃদয়ের আধার কানায়-কানায় বোঝাই হয়ে আসছে।

একটি শ্রান্ত, অবসন্ন পুরুষের উষ্ণ মাথা নিজের বুকে চেপে ধরার এমন অদম্য কামনা তার কোনোদিন হয়নি। অশান্ত শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুম পাড়াতে মায়ের যেমন ইচ্ছা হয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এক অব্যক্ত বেদনায় মিস্ ট্রাইটনের মন ভরে ওঠে।

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়লো। "তোমরা দুটি মানিকজোড় এখানে।" ঝড়ের মতো ওয়েণ্টওয়ার্থ ভিতরে ঢুকে এসেছে। পিছনে চড়ুইভাতির অভ্যাগতরা পিল-পিল করে ঢুকছে।

মিস্ ট্রাইটন শিউরে ওঠে। যুবরাজ নির্বাক নিশ্চল।

"—বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।" মত্ত হাতীর মতো ওয়েণ্টওয়ার্থ টলছে।

ধীরে পদক্ষেপে যুবরাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন।

"কালা কুত্তা, নোংরা শুয়ার," ওয়েণ্টওয়ার্থ চিৎকার করতে থাকে।

যুবরাজ স্থিরভাবে বললেন, "কোনো অশোভন উদ্দেশ্য থাকলে এমন প্রকাশ্য স্থানে আমি আসতাম না, ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ।"

"চোপরাও কুত্তা।" ওয়েণ্টওয়ার্থ যুবরাজের গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "মিস্ ট্রাইটন, হতভাগা আপনার কোনো—মানে, কোনো কিছু ইয়ে করবার চেষ্টা করেনি তো?"

যুবরাজের বিশাল দেহটা কেঁপে উঠলো। লাল হয়ে উঠলো তাঁর সারা মুখটা। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন! দেহে তাঁর অসুরের শক্তি, সকলে জানে। এবার হয়তো ওয়েণ্টওয়ার্থকে একহাতে তুলে ছুড়ে ফেলে দেবেন। কিন্তু সে চিন্তা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য। কাঁপুনি থেমে গেল। হাতের মুঠো অবশ্য তখনও খোলেনি।

ইতিমধ্যে স্যার এণ্টনি এগিয়ে এসে দু'জনের মধ্যে দাড়ালেন। "ওয়েন্টি, ওয়েন্টি কী করছো তুমি? যুবরাজকে আমি জানি, তিনি সে-রকম মানুষ নন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জানা আছে। বেটাদের হারেমে ডজন-ডজন মেয়ে, তবু আশা মেটে না। ওদের স্ত্রীদের জন্য আমার দুঃখ হয়।" ওয়েণ্টওয়ার্থ তখনও ফুঁসছে।

যুবরাজ এক পা সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন,

"আমার স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু না বললে অনুগৃহীত হবো। তিনি মৃতা।" সবাই চমকে উঠলো। যুবরাজ মৃতদার, কেউ জানে না।

আমরাও হঠাৎ ত্রিলোচন সিং-এর ডাকে চমকে উঠলাম। ত্রিলোচন বলছে, আমাদের ডিনার প্রস্তুত। বর্তমানে ছিলাম না আমরা। সায়েবের কাহিনী অবলম্বন করে ফিরে গিয়েছিলাম অর্ধশতাব্দী আগের কাঠুরিকোটে।

গল্প থামিয়ে সায়েব বললেন, "বাইরে এখনও বেশ বৃষ্টি পড়ছে, কমবার বিশেষ লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। আকাশ মেঘে ছেয়ে রয়েছে।"

কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

সায়েব বললেন, "তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। মিস্ ট্রাইটনের নামে কুৎসা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। যে-মেয়ে নেটিভদের সঙ্গে কেলেঙ্কারি করতে পারে, ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ তাকে বিয়ে করতে পারে না।

একেবারে অন্যরকম হয়ে গেলেন মিস্ ট্রাইটন। কোথায় গেল সেই যুবতীসুলভ ব্রীড়া, বনহরিণীর চঞ্চলতা। দিনরাত মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। মাঝে-মাঝে ভয়ে চমকে ওঠেন। কাঠুরিকোটের সেই কালীমূর্তি মাঝে-মাঝে চোখের সামনে জেগে ওঠে। মনে যেটুকু শক্তি ছিল তাও নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

মনের মানুষ কেউ যদি এগিয়ে আসে সেই আশায় রূপ, যৌবন ও কামনার ডালি নিয়ে মিস্ ট্রাইটন বছরের পর বছর প্রতীক্ষায় কাটালেন। কিন্তু আশা সার্থক হলো না। যারা এসেছে পছন্দ হয়নি তাদের। আর গোপনে-গোপনে ভয়ে শিউরে উঠেছেন তিনি। কাঠুরিকোটে কালীমন্দিরের লোলজিহ্বা দেবী যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, দুঃখের আগুনে যেন তিনি এই যুবতীকে দগ্ধ করবেন।"

বিশ্বাস হচ্ছিলো না আমার। তাই সায়েবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একজন শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলার মনে এমন ভয় জাগলো কেন?"

সায়েব বললেন, "মনের প্রকৃতি কেউ জানে না। সেদিনের ঘটনা মিস্ ট্রাইটনের অবচেতন মনের কোথাও আঘাত দিয়েছিল নিশ্চয়।"

"যা হোক, তারপর?"

"আরও অনেকদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন তিনি। দিগন্তের অস্তমিত সূর্য যখন চারিদিকে আবীর ছড়িয়ে দেয়, যখন ঘরমুখো পাখীর কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রকৃতি তখন তিনি কেমন হয়ে পড়েন। ওই বুঝি সেই নরকঙ্কালভূষিতা দেবী তাঁকে গ্রাস করতে আসছেন।

বহু বৎসর অতিক্রান্ত হলো। যুবতী মিস্ ট্রাইটন প্রৌঢ়া মিস্ ট্রাইটনে পরিণত হলেন। মিঃ ট্রাইটন ইতিমধ্যে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছেন। তারপর এই রাণীক্ষেতে একটা বাড়ি কিনলেন তিনি। কিন্তু কালীর প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি। তাঁর সমস্ত জীবনের উপর কালী যেন আজও এক দীর্ঘ অশুভ ছায়াপাত করে আছে।"

—সায়েব তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে।

পরের দিন ভোরে টাইপরাইটার হাতে করে মিস্ ট্রাইটনের বাড়ি গিয়েছিলাম। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। দেখলাম মিস্ ট্রাইটনের বাগানের মধ্যে মেমসায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কালকের ঝড়ে ফুলগাছগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেখে মেমসায়েব এগিয়ে এলেন। সায়েব চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছে?" মেমসায়েব বললেন, "ডাক্তার এসেছিল। এ যাত্রা রক্ষে হবে বলে মনে হয় না। বুড়ী উইল করবার জন্য ছটফট করছে। দূরসম্পর্কের এক বোনপো'কে সব দিয়ে যেতে চায়। কিন্তু একটু বসতে হবে, বুড়ী এইমাত্র ঘুমিয়েছে।"

সায়েব বললেন, "বোনপো'র পাবার মধ্যে তো এই ভাঙা বাড়ি, কতকগুলো ছেঁড়া কাপড়, আর গোটাকয়েক ছবি।"

মেমসায়েব বললেন, "না-না। এতোদিন আমরা কেউ জানতে পারিনি। কলকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে বুড়ীর পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। আর বিভিন্ন কোম্পানীর কাগজে আরোও সাড়ে তিনলাখ টাকা। এ-কথা কাউকে কখনও বুড়ী বলেননি। শুধু কাল সন্ধ্যায় তিনবার বমি করবার পর যখন নাড়ি প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল তখন আমাকে সব বললে।"

মেমসাহেব আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি ভাবছিলাম ব্যাঙ্কে যার এতো টাকা তিনি ছবি বিক্রি করে খান! প্রাতঃসূর্যের কিরণে নন্দাদেবী ঝলমল করছে। সেই দিকে তাকিয়ে আমার হাত ধরে সায়েব বললেন, "এ-ও জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।"

রাণীক্ষেতে এক মাস সায়েবকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, কলকাতায় তাঁকে কাছে পাইনি। কিন্তু সাধারণতঃ কলকাতায় কাজের চাপে তাঁর ব্যারিস্টার সত্তাই প্রাধান্য পেতো। রাণীক্ষেতে সে বালাই নেই। এখানে প্রকৃতি মানুষের উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, তার বহির্মুখী চিন্তা অন্তর্মুখী হয়। বহুদিনের প্রবাসী মন হঠাৎ যেন ঘরে ফিরে আসে। স্বভাবতঃই সে তখন দেখে অনেক কিছু অবিন্যস্ত হয়ে জমে আছে। মাঝে-মাঝে তাই কর্মস্থল থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে মনের ঘরটি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। একথাও কিছু আমার নিজেব নয়। পাহাড়ী পথে বেড়াতে-বেড়াতে সায়েবই একদিন বলেছিলেন।

যা হোক, ঠিক একমাস পরে একদিন বাসে চড়ে আবার সমতলভুমির উদ্দেশে আমার অধোযাত্রা শুরু হলো। সমস্ত রাস্তায়—বাস এবং ট্রেনে—ভেবেছি আমি কত ভাগ্যবান। সায়েবের মতো মানুষের সংস্পর্শে আসা সত্যই ভাগ্য। বিদেশী তিনি। তার উপর জাতে ইংরেজ। আমরা সবাই যা জানি এবং আমাদের দেশের ইতিহাস যা সাক্ষ্য দেয় তা থেকে ইংরেজদের সম্বন্ধে ধারণাটা বিশেষ উচ্চ হয় না। কিন্তু জাত হিসেবে ভালোমন্দ বিচার করা যায় না। তা যদি যেতো সায়েব এমন হতে পারতেন না। নিজের হৃদয়কেও এমনভাবে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে পারতেন না।

মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার অসংখ্য নিদর্শন আমি

পেয়েছি। এ-ভালোবাসা কোনো জাতিগত অথবা স্থানগত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও দু'-একজন বিদেশীকে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে যাঁদের ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা সুবিদিত। কিন্তু তাঁদের অনেকের ভালোবাসা পক্ষপাতপূর্ণ। ভারতের সকল কিছুই তাঁদের ভালো লেগেছে। তুমি ভারতীয়, সেইটেই তাঁর ভালো লাগার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি সায়েবের কাছে আরও কিছু দেখেছি। ভালোবাসাটা মানুষের জন্য। তুমি মানুষ এই পরিচয়ই যথেষ্ট, আর কিছুর প্রয়োজন নেই। তেমনি, কেউ যদি অন্যায় করে, তিনি সর্বশক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। জাত কিংবা স্থানের খবর নেননি।

সে-পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল একটি মামলায়। এই মামলায় সায়েব কিন্তু ব্যারিস্টার ছিলেন না। তিনি নিজেই বাদী। তিনি নিজেই মামলা করেছিলেন কয়েকজনের বিরুদ্ধে। একটি ক্লাবের সভ্য ছিলেন সায়েব। এটি কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের ক্লাব। ভারতীয় সভ্য এখানে নেওয়া হতো না। স্বাধীনতার কিছু আগে অনেক ইংরেজ এদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটোচ্ছিলেন। ফলে ক্লাবের সভ্য-সংখ্যা আকস্মিকভাবে অনেক কমে গেল। গুণে দেখা গেল যাঁরা এখনও সভ্য আছেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র সাত আট জন। ক্লাবের তহবিলে কিন্তু তখনও কয়েকলক্ষ টাকা। সায়েবকে বাদ দিয়ে অন্য সভ্যরা ঠিক করলেন, এই সুযোগে ক্লাব তুলে দিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করতে পারলে প্রত্যেকেই কিছু টাকা পাবেন। সায়েব কিন্তু রাজী হলেন না। তিনি বললেন, ক্লাব নষ্ট করা কিছুতেই উচিত হবে না। আমরা সহজেই ভারতীয় সভ্য নিতে পারি। তাতে ক্লাব আবার পূর্বেকার মতো চলতে পারবে। অন্য সভ্যরা তাঁর কথা শুনে হাসলেন। সংখ্যাধিক্যের জোরে ক্লাব তুলে দেওয়ার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হলো।

সায়েব কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন অন্যায় তিনি হতে দেবেন না। ক্লাব তুলে দেবার পিছনে স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্র রয়েছে, তার মনে হলো। যে-রাতে ক্লাব তুলে দেওয়ার সভা হয়েছিল, সে-রাতে তিনি ঘুমোতে পারলেন না। বই-টই ঘেঁটে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, অন্য সভ্যদের কাজের মধ্যে আইনঘটিত গলদ আছে।

মামলা রুজু করলেন তিনি। ইংরেজ মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল এর জন্য। আইনের প্রশ্নটা আমার মনে নেই। তবে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই মামলার শুনানীর ভার যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক স্পেশাল বেঞ্চের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তা ভুলিনি। মামলার তদবিরের জন্য সায়েব অনেক ছুটাছুটি করেছিলেন। এখন তিনি ব্যারিস্টার নন, মক্কেল। এই কেসের প্রথম অংশে সায়েবের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু। স্যার তেজবাহাদুর তখন অসুস্থ। তবুও তিনি অনেকের বাধা অমান্য করে আদালতে এসেছিলেন। এবং যতোদূর মনে পড়ে এই তাঁর শেষ মামলা। এরপরেই তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন।

এই মামলায় শেষপর্যন্ত সায়েব জিতেছিলেন। ক্লাব বন্ধ হয়নি। ভারতীয়দের সহযোগিতায় বর্তমানে সে-ক্লাবের আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

কলকাতায় ফিরে এসে হাইকোর্ট না খোলা পর্যন্ত চুপচাপ কাটিয়ে দিয়েছি। কোর্ট খোলার কয়েকদিন আগে সায়েবও ফিরে এলেন। মাসখানেক রাণীক্ষেতে থাকার ফলে শরীরের বেশ উন্নতি হয়েছে। মুখের রক্তাভা, চোখের ঔজ্জ্বল্যও যেন বেড়েছে। মনের প্রফুল্লতার কথা নাই বা বললাম।

তারপর সত্যই একদিন কোর্ট খুললো। দশটার সময় ডালহৌসীতে ট্র্যাম থেকে নেমে চার্চ লেনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বহু চিন্তা মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল। ছোকাদা, অর্জুনবাবু, পাঁচুগোপালবাবু, এঁদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। এতোদিন যেন আইন-পাড়ার অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিলাম।

ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে পা দিয়ে আরও অনেক কিছু মনে পড়তে লাগলো। বার লাইব্রেরীর কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললাম, "এই যে, কেমন আছেন?" কেদারবাবু যিনি লাইব্রেরী থেকে বই আনতে গেলে খিটখিট করেন, তিনিও আজকে অন্য মানুষ। হাত তুলে নমস্কার করলেন। বললেন, "তোমাদের সব খবর ভালো তো।" তারপর নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, "বই-টই কিছু দরকার নেই আজকে?" অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার এই গুণ, মনে মনে ভাবছিলাম।

হাইকোর্ট বাড়িটার দিকে এতোক্ষণে চোখ পড়লো। চকচক করছে বাইরের দিকটা, ছুটির মধ্যে রঙ করা হয়েছে। মনে হলো দীর্ঘ বিরহের শেষে প্রিয়তমের আগমন-দিনে বধূ যেন সযত্নে নিজেকে সাজিয়েছে। কিন্তু তারপরেই অন্যরকম ভাবতে লাগলাম। শতাব্দী ধরে এই বিশাল প্রাসাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। যুগযুগান্ত ধরে সে দেখেছে অসংখ্য মানুষের শোভাযাত্রা। কতজন তাদের যৌবনে এখানে এল। তারপর প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের বেড়া ডিঙিয়ে একদিন টুপ করে অদৃশ্য হয়ে গেল মৃত্যুর অন্ধকারে। এই বিংশ শতকের মধ্যভাগে আমি যেমনভাবে তারদিকে তাকিয়ে দেখছি, উনিশ শতকেও কতজন ঠিক তেমনভাবে তারদিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে। একই কথা পাশের বাড়ি টেম্পল চেম্বার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বয়সে হাইকোর্ট থেকে বোধ হয় কম যায় না। সে বলছে, হাইকোর্ট থেকে আভিজাত্যে আমি হয়তো ছোটো, কিন্তু বাইরের লোকের পরিচয় প্রথমে আমার সঙ্গেই হয়। আমি যখন সব জেনে গিয়েছি, তখন হাইকোর্টের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

টেম্পল চেম্বারের এটর্নি আপিসগুলো আগেই খুলেছে। শুধু আমাদের ঘরটাই বন্ধ ছিল। ঘর খুলে দেখলাম জমাদার পরবাসীয়া বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। সায়েবের টেবিলটা নিজেই সাজাতে লাগলাম। চিঠির কাগজ, দোয়াত-কলম, পিন কুশন, ব্লটিং যথাস্থানে আছে কিনা দেখতে-দেখতে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে নজর পড়লো। সেটি দম অভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। দম দিতেই আবার ঘড়ির প্রাণ সঞ্চার হলো, টিক-টিক করে চলতে লাগলো। আমার মনে হলো এই পাড়াটাও যেন ঘড়ির মতো দম-বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আজ থেকে আবার পুরনো কায়দায় চলতে আরম্ভ করলো।

প্রথমদিনেই মামলা আছে। তাই সায়েব একটু সকাল-সকাল এলেন। বেয়ারারা তখনও কেউ আসেনি। এদিকে সায়েব নিজে কোট পরতে পারেন না। কয়েকবার কোট-পরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। শেষে তিনি রেগে উঠলেন। বললেন, "বেয়ারাগুলো এখনও কেন আসছে না?" এতোক্ষণ

চুপচাপ মজা দেখছিলাম। এবার কোনোরকমে হাসি চেপে রেখে তাঁর হাত থেকে কোটটা নিয়ে পরিয়ে দিলাম। ছোটোছেলের মতো মুখ বেশ গম্ভীর করেই তিনি কোট পরলেন। তারপর বোতাম লাগাতে লাগাতে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই, তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো। বললেন, "জীবনে এতো কিছু শিখলাম, কিন্তু এই কোট-পরাটা শিখতে পারলাম না। ছোটো-বেলায় মা পরিয়ে দিতেন, তারপর কলেজ-জীবনে এক চাকর ছিল, সেই আমাকে নষ্ট করলো। আমি মুখ থেকে কিছু বলবার আগেই সে সব বুঝে নিতো, এমনকি কোট পর্যন্ত পরিয়ে দিতো। ট্রেঞ্চে বসে লড়াই করতে শিখলাম, কামান দাগতে শিখলাম, যুদ্ধের সময় তিনদিন না খেয়ে কাটাতে শিখলাম, কিন্তু এই কোট-পরাটা আমার দ্বারা হয়ে উঠলো না।"

হাসতে হাসতে তিনি কোর্টে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই মোহনচাঁদ এল। তাকে বললাম, "তুমি বসো, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

বলা বাহুল্য, আমার গন্তব্যস্থান বার-লাইব্রেরীর সামনে বাবুদের বেঞ্চি। আমাকে দূর থেকে দেখেই অর্জুনবাবু হাত নাড়তে লাগলেন। বাবুদের বেঞ্চি আজ একেবারে বোঝাই। সবাই এসেছেন। ছোকাদা বসেছেন ঠিক মধ্যিখানে।

"তারপর কার কী রকম কাটলো," ছোকাদা জিজ্ঞাসা করলেন।

অর্জুনবাবু বললেন, "আমাদের খবর আর কী হতে পারে, দাদা? দুপুরে খাসা একখানা ঘুম লাগাতাম। এক-আধদিন সিনেমায় গিয়েছিলাম। পুজোর ক'টা দিন তো বাড়ি থেকে বেরোইনি।"

ছোকাদা বললেন, "আমার ঠিক উল্টো। ওই পুজোর ক'টা দিনই বেরোতাম। রোজ যেতাম আমাদের রামকেষ্ট আশ্রমের পুজো দেখতে। আহা, মনটা ওখানে গেলেই পবিত্র হয়ে যায়। তা ছাড়া সন্ধ্যাবেলায় থিয়াটার-টিয়াটারও ছিল।"

অর্জুনবাবু বললেন, "আমাদের হারুর খবর কী? আমাদের তো একটা খাওয়া পাওনা। তা হারু, তোমার ওয়াইফ যে চাইল্ড এক্সপেক্ট করছিল, কী হলো?"

হারুবাবু লজ্জা পেলেন। ছোকাদা মিটমিট করে হেসে

বললেন, "লজ্জা কি, বলো।" হারুবাবু বললেন, "দশমীর দিন খোকা হয়েছে।"

শ্লীলতাবোধ-বিহীন হয়ে অর্জুন তড়াং করে বেঞ্চি থেকে উঠে হারুবাবুকে জড়িয়ে ধরলে। হারুবাবুর ভগিনীর সঙ্গে নিজের একটি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করে বললে, "গতবারেও খোকা, আবার এবারেও খোকা! মাইরি লাকি চ্যাপ তুমি। তোমার ওয়াইফ একেবারে গোল্ড মাইন।" অর্জুন আরও কিছু নোংরা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ছোকাদা বাধা দিলেন। "এসব কী হচ্ছে অর্জুন? মুহুরীদের মতো সস্তা ইয়ার্কি দিচ্ছো।"

অর্জুনের মনে আঘাত লাগলো। ছোকাদাকে মুখ খিঁচিয়ে বললে, "তুমি আর শিবঠাকুরটি সেজে বসে থেকোনি। তিনকাল কেষ্টঠাকুরটি হয়ে ফষ্টিনষ্টি করলে, আর এখন বেড়ালের মাছে অরুচি।

বাক্‌বিতণ্ডা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ছোকাদাও চোখা-চোখা বাক্যবাণ ছাড়তে লাগলেন। গতিক সুবিধে নয় বুঝে আমি পালিয়ে এলাম।

তারপর মাসখানেক পূর্ণ উদ্যমে কোর্টের কাজ চললো। কতরকমের মানুষ আসে আমাদের চেম্বারে। আমি অবাক হয়ে তাদের দেখি। কোর্টে যাই। সেখানেও বৈচিত্র ও চমকের ছড়াছড়ি। তবে আজকাল মানুষ দেখেই বিভোর হয়ে থাকি না। তহুরীর জন্য মক্কেলেদের উপর চাপ দিই। এটর্নিদের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করি, "চেকটা আজ আনতে যাবো নাকি, স্যার?"

তারপর আবার ছুটি। বড়োদিন, নববর্ষ মিলিয়ে প্রায় সপ্তাহ খানেক কোর্ট বন্ধ। ছুটিতে এটর্নিরা সাধারণতঃ কাজ বন্ধ রাখেন না। খ্রীস্টমাসের দিনটি ছাড়া সায়েবও ক্লাবে বসে-বসে কাজ করেন।

এই ছুটিতে এটর্নি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী যে মেয়েটিকে সায়েবের কাছে এনেছিলেন, তাকে আমি একটুও ভুলিনি। তার নাম আরতি রায়। কিন্তু আরতি রায়ের কথা লিখতে সঙ্কোচ বোধ

করছি। হাইকোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদিন আরতির-মা আমার দুটি হাত ধরে বলেছিলেন, "বাবা এসব যেন কাগজে বার না হয়।" আমি বলেছিলাম, "আপনি চিন্তা করবেন না। কেস্‌টা যাতে কাগজে না বার হয়, তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।" রিপোর্টাররা এই ধরনের মামলার গন্ধ পেলে আর রক্ষে নেই। সে-খবর কাগজে বেরোবেই। তাদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে আরতি রায়ের কেস্ কী ভাবে আড়াল করে রেখেছিলাম, তা না বললেও চলবে। কিন্তু সে জন্য যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বলাই বাহুল্য। এক-একবার ভেবেছি, আমার এতো চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেচারা আরতি রায়ের সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। আদালতের অসংখ্য লোকের কৌতূহলী চোখের সামনে দিনের পর দিন তাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খবরের কাগজে তার প্রকাশ ও প্রচার অনেকটা কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মতো হবে।

এখন লিখতে বসে তাই দ্বিধা আসছে। আরতি রায়কে জগতের সামনে প্রচার করা উচিত হবে কিনা ভাবছি। কিন্তু মন বলছে, সময়ের ব্যবধানে সংবাদের গুরুত্ব কমে যায়। আরতি রায়কে তুমি যখন কোর্টে দেখেছিলে, তারপর অনেক শীত ও বসন্ত তার দেহে ডাক দিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আরতি রায়ের মতো ঘটনা বাংলাদেশের সবার জানা উচিত। আর আরতি রায় তো মেয়েটির আসল নাম নয়। এ আমার একটা মনগড়া নাম। সুতরাং বিবেকের কাছে কোনো দোষ করছি না।

প্রথম যেদিন এটর্নি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে আরতি এসেছিল, তার পিছনে ছিলেন এক মধ্যবয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মিস্টার চক্রবর্তীর আসার কারণ এই সদ্যযৌবনা নিষ্পাপদৃষ্টি মেয়েটি। কুমারী মেয়ে। দুধের মতো গায়ের রং। টানা-টানা চোখের ভুরু দুটি যেন কোনো নিপুণ চিত্রকরের সূক্ষ্ম তুলিতে আঁকা। নরম তুলতুলে শিল্কের শাড়ির উপর ফারকোট-পরা আরতি অবাকদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছিলো। ইংরেজের বাড়িতে সম্ভবতঃ তার এই প্রথম পদার্পণ।

আরতির-মাও বয়সকালে নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন। গরদের

চাদরের ভিতর হাত দুটি লুকিয়ে আছে। প্রথমে বুঝিনি, পরে লক্ষ্য করলাম তাঁর এক হাতে গেরুয়া রঙের একটা ছোট্ট থলে। তারই ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে তিনি মালা জপছেন, সঙ্গে-সঙ্গে ঠোঁট নড়ছে।

তাঁদের বসতে দিয়ে বললাম, সায়েব এখনি আসছেন। আরতির-মা চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। টেবিলের উপর ভগবান বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি। পাশেই পিতলের নটরাজ—'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে'। দরজার পর্দায় অঙ্কিত চীনা ড্রাগনের ছবি ; প্রাচীন চীনা শিল্পকর্মের সুন্দর নিদর্শন। বৈদ্যনাথবাবুর পাশে যে ছেলেটি বসেছিল তার বয়স বেশি নয়। মুখের সাদৃশ্য থেকে যে কেউ বলতে পারে ওরা ভাইবোন।

আরতির-মা ডাকলেন, "দেখ চাঁদু, এরা হিন্দু নয়, কিন্তু ঘর-সংসার কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।" চাঁদু আমার উপস্থিতিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। উত্তর না দিয়ে সে মাকে ইঙ্গিতে থামতে বললে। এমন সময় সাহেব ঘরে ঢুকলেন। সকলে চুপ।

আরতির-মা হাত জোর করে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বাংলায় বললেন, "বাপ-মরা মেয়ে, ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না। আপনাকে রক্ষে করতেই হবে।"

সায়েব বুঝতে না পেরে বৈদ্যনাথবাবুর দিকে তাকালেন। "কি হয়েছে ? খুন-জখমের মামলা নাকি ?"

বৈদ্যনাথবাবু উত্তর দিলেন, "খুন-জখমের মামলা নয়। মামলা এই মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে হচ্ছে। বিবাহ-ঘটিত গোলযোগ।"

সায়েবের সঙ্গে আমিও চমকে উঠে আরতির দিকে চাইলাম। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কে বলবে বিবাহিতা !

আরতির-মা কান্নায় ভেঙে-পড়া অবস্থায় বললেন, "সিঁদুর কপাল থেকে মুছে দিয়েছি। ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে ভাবতেই বুকটা মুচড়ে ওঠে।

সায়েবের সঙ্গে তার মায়ের কথাবার্তার দিকে আরতির লক্ষ্য নেই। সে তখন দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছে।

গোপন কিছু আলোচনা হবে বুঝতে পেরে আমি বেরিয়ে গিয়ে সায়েবের শোবার ঘরে বসলাম। দরজা ভেজানো। ভিতরে কথা চলছে। মাঝে-মাঝে দু'একটা শব্দ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে আসছিল।

মিনিট কুড়ি পরে সায়েব আমাকে ডাকলেন। বললেন, "ভিতরে এসো।"

ঘরে ঢুকতেই শুনলাম, সায়েব বলছেন, "আরতিকে এখানে রেখে আপনারা সবাই পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।" বৈদ্যনাথবাবু একটু ইতস্তত করেছিলেন। সায়েব তাঁকেও চলে যেতে বললেন।

ওঁরা চলে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দো'ভাষীর কাজ করতে পারবে?"

আমি অবুঝের মতো চেয়ে রইলাম। দূরে সোফার এক কোণে আরতি মুখ নিচু করে বসে আছে।

"আত্মীয়স্বজন সামনে থাকলে নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারে না অনেকে। তাই ওঁদের বার করে দিলাম। মেয়েটির নিজের মুখ থেকে সব শোনা প্রয়োজন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বৈদ্যনাথবাবু চলে গেলেন কেন?"

"প্রশ্ন করলে মক্কেলের হয়ে উনিই উত্তর দিয়ে দেন। এই স্বভাব আরও বিপজ্জনক। যাক, পারবে দো'ভাষীর কাজ করতে?"

"কখনও যে দো'ভাষীর কাজ করিনি।"

সায়েব বললেন, "সেজন্য চিন্তা নেই। আমি যা জিজ্ঞাসা করবো, তোমাদের ভাষায় আরতিকে তা বুঝিয়ে দাও। তারপর ওর উত্তর বাংলা থেকে ভাষানুবাদ করে আমাকে শোনাও, ভাবানুবাদ নয় কিন্তু।"

"আরতি", সায়েব ডাকলেন।

আরতি যেন ভয় পেয়েছে। লজ্জাবতী-লতার মতো সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। তার দৃষ্টি মেজেতে নিবদ্ধ।

"আরতিদেবী, আপনি ইংরেজী জানেন কিনা সায়েবকে বলুন।" আমি বাংলাতে বললাম।

আরতি আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকালো। বাঙালী ঘরের মেয়ে, তার অসহায় অবস্থা খানিকটা বুঝতে পারি। শেষে খুব আস্তে সে বললে, "না, সায়েবদের ইংরেজী বুঝি না।"

"বাঃ এই তো কথা ফুটেছে," সায়েব সানন্দে বললেন। "ইস্কুলে পাঠায়নি মা?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, ক্লাশ নাইন।" আরতির উত্তর আমাকে অনুবাদ করতে হলো না।

সায়েবের নির্দেশে আরতিকে বললাম, "সায়েব বলছেন, মোটেই লজ্জা করবেন না। আপনার মা, ভাই কেউ এখানে নেই। সুতরাং আপনার মনের ঠিক কথাটি সায়েবকে বলুন, তা হলে সায়েবের পক্ষে কেস করা সহজ হবে।"

আরতি চুপ করে রইলো।

"Is her husband a beautiful person? Did she love him, after the marriage?" সায়েব আমাকে অনুবাদ করতে বললেন।

আরতিকে প্রশ্নটি বাংলায় জিজ্ঞাসা করতে আমার নিজের সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। অনেক নিষিদ্ধ আলোচনা সহজেই ইংরেজীতে করা যায়, কিন্তু নিজের মাতৃভাষায় এক অপরিচিতা যুবতীকে জিজ্ঞাসা করতে কেমন বাধোবাধো ঠেকছে।

সায়েব জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। "কি হলো? গো অন্, গো অন্। সময় নষ্ট করো না।"

আর এক মুহূর্ত নষ্ট হলেই তিনি রেগে উঠবেন। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আরতিদেবী আপনার স্বামীটি দেখতে কেমন? বিয়ের পর তাঁকে পছন্দ হয়েছিল?"

আরতি মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইলো। লজ্জা ও ভয়ের সংমিশ্রণে তার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠলো। রুমালে সেণ্ট ছিল, তাই চোখ মোছার সময় তার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সে উত্তর দিলে না।

"বলুন। লজ্জা কী? সায়েব আপনার দাদুর বয়সী।" আমি বললাম।

আরতি তবুও নিরুত্তর। বেচারা শেষে কান্নায় ভেঙে পড়লো। "মা কোথায়? আমি মায়ের কাছে যাবো।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়েব বললেন, "আজ তা হলে এই পর্যন্ত থাক। এখনই মিসেস বোস্টন নামে একজন নতুন মক্কেলের আসবার কথা আছে।"

আরতির-মা শনিবারে আসবেন বলে বিদায় নিলেন।

একটুপরেই মিসেস বোস্টন এলেন। বছর পঁচিশের রূপসী

ও স্বাস্থ্যবতী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ক্লান্ত মুখশ্রী। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে-দোলাতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

"গুড্ ইভনিং মিসেস বোস্টন। সোজা আপিস থেকে আসা হচ্ছে নাকি?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, বাড়ি ঘুরে আসতে হলে পাছে দেরি হয় সেই জন্য সোজা চলে এলাম।"

"তাহলে চা মন্দ লাগবে না।"

ধন্যবাদান্তে মিসেস বোস্টন জানালেন, চা পানে আপত্তি নেই।

চায়ের কাপ সামনে রেখে কথা আরম্ভ হলো। মিসেস বোস্টনের কথায় ও ভাবে জড়তা নেই। কে বলবে তাঁর সঙ্গে সায়েবের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

"বৈবাহিক ব্যাপারে আপনার উপদেশ প্রয়োজন।" মিসেস বোস্টন বেশ সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন। সায়েবের পাশে বসে আমি ভাবছিলাম, মিনিট কয়েক আগে যে মেয়েটিকে দেখেছি তার সঙ্গে মিসেস বোস্টনের কত পার্থক্য!

মিসেস বোস্টন বললেন, তিনি এক মার্চেণ্ট আপিসের টেলিফোন অপারেটর। স্বামী পোর্ট পুলিশের সার্জেণ্ট, বর্তমানে বিপথগামী ও দুশ্চরিত্র। অর্ধেক দিন বাড়ি ফেরেন না। মিসেস বোস্টন অবিচলিতভাবে বললেন, স্বামীর সঙ্গে আর ঘর করা সম্ভব নয়।

মিসেস বোস্টন আইনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি জানেন। তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতে হলো না, নিজেই বললেন, "চরিত্রহীনতার প্রমাণ আমি পূর্বেই সংগ্রহ করে রেখেছি। তার জন্য অসুবিধা হবে না। ছেলেকেও আমার কাছে রাখতে চাই।"

মিসেস বোস্টনের সঙ্গে আরতির তুলনা করছিলাম। দু'জনেই প্রায় এক সমস্যা নিয়ে এসেছে। অথচ একজন নিঃসঙ্কোচে সব বলে যায়; আর একজন প্রশ্ন করলেও নীরব থাকে এবং ফুঁপিয়ে কাঁদে!

কয়েক দিন পরের কথা। চেম্বারে আমার কাজ ছিল। তাই সায়েব আমাকে রেখে আগেই ক্লাবে ফিরে গেলেন। সন্ধ্যার একটু পরে যখন আমি ক্লাবে গেলাম তখন দেখি আরতির-মা সোফায়

বসে রয়েছেন। সায়েব ও আরতির মধ্যে খুব ভাব জমে গিয়েছে। সায়েব খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে ইংরেজী বলছেন। আরতিও ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বেশ কথা বলে যাচ্ছে।

"এ বাচ্চা মেয়েটি কে?" দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে আঙুল দিয়ে আরতি আব্দারের স্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

"আন্দাজ করো দেখি", সায়েব বললেন।

"আপনার মেয়ে।"

"উঁহু, হলো না।" আমার মেয়ে বা ছেলে কিছুই নেই।"

"বলুন না কে।" আরতি ছাড়বে না।

"মেয়েটি এখন অনেক বড়ো হয়েছে। কিন্তু আমি যখন তাকে প্রথম দেখি, সে এইরকম ছোট্ট ছিল। তখন থেকে আমাদের দু'জনের খুব ভাব। ও আমার বউ।"

সায়েবের কথা শুনে আরতি ও চন্দ্রশেখর দু'জনেই হাসিতে লুটিয়ে পড়লো। কে বলবে ওরা মামলা করতে এসেছে।

"তোমার বোন চেষ্টা করলে তোমার থেকে অনেক ভালো ইংরেজী বলতে পারবে," সায়েব চন্দ্রশেখরকে বলছিলেন। কিন্তু আমাকে দেখে কথা বন্ধ করে তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, "আর গল্প নয়। এই ভদ্রলোক আমাকে কাজ করতে না দেখলে ভয়ঙ্কর রেগে যান।"

কাজ আরম্ভ হয়। আরতির ভয় কেটে গিয়েছে। যদিও সে চুপচাপ বসে থাকে, তবুও প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। আরতির মা বলে যান। চন্দ্রশেখরও মাঝে-মাঝে যোগ দেয়। ওদের দ্রুত-কথনের সঙ্গে আমার দ্রুত-লিখনের পাল্লা চলে। ওরা বলে যায়, আমি খাতায় শর্টহ্যাণ্ডের ইকড়িমিকড়ি টানি।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে আরতির বাবা রসময় মুখুজ্যে অসময়ে চোখ বুজলেও তাদের প্রতিপালনের মতো অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। একডালিয়া রোডের বাড়িটাও খুব ছোটো নয়। কিছুদিন আগে মা বললেন, নিচে রাস্তার ধারের ঘর দুটো দোকানঘর করে ভাড়া দিলে হয়। কাগজে বিজ্ঞাপন বার হয়। যারা বিজ্ঞাপনের উত্তর দিলো, তাদের মধ্যে অমল রায়ও ছিল। চোখে কালো চশমা ও দামী আদ্দির পাঞ্জাবি পরে অমল রায়

দোকানঘর দেখতে এল। ঘরটা নিজের জন্য নয়, তার এক বন্ধুর জন্য প্রয়োজন। ভাড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বন্ধুর দোকানে প্রায়ই আসতো অমল। চাঁদুর সঙ্গে তার খুব ভাব। দেখা হলেই বলে, "এই যে চাঁদু, ভালো তো? মা কেমন আছেন?"

"চলুন না ভিতরে, একটু চা খেয়ে আসবেন।" চাঁদু একদিন বললে। এবং সেদিন থেকেই বাড়ির ভিতর তার অবাধে যাওয়ার অনুমতি মিললো। আরতির-মা বললেন, "সময় পেলেই এদিকে এসো বাবা।"

নিঃসঙ্গ অভিভাবকহীন পরিবারে অমলের আসা-যাওয়াকে আরতির-মা আশীর্বাদ মনে করলেন।

ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। সে একদিন বললে, "মাসিমা, আপনাদের সমস্ত বাড়িটা রাখবার প্রয়োজন কি? নিচের আরও দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়ে দিন, কিছু টাকা আসবে।"

"সত্যি বাবা, তোমার বুদ্ধি আছে। এমন সুন্দর মতলব আমার মাথায় আসেনি।"

"না না মাসিমা, ও-সব বলে লজ্জা দেবেন না। বাবার চার পাঁচটা বাড়ি রয়েছে, উনি দিনরাত ওই সব করছেন। তাই দেখে দেখে খানিকটা শিখেছি। কিন্তু বাবার তুলনায় আমি তো কিছুই জানি না। ওঁর অদ্ভুত কর্মশক্তি। আপিস থেকে ফিরেই বিষয় সম্পত্তির কাজ নিয়ে ডুবে থাকেন।"

"উনি কী করেন?"

"ওহো বলতে একদম ভুলে গিয়েছি, বাবা ইঞ্জিনীয়ার।"

আরতির-মা যা বলেছিলেন, আমি ঠিক তাই এখানে লিখে যাচ্ছি। ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মালা জপতে-জপতে তিনি বলছেন। আমার কিন্তু ঘেমে ওঠার মতো অবস্থা। তিনি বাংলায় যা বললেন তা ইংরেজীতে সায়েবকে শোনাতে হচ্ছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে নোটবুকে লিখে নিতে হচ্ছে। সায়েব গম্ভীরভাবে আরতির-মায়ের দিকে চেয়ে আছেন। আর মাঝে-মাঝে বলছেন, "আপনি একটু সংক্ষেপে বলুন, অতো দীর্ঘ বিবরণ দরকার নেই।"

সামান্য জিনিসকে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ করে বলার ক্ষমতা

এই ভদ্রমহিলার। একই কথা তিনবার বলবেন। আবার জিজ্ঞাসা করবেন, আমি সব কথা সায়েবকে বলছি কিনা। অমল কবে কী খেয়েছে, কতরকমের নিরামিষ তিনি রাঁধতে পারেন, কিছু বলতে বাদ রাখবেন না। তাই এখানে বর্ণনাটা তাঁর মুখ দিয়ে করাচ্ছি না।

আরতির-মা ক্রমশঃ অমলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কর্পোরেশনের ট্যাক্স জমা দিতে হবে। কে যাবে? অমল। ভাড়াটিয়ারা কোর্টে মামলা করেছে। অমল উকিলের কাছে যায়। কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়া? সেও অমল।

"জানেন মাসিমা, আরতিকে আমি স্নেহ করি। অথচ ও ভালো করে কথা বলে না। মুখ গোমড়া করে থাকে।"

মা ডাক ছাড়েন। "আরতি এদিকে একবার আয় তো।"

"কী মা?"

"অমল এসেছে। আমাকে পুজোর বাসনপত্র মাজতে হবে। বেচারা চুপচাপ বসে থাকবে কেন? চায়ের জল চাপা।"

অমল আবার আসে। আরতির-মা জিজ্ঞাসা করেন, "কি বাবা মাসখানেক যে দেখা নেই।"

"পরীক্ষার পড়াশুনায় ব্যস্ত ছিলাম। আবার যা-তা পরীক্ষা নয়, এম. এ। গাদা-গাদা বই মাসিমা, পড়ে শেষ করা যায় না।"

"লেখাপড়ার কথা শুনলেও আনন্দ। কিন্তু এই ক'দিনে শরীর যে শুকিয়ে গিয়েছে।"

"চাঁদু কোথায়?"

"দেখো দিকিনি। নিশ্চয় আরতির সঙ্গে ঝগড়া করছে। ও দুটোকে কিছুতেই শান্ত রাখতে পারি না।"

মাস কয়েক পরে বিরাট মিষ্টির ঝুড়ি হাতে অমল বাড়িতে ঢুকলো। "মাসিমা সুসংবাদ, পাশের খবর বেরিয়েছে।"

"বাঃ, সেজন্য তো আমি তোমাকে খাওয়াবো। তুমি আবার আনলে কেন?"

"আর মাসিমা, আপনি না হয় খাওয়ালেন, কিন্তু আরতিরা ছাড়বে কেন? যা হোক, আপনাদের আশীর্বাদে রেজাল্ট ভালোই হয়েছে। কিন্তু আর তিনটে নম্বর মাসিমা..."

"তিনটে নম্বরে কি হবে ?"

"তিন নম্বর হলেই ফার্স্ট হয়ে যেতাম। জাস্টিস মুখুজ্যের মেয়ে আরাধনা আমাকে বিট করে দিলে। জাস্টিস মুখুজ্যে আবার বাবার বিশেষ বন্ধু। ওঁর অনেকদিনের ইচ্ছা আরাধনাকে আমি···।"

"তাই নাকি ?"

"কতবার জাস্টিস মুখুজ্যে আমাকে বলেছেন সময় পেলেই আলিপুরে চলে আসবে। আমার কিন্তু ওসব পছন্দ হয় না। আরাধনা তো ওই রাগেই টেবিল-টেনিস, ব্যাডমিণ্টন ছেড়ে শুধু বই নিয়ে ডুবে থাকলো।"

অমলের 'মাসিমা' অবাক হয়ে শোনেন।—"এমন সোনার টুকরো ছেলে কোথায় মেলে ?"

আর একদিন অমল বললে, "মাসিমা, চাঁহু ও আরতিকে সিনেমায় নিয়ে যাবো। লাইটহাউসে ভালো বই হচ্ছে।

মাসিমা আরতিকে যেতে বললেন। "যা, সিনেমা দেখে আয়।" আরতি রাজী হয় না। "আমি যাবো না। ভালো লাগে না।"

"তা কেন যাবে ? পাড়ার যতো পচা বাংলা বই হচ্ছে তার সবগুলো তো দেখা চাই। লাইটহাউসে গেলে একটু-আধটু ইংরেজী শেখা যাবে, সেখানে ভুলেও যেও না।"

শেষ পর্যন্ত চাঁহু ও আরতি সিনেমায় গিয়েছিল। বাড়ি ফিরলো ট্যাক্সিতে। চাঁহু বললে, "আজ অমলদা খুব খাওয়ালেন, চমৎকার রেস্টুরেণ্ট।"

"মাসিমা, এবার মিনার্ভায় ভালো বই এসেছে। চাঁহুর তো দেখা বিশেষ প্রয়োজন। যতো সব সায়েন্সের ব্যাপার। আই-এস-সি'তে শুধু বই পড়লে তো চলবে না, বাইরের অনেক কিছু জানতে হবে। আমাদের অমিয় চাটুজ্যে যে ম্যাট্রিকে ছুটো আই-এস-সি'তে তিনটে লেটার পেয়েছিল, কলেজের বই তিন মাসে শেষ করে সে শুধু বাইরের বই পড়তো।"

সিনেমা দেখে সন্ধ্যার সময় ট্যাক্সিতে অমলরা ফিরলো। আরতির হাতে এক থোক রজনীগন্ধা। বললে, "অমলবাবু কিনে দিয়েছে। খুব সস্তায় ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের সামনে বিক্রি হচ্ছিলো।"

"এই যে দিদি, আরতির জন্য ওই সুন্দরপানা ছেলেটিকে তাহলে জামাই করছেন ?" পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

"কে বললে ?"

"না বললেও বোঝা যায়। পাড়াসুদ্ধ সবাই জানে। কালকে কি পাকা দেখা ছিল ? অতো ফুলটুল নিয়ে গাড়ি থেকে নামা হলো।"

আরতির-মা প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু পাড়ায় যেখানে যান, একই কথা। "আরে বাবা, লুকোচ্ছো কেন ? অমল নিজে চায়ের দোকানে গল্প করছিল, আমার ছেলে সেখান থেকে শুনে এসেছে। আরতির সঙ্গে ওর নাকি 'ইয়ে চলেছে।"

আরতির-মা'র কাঁদতে ইচ্ছে হয়। রসময় মুখুজ্যের বংশে এমন অপবাদ।

এটর্নি বৈদ্যনাথবাবু একটু দেরিতে এসে সায়েবের পাশে বসেছিলেন।

রসময় মুখুজ্যে ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। বন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি মাঝে-মাঝে আরতিদের দেখাশোনা করতে যেতেন। আরতির-মায়ের চিঠি পেয়ে তিনি দেখা করতে এলেন। আরতির-মা কী করবেন বুঝতে পারছেন না। বৈদ্যনাথবাবুও বুঝতে পারেন না ব্যাপার কতদূর এগিয়েছে।

অমল জানালো, সে আরতিকে বিয়ে করতে পারে, তবে বাবা জানতে পারলেই বিপদ। গোপনে শুভকর্ম সারতে হবে। পরে মায়ের মাধ্যমে বাবাকে শান্ত করা খুব শক্ত হবে না।

"অগত্যা আমাদের বিয়েতে মত দিতে হলো", বৈদ্যনাথবাবু বললেন। "তাছাড়া অরতির-মা তখন বললেন, ছেলেটি খারাপ নয়।"

সায়েব এতোক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিয়েটা কী ভাবে হলো বলুন।"

"সিভিল ম্যারেজ আইনে বিয়ে। রেজিস্ট্রার বাড়িতে এসে বিয়ে দিয়ে গেলেন," বৈদ্যনাথবাবু উত্তর দিলেন।

আরতির-মা আত্মীয়স্বজনদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। অমল কায়স্থ, তিনি প্রথমে জানতেন না। ধারণা ছিল ব্রাহ্মণ। না হলে

জাস্টিস মুখুজ্যের মেয়ে আরাধনার সঙ্গে—। বৈদ্যনাথবাবুর প্রশ্নে কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেলো।

বিয়ের দিন রাত্রে প্রচুর রান্না হয়েছে। অমল বলেছিল তার অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে। কিন্তু কোথায় বন্ধুরা? কারুর দেখা নেই। অমল বললে "কি জানি, এল না কেন। অথচ সবাই আসবে বলেছিল।

মেয়েকে সোনায় সাজিয়ে দিয়েছিল আরতির-মা। দান-সামগ্রীর কোনো ত্রুটি রাখেননি।

বিয়ের পর কনে-জামাই-এর বিদায় নেওয়াটা চিরাচরিত রীতি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কোথায় যাবে তারা? কনের বাড়িতেই ফুলশয্যা পাতা হলো। রাশি-রাশি ফুলে সাজানো ঘর। নানা বর্ণ ও গন্ধের পুষ্পাভরণে আরতিকেও সদ্য ফোটা ফুলের মতো দেখাচ্ছিল।

কিছুদিন মন্দ কাটলো না। "জামাই-এর যত্নের জন্য যখন যা প্রয়োজন করেছি", আরতির মা বলছিলেন। "আমি নিজে একটু সুখী মানুষ। দোতলার দক্ষিণমুখো ঘরটাতে চিরকাল শুতাম। জামাই-এর জন্য তাও ছেড়ে দিয়েছি।"

সায়েব বললেন, "আপনি এবার থামুন"। আরতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অমলকে তোমার পছন্দ হয়েছিল?"

আরতি উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

সায়েব আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বিয়ের পর অমল তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতো?"

আরতি এবার উত্তর দিলে। বললে, "প্রথম প্রথম আমাকে খুব আদর করতো।"

সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?"

আরতি আবার চুপ হয়ে গেল। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও মুখ খুললে না।

আরতির-মা বললেন, "তারপরের ঘটনা আমি সব জানি। আরতির কাছ থেকেই শুনেছিলাম।"

আরতির-মা যা বললেন, তাতে জানা গেল বিয়ের কিছুদিন পরেই অমলের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হয়। দিন পনেরোর জন্য আরতি ও চাঁদু মামার বাড়ি গিয়েছিল। অমল যায়নি, বালিগঞ্জের বাড়িতে শাশুড়ীর কাছেই ছিল।

ফিরে এসে আরতি দেখলে অমল যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে সে টাকা চায়। প্রায়ই বলে, "কিছু টাকা দিতে পারো? বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না, টাকাও আনা হচ্ছে না।" মাকে বলতে আরতি লজ্জা পায়। নিজের গোপন সঞ্চয় যা ছিল তার থেকে কিছু স্বামীকে দেয়।

"তুমি যে ব্যবসা করছিলে, সেখানে যাও না?" আরতি জিজ্ঞাসা করলে।

আরতিকে জড়িয়ে ধরে অমল বলে, "তোমাকে ফেলে যেতে ইচ্ছে হয় না।"

"ছিঃ লোকে বলবে কি।" বাহুবন্ধন থেকে আরতি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

"আরতি কিছু টাকা দিতে পারো?"

"আমার নিজের তো আর কিছুই নেই," আরতি দুঃখের সঙ্গে উত্তর দেয়।

"বাজে কথা ছাড়ো, টাকা আমার চাই। মায়ের কাছে চাও।"

আরতি চমকে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কোন্ সময়ে মায়ের কাছে টাকা আনতে উঠে যায়।

"আমার কিছু টাকা দরকার।"

"তিনদিন আগে মায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা এনে দিয়েছি।"

"বাজে বকিও না।"

"বারবার হাত পাততে লজ্জা করে। আমি পারবো না।"

"লজ্জাবতী লতা-আমার। ওষুধ পড়লে তোমার ঘাড় পারবে।"

আরতি কেঁদে ফেলে। বিছানায় মুখ লুকিয়ে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়ে ফেলে। মাকে বলতে ইচ্ছা হয় সব। কিন্তু সঙ্কোচে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

সেদিন রাত্রে ষাট পাওয়ারের বাতি নিবিয়ে, অমল নীলাভ স্তিমিত আলোর সুইচ টিপে দিলে। বিছানার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো সে। ঘৃণা বোধ হচ্ছিলো আরতির। নীচ, অসভ্য

লোক। অমল তার মুখের চাদরটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। ঘৃণায় রি রি করে উঠলো আরতির দেহ।

অমল কানের কাছে মুখ এনে বললে, "রাগ হয়েছে বুঝি। মাপ চাইছি। বাবাকে এখনও রাজী করাতে পারছি না, তাই মনটা মোটেই ভালো নেই। কখন যে কাকে কি বলে ফেলি।" আরতি তবুও নিশ্চল পাথরের মতো পড়ে রইলো।

অমল আবার ক্ষমা চাইলো। বারংবার প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও পিঠে হাত বোলাতে লাগলো। "লক্ষ্মীটি চোখ খোলো, দেখো কী এনেছি।"

আরতি আর অভিমান রাখতে পারলো না। সে চোখ খুললো। অমলের হাতে তু'ছড়া শ্বেত-শুভ্র রজনীগন্ধার মালা। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ভুলে গেল আরতি। স্বামীর বন্য ও উষ্ণ আলিঙ্গনে তার অন্তরের সকল সঞ্চিত অভিমান ও অপমানের তুষার গলে গেল।

রাত পোহায়। অমল যেন পুরনো দিনের অমল। আনন্দ ও হাসিতে পরিপূর্ণ। আরতিও আজ খুব খুশী। অহেতুক আশঙ্কায় নিজেকে জর্জরিত করে ছিল সে, তাই ভেবে লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

"দেখুন মাসিমা"—সম্বোধনের ত্রুটি বোঝামাত্রই অমল লজ্জিত হয়ে সংশোধন করে বলে, "দেখুন মা, চাঁতুর জন্যে একটা চমৎকার সুযোগ এসেছে। এমন সুযোগ রোজ আসে না। আমারই জানাশোনা এক পাঞ্জাবীর বিরাট দর্জীর দোকান আছে। বেচারার বউ মারা যাওয়ায় কলকাতা ছেড়ে এই মাসের মধ্যে চলে যেতে চায়। চালু কারবার। মাসে হাজার টাকা স্ট্যাণ্ডিং ইনকাম। দশ হাজার টাকা পেলেই সে দোকান বিক্রি করে দেবে। একেবারে যাকে বলে সুবর্ণ-সুযোগ। দোকানের দাম তো দশ মাসেই উঠে যাবে।"

"কিন্তু অতো টাকা কোথায় পাবো? তুমি তো সব জানো বাবা।"

"তার জন্য ভাবনা কি? কসবা-র বাড়িটা বন্ধক রাখলেই টাকা

পাওয়া যাবে। মাসে-মাসে দোকানের আয় থেকে শোধ দিলে দশমাসের মধ্যেই বাড়ি খালাস হয়ে যাবে।”

“শ্বশুরের বাড়ি বন্ধক দেওয়া অলক্ষ্মীর নিদর্শন।”

রাতে ষাট পাওয়ারের বাতি নিবে গিয়ে নীলাভ মৃদু আলোটা আবার জ্বলে ওঠে। সবকিছু অস্পষ্ট, অথচ মোহময় মনে হয় আরতির। অমল আবার পকেট থেকে মালা বের করলো। শ্বেত-শুভ্র রজনীগন্ধা।

দেহ ও মনে পরিতৃপ্ত আরতি কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করছিল কিন্তু সেখান থেকে স্বামী আবার তাকে পৃথিবীর মাটিতে টেনে আনলো। বললে, “তোমার মায়ের মোটেই বুদ্ধি নেই। থাকলে টাকা দিয়ে দোকানটা নিতেন। ভাবছি, আমি নিজেই তাহলে ব্যবসাটা নিই। তুমি কি বলো ?”

“চমৎকার হয়। প্রতিমাসে হাজার টাকা রোজগার।”

“কথাটা মন্দ নয়। অর্ধেকটাকা তো যোগাড় করতে পারবো, কিন্তু বাকিটা নিয়েই সমস্যা। তোমার গহনাগুলো মাস পাঁচেকের জন্য বন্ধক দিতে পারলে…”

শুনেই আরতি ভয়ে কুঁচকে ওঠে। নীল আলো আর ভালো লাগে না। ষাট পাওয়ারের বাতিটা জ্বালাতে পারলে ভূতটা হয়তো পালাতো।

পরের দিন সকালে অমলকে একান্তে ডেকে আরতি বললে, “গহনা সম্বন্ধে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি রাজী তো হলেনই না, বরং রেগে উঠলেন।”

আশ্চর্য, অমল কিন্তু রাগ করলো না। শান্তভাবেই বললে, “ও।”

একটানা শর্টহ্যাণ্ড লিখে ক্লান্ত হাত আর চলতে চাইছিল না। সায়েবের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বুঝতে পারলেন। বৈদ্যনাথবাবুকে বললেন, “একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। আমার স্টেনোগ্রাফার অনেকক্ষণ লিখছে, ওর একটু রেস্ট প্রয়োজন।”

বৈদ্যনাথবাবু তখন জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন বুঝছেন ?’,

সায়েব বললেন, “সবটা না শুনে কিছু বলবো না। তবে এই মেয়েটির জন্য আমি সত্যই দুঃখিত।”

আরতির-মা বললেন, "ওর ভাগ্যটাই খারাপ। না হলে পাঁচবছর বয়সে বাবাকে হারাবে কেন?"

সায়েব উত্তর দিলেন না। বৈদ্যনাথবাবুকে বললেন, "এক গ্লাশ করে অরেঞ্জ স্কোয়াশ আনতে বলি।"

বৈদ্যনাথবাবু বললেন, "আমার আপত্তি নেই।"

আরতি বললে, "মা কিন্তু বাইরে কিছু খান না।"

একজন বাদে আমরা সবাই অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেলাম। আবার কাজ আরম্ভ হলো।

দোকান কেনবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর অমল যেন একেবারে পালটিয়ে গেল।

টাকার কথা একদম তোলে না। সকালে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যায়, ফেরে সূর্য ডোবার অনেক পরে। বোধ হয় ব্যবসার পিছনে খুব পরিশ্রম করছে।

একদিন বাড়ির সকলকে সে সিনেমা দেখিয়ে আনলো। ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরার আগে কে. সি. দাশের দোকানে বিরাট ভোজ।

সেই রাত্রে ষাট পাওয়ারের বাতি নিভে নীলাভ আলোটা আবার জ্বলে উঠলো। পকেট থেকে রজনীগন্ধার মালা বেরুলো। সোহাগ দেখিয়ে আরতি বললে, "আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম করছো। অমন সোনার মতো রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে।"

"হুঁ। ব্যবসার বাজার ভালো চলছে, তাই খাটতে হচ্ছে," অমল উত্তর দিলে।

সপ্তাহখানেক পর আরতির হাতে একশ' টাকা দিয়ে অমল বললে, "মায়ের কাছ থেকে যা নিয়েছিলে, ফেরত দিও।"

হাতে টাকা পেয়ে মা লজ্জিত হলেন। জামাইকে তিনি ভুল বুঝেছিলেন।

দিনকয়েক পরে খাবার সময় অমল বললে, "দিল্লী থেকে প্লেনে আমার কাকা আজ কলকাতা আসছেন। কাকা আমাকে খুব ভালোবাসেন। তাই ভাবছি আরতিকে নিয়ে ওই সময় দমদম যাবো।"

বেলা চারটায় ট্যাক্সি হাজির। আরতিকে এক ঘণ্টা ধরে

সাজিয়েছেন মা। বেনারসী শাড়ি, গলায় আধুনিক ডিজাইনের হার, পরিপুষ্ট নিটোল হাতে চুড়ির গোছা—যেন লক্ষ্মী-প্রতিমাটি। একটুখানি ঘোমটা দিয়েছে আরতি, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে।

যাবার আগে মা বললেন, "চাঁতুকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

অমল বেশ অসন্তুষ্ট হলো। অনিচ্ছার সঙ্গে বললে, "বেশ তো। চলুক আমাদের সঙ্গে। তবে পড়াশুনার ক্ষতি হবে।"

মা বললেন, "একদিনের ব্যাপার, এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তাছাড়া তোমরা তো সাতটা-আটটার মধ্যে ফিরে আসছো।"

চাঁতুকে গাড়িতে ঢুকিয়ে নিয়ে অমল বললে, "হ্যাঁ, সাতটা-আটটার মধ্যেই ফিরবো।" ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো।

শ্যামবাজারের মোড়ে শীতের সন্ধ্যা নেমে এল। ট্যাক্সি থামিয়ে অমল বেরিয়ে পড়লো। ফিরলো দ্বারিকের দোকান থেকে কেনা একটা সন্দেশের চৌকো বাক্স হাতে। ট্যাক্সি স্টার্ট নিচ্ছিলো। এমন সময় অমল বললে, "এই যাঃ। একটু থামো। কাকার জন্য তো আরও কিছু নরমপাকের সন্দেশ নিতে হবে। উনি কড়াপাক একদম পছন্দ করেন না, মনেই ছিল না। আরেকবার যেতে হবে। চাঁতু ভাই এবার তুমি…।"

হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়।" জামাইবাবুর হাত থেকে পাঁচ টাকার নোট নিয়ে চাঁতু দ্বারিকের দোকানের দিকে চললো।

"একটু পা চালিয়ে। প্লেনের সময় হয়ে এসেছে," অমল মুখ বাড়িয়ে বললে!

নরমপাকের সন্দেশ নিয়ে চাঁতু তাড়াতাড়ি ফিরে এসে গাড়ি দেখতে পেলো না। গাড়িটা কোথায়? এইখানেই তো ছিল। এগিয়ে গেল নাকি। চাঁতু চারিদিকে তাকায়, গাড়ি অদৃশ্য।

অধীর উৎকণ্ঠায় সেদিন কাটলো। ভয়ে আরতির-মা'র দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো। একমাত্র মেয়ে তাঁর। পিতৃহীন। পরের দিন পুলিশে খবর দিলেন। শুনে দারোগাবাবু হাসলেন। বললেন, "বিয়ে-করা-বউকে জামাই নিয়ে গেলে পুলিশ কী করবে?"

মাস পরিবর্তন হলো। কোনো সংবাদ নেই। চারদিকে অনুসন্ধান চললো, কিন্তু সব ব্যর্থ।

প্রায় ছ'মাস পরে বাড়ির সামনে আবার একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। হর্ন শুনে মা ছুটে বেরিয়ে এলেন। একি? ট্যাক্সিতে আরতি বসে রয়েছে। কিন্তু একি হয়েছে আরতির। আরতি বললে, "কথা পরে, আগে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দাও।"

আরতিকে চেনা যায় না। শরীরে এক ফোঁটা মাংস নেই। রক্তহীন পাংশু দেহ। পরনে নোংরা সাদা খোলের শাড়ি। হাতে একগাছি নোয়া, আর কিছু নেই।

আরতি কোনো কথা বলে না, শুধু কাঁদে। ডাক্তার এল। পরীক্ষা করে বললেন, দেহের অবস্থা শোচনীয়। রক্তহীনতা রোগ। গুরুতর নার্ভাস ডিসঅর্ডার। ম্যালনিউট্রিশন তো আছেই।

বৈদ্যনাথবাবুও খবর পেয়ে দেখতে এলেন। অনেক বুঝিয়ে আরতির কাছ থেকে সব শুনলেন।

সেদিন ট্যাক্সি থেকে চাঁদুকে নামিয়ে দিয়েই গাড়ি ছুটতে লাগলো সারকুলার রোড ধরে। বিবেকানন্দ রোডে মোড় ফিরে সোজা হাওড়ার পুল। শেষপর্যন্ত শালকিয়ার এক বস্তির সামনে গাড়ি থামলো। অমল গহনাগাঁটি সব খুলে দিতে বললে। আরতি বললে, "এসব আমি দেবো না।"

বোকামি করো না। রাত্রে কত গুণ্ডার দল কাছাকাছি থাকে। আমি সাবধানে রেখে দেবো। কাল সকালেই আমরা ট্রেনে দেওঘর যাচ্ছি। সেখানে বাবা-মা আছেন।"

শালকিয়ার বস্তিতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে দেওঘর। কোথায় বাবা-মা? কেউ নেই। বাড়িটা শহর থেকে কিছু দূরে, কুণ্ডায়। বোধ হয় পূর্বেই ঠিক ছিল। এক কুদর্শনা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক আরতিকে বললে "চলহে রাণীসাহেবা, হাঁড়ি ঠেলতে চলো। এখানে কেউ তোমার মাইনে-করা ঝি নেই।" ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল বলে একদিন তো সে চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান দিয়ে তুলে দিলো। আরতি একদিন বললে, আমি মা'কে চিঠি লিখবো।"

"অতো মাতৃসোহাগে কাম নেই," মেয়েটি দন্ত বিকশিত করে বললে।

সপ্তাহ কয়েক পরে আবার হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে

বারাকপুর। একটা ছোট্ট টালির চালের বাড়ি। খাওয়া-দাওয়ারও বেশ অভাব। দু'বেলা ডাল-ভাত ছাড়া কিছুই জোটে না। বোধ হয় গহনা বিক্রির টাকা ফুরিয়ে এসেছে।

এইখানে সায়েব বললেন, "একটু থামুন।" চেয়ে দেখলাম সায়েবের কপালের রেখাগুলো গভীর হয়ে উঠেছে। আরতির-মা বর্ণনা করছেন। আরতি নীরবে এক ধারে বসেছিল। তাকে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-সব কি সত্য ?"

আরতির-মা ঝুলির মধ্যে মালা জপতে-জপতে বললেন, "নিশ্চয়, একদম সত্য।"

"আপনাকে নয়, আরতিকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।" সায়েব রেগে উঠলেন।

আরতি কিন্তু উত্তর দিলো না। আবার কাঁদতে লাগলো।

"এর পরের ঘটনা আরও জঘন্য। সায়েবকে বলো ভদ্রঘরের ব্যাপার, এগুলো কোর্টে বলা চলবে না।" আরতির-মা আমাকে বললেন।

সায়েব আগ্রহভরে তাঁর দিকে মুখ ফেরালেন।

কোনো এক সন্ধ্যায় অমলের সঙ্গে এক অবাঙালী ভদ্রলোক বারাকপুরের বাড়িতে এলেন। আরতিকে আড়ালে ডেকে অমল বললে, "আমার ব্যবসায়ের নতুন পার্টনার, ওকে অসন্তুষ্ট করো না।"

অবাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে অমল আরতির পরিচয় করিয়ে দিলে। ভদ্রলোক তার দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকালেন। অমলের সঙ্গে তার কথা হতে লাগলো। আরতি বসে রইলো চুপচাপ। একটু পরেই অমল বললে, "আমি এখনি আসছি। তোমরা ততোক্ষণ গল্প করো।" অমল উঠে গেল। ঘরে মাত্র দুটি প্রাণী। চার দিক নিঝুম। ভদ্রলোক আবার চোখ দিয়ে এক কদর্য ইঙ্গিত করলেন। চেয়ারটা আরও কাছে এগিয়ে এনে বসলেন।

আরতি সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। বললে, "আমি চললাম, আমার রান্না আছে। আপনি বসবেন, না উঠবেন ?" দরজা খুলে আরতি আঙুল দিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে দিলে। উত্তেজনায় সে ঘেমে উঠেছে।

সেদিন রাতে অমল ফিরলো দেরিতে। অমলের হাতে আরতির নিগ্রহ চললো ক'দিন।

কয়েকদিন পরে অমল আরতিকে কাছে ডাকলো। "কাল সন্ধ্যায় আমার পার্টনার আবার আসবে, এবার গোঁয়াতুর্মি করলে জীবন্ত কবর, মনে থাকে যেন।"

পরের দিন সকালে দু'আনা পয়সা সম্বল করে আরতি কি করে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে শ্যামবাজারে এবং সেখান থেকে ট্যাক্সি করে একডালিয়া রোডে উপস্থিত হয়েছিল, আরতির-মা তাও বললেন।

সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "আরতি ফিরে আসার পর আপনারা পুলিশে খবর দিয়েছিলেন কি?"

"না, দিইনি।"

"দেওয়া উচিৎ ছিল", সায়েব বললেন। তারপর বৈদ্যনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মামলার ব্যাপারটা এবার বলুন।"

বৈদ্যনাথবাবু বললেন, "অমল আরতিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য উকিলের চিঠি দেয়। আমরা তখন জুডিসিয়ল সেপারেশনের জন্য মামলা দায়ের করি। অমলও সঙ্গে-সঙ্গে দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করেছে। বলেছে, নাবালিকা স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রথম অধিকার।"

"আপনাদের কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হয় লোকটার অবস্থা খারাপ। কিন্তু মামলা করার টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে?"

বৈদ্যনাথবাবু বললেন, "সত্যি চিন্তার বিষয়।"

আরতির-মা বললেন, "ওনার সেই অবাঙালী পার্টনার নিশ্চয় টাকা যোগাচ্ছেন।"

সেদিনের মতো বৈদ্যনাথবাবু, আরতি, তার মা ও ভাই বিদায় নিলেন। আরতির-মা যাবার আগে সায়েবকে ভালো করে কেস্ করবার জন্য অনুরোধ করে গেলেন।

দিন তিনেক পরে ব্রীফ পড়া শেষ করে সায়েব আমাকে একটা নোট লিখে নিতে বললেন। লেখা শেষ হবার পর বললেন, "অমল বলছে সে কোনোদিন বলেনি যে, সে এম. এ. পাশ; অথবা তাঁর বাবা ইঞ্জিনীয়ার। কেস্‌টা বেশ মজার। আমরা বলছি, "অমল

একটি ঠক। শাশুড়ীর পয়সা বার করবার জন্য আরতির উপর দৈহিক অত্যাচার করেছে। ওরা বলছে, আরতির-মা প্রায়ই জামাই-এর কাছে টাকা নিয়েছেন। টাকা দিতে না পারায় মেয়েকে আটকে রেখেছেন। সুতরাং আরতিকে ফেরত দেওয়া হোক।"

আমি বললাম, "লোকটার শয়তানী বুদ্ধি খুব।"

যেদিন মামলা আরম্ভ হলো সেদিন সকালে কোর্টে গিয়েছিলাম। বেশ সাজগোজ করে আরতি এসেছে। ফিকে নীল রঙের ঢাকাই শাড়ি পরেছে। পানে ঠোঁট দুটো লাল হয়ে রয়েছে। একসঙ্গে এতো লোকজন দেখে সে কেঁদে ফেললে। ঘোমটা দিয়ে তার মা পাশে বসে ইষ্টনাম জপ করছেন।

চন্দ্রশেখর সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "জজ-সায়েব কখন আসবেন?

আমি বললাম, "সময় হয়ে গিয়েছে। এখনই আসবেন।"

চন্দ্রশেখর কোঁকড়া চুল, সুদর্শন একজন লোককে দেখিয়ে বললে, "ওই হচ্ছে অমল।" আমাদের দেখেই অমল একটু দূরে সরে গেল।

এদিকে কোর্টঘরেও অনেক লোক জমা হয়েছে। কিন্তু জজ-সায়েব তাঁদের হতাশ করলেন। দর্শকদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে সকলকে বাইরে চলে যেতে হলো।

মামলা আরম্ভ হলো। বসে-বসে শুনতে ইচ্ছা ছচ্ছিলো। কিন্তু উপায় নেই। বার-লাইব্রেরী থেকে কতকগুলো বই চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া টাইপের কাজ অনেক রয়েছে। লাইব্রেরীতে বই আনতে গিয়ে ছোকাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ডেকে বললেন, "এই যে স্যার, এতো হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছো কোথায়? মিত্তিরের কোর্টে তোমাদের ওই বাঈজীর মামলাটা শুনতে গেলাম, তা বার করে দিলে।"

"বাঈজী কোথায় পেলেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আরতি-বাঈ না ওইরকম কী একটা যে নাম শুনলাম।"

হারুবাবু বিড়ি টানছিলেন। তিনি বললেন, "ছোকরা আছে

ভালো। সব লাগ্‌ তাই কেস্‌। আর শালা আমার সায়েবের শুধু আরবিট্রেশন ম্যাটার, একটু রসকষ নেই। তা যাহোক তোমার আরতি-বাঈ-এর ফ্যাক্টটা পরে বলো কিন্তু।”

টিফিনের সময় সায়েব চেম্বারে লাঞ্চ করতে এলেন। বেশ রেগে রয়েছেন মনে হলো। মোহনচাঁদ কোর্টে ছিল। সে বললে, “বাবু, কোর্টে আমাদের এক সাক্ষীকে অন্যপক্ষের ব্যারিস্টার এমন জেরা করেছেন যে, সে ফেণ্ট হয়ে পড়ে গেল।”

ব্যাপারটা খেতে-খেতে সায়েব বললেন। “নিজের ব্যারিস্টারকে সমস্ত ঘটনা খুলে না বললে এই হয়। মামা সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন যে, বিশেষ-বিবাহ-আইনে আরতির বিয়ে হয়। কিন্তু আসলে তার আগে হিন্দুমতে আর একটা বিয়ে হয়েছিল। সে-কথা আরতির-মা কিংবা বৈদ্যনাথবাবু কেউ আমাকে বলেননি। অমলের ব্যারিস্টারের কাছে লিখিত প্রমাণ ছিল। ওই মামাই হিন্দু বিয়ের পরের দিন কাকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিটা ওরা আদালতে দেখিয়েছে। চিঠি দেখেই মামা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। আমারও ভয়ঙ্কর রাগ হচ্ছিলো। একবার ভাবলাম, এ কেস্‌ করবো না। আরও কিছু চেপে রেখেছে কিনা কে জানে। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে চলে আসতে পারলাম না। পুওর গার্ল। কোর্টে আমাকে কানে কানে বলে গেল, ‘অমলের কাছে যদি আমাকে ফিরে যেতে হয়, তা হলে আত্মহত্যা করবো।’ ”

আরতির মুখ চেয়ে এই কেসে সায়েব অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন। প্রতিদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

চারদিন ধরে মামলা হলো। অথচ আমি একদিনও কোর্টে যেতে পারিনি। সকালে অনেক কাজ দিয়ে যেতেন সায়েব। মোহনচাঁদের মুখ থেকেই যা খবরাখবর পাই তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মোহনচাঁদ বলতো, “এই কেসে সায়েব বাঘের মতো লড়াই করছেন। বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে তিনি রেগেও উঠেছেন। তিন ঘণ্টা ধরে অমলকে জেরা করেছেন।”

এ ক’দিন তাঁকে একবারও হাসতে দেখিনি। কেসের কোনো কথাও আমাকে বলেননি। শুধু একবার বলেছিলেন, “মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।”

শেষপর্যন্ত মামলায় সায়েবেরই জয় হলো। জাস্টিস মিটার অমল রায়ের কেস্ ডিসমিস করলেন। তিনি বললেন, স্ত্রী যেখানে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা করে, সেখানে আদালত তাকে ফিরে যেতে বলতে পারেন না।

রায় বেরোবার পরের দিন বিকেলে আরতিকে নিয়ে তাঁর মা ক্লাবে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আজও খুব সাজগোজ করেছিল আরতি। তার মা বললেন, "নে সায়েবের পায়ের ধুলো নে। ওনার জন্যে তো এ যাত্রা রক্ষা পেলি।"

সায়েব বললেন, "নমস্কার করতে হবে না। আমি এমনি আশীর্বাদ করছি। আর কিন্তু কেঁদো না। এখন কেউ তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

আরতির-মা বললেন, "আমাদের বাড়িতে আপনাকে একদিন খেতে যেতে হবে।"

"নিশ্চয় যাবো। বেঙ্গলী নেমন্তন্ন খাবার সুযোগ আমি কখনও ছাড়ি না।"

সায়েবের সঙ্গে আমিও আরতিদের বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। গাড়ি করে শনিবারের এক সন্ধ্যায় একডালিয়া রোডের দিকে আমরা যাচ্ছিলাম। সায়েব বললেন, "শংকর, উকিল ব্যারিস্টারদের হৃদয় অনুভূতিপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। আজকের নিমন্ত্রণে যেতে মোটেই আনন্দ পাচ্ছি না! জেতাটা যেন হার হয়ে গিয়েছে। এ-যেন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ।"

একডালিয়া রোডের বাড়িতে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা আটটা। একটু পরেই আমরা খেতে বসলাম। টেবিল চেয়ারে খাবারের আয়োজন দেখে সায়েব বললেন, "টেবিল চেয়ারের প্রয়োজন ছিল না। আমি আসনে বসতে পারতাম।" সবই বাঙালী খাবার—ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ। সায়েব কাঁটা চামচ দিয়ে খাচ্ছেন। আমরা অবশ্য হাত চালাচ্ছি। কাঁটা চামচ চালানো বন্ধ রেখে সায়েব মাঝে-মাঝে আমাদের খাওয়া দেখছেন। বললেন, "স্ট্রেঞ্জ, তোমরা একহাতে কি তাড়াতাড়ি খাও! আর আমরা ছু'হাত লাগিয়েও মাছের কাঁটা বাছতে পারি না।"

বাঁধাকপির তরকারিটা সামান্য জিভে ঠেকিয়ে দেখলেন ঝাল

কিনা। তারপর সানন্দে খেতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে আমাকে বলেন, "টেবিল-ম্যানারে ভুল হলে বলে দিও।"

কোমরে আঁচল জড়িয়ে আরতি পরিবেশন করছে। সে সায়েবকে বললে, "লিট্‌ল মোর।"

"আর একটুও নয়। এতেই বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "আমাদের মা বোনদের এই নিয়ম। খেতে না পারলেও জোর করে খাওয়াবে।"

খাওয়া শেষ হলে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সায়েব আমাকে বললেন, "তোমাকে আর একবার দো'ভাষীর কাজ করতে হবে।"

দেওয়ালে টাঙানো উত্তরা ও অভিমন্যুর ছবির দিকে সায়েব তাকিয়ে ছিলেন। তারপর আরতির মাকে বললেন, "আমি সত্যই দুঃখিত। এমন সুন্দরী টুকটুকে মেয়ে স্বামীসুখে বঞ্চিত হলো, ভাবতে কষ্ট লাগে। কিন্তু এমনই হিন্দু আইন যে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা নেই, বিধবা ছাড়া আবার বিয়ে করাও সম্ভব নয়। মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সমাজ একেবারে উদাসীন।"

আরতিকে কাছে ডাকলেন তিনি। অন্য সকলকে বাইরে বার করে দিলেন। বললেন, "আরতি মাই ডিয়ার গার্ল, আমি বৃদ্ধ, আর তুমি তো সবে মাত্র জীবন শুরু করছো। তুমি আশা ছেড়ো না, সামনের দিকে চেয়ে থাকো হিন্দু সমাজেও আলোড়ন আসছে। আমি হয়তো তখন বেঁচে থাকবো না, কিন্তু এমন দিন আসবেই যখন তুমি আর মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, মনের মতো বরের সঙ্গে আবার ঘর সংসার করবে। সেদিন কিন্তু এই বুড়োটাকে ভুলো না।"

আরতি কোনো কথা বললে না। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখে ধীরে-ধীরে সে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। তারপর আকাশের অগণিত তারার দিকে সে উদাসভাবে তাকিয়ে রইলো।

আরতি রায়কে সেই আমার শেষ দেখা। কে জানে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে একডালিয়া রোডের সেই শ্রীহীন দোতালার বাড়ির মেয়েটি হয়তো আজও প্রতি সন্ধ্যায় অধীর প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর দিন গোনে কবে নতুন আইন পাশ হবে।

ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে আমার যেসব মামলা দেখবার সুযোগ হয়েছিল তাদের প্রায় কোনোটিই বিখ্যাত বিচার কাহিনী রূপে খবরের কাগজের হেড্ লাইনে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেনি। কিন্তু বিখ্যাত মামলা ছাড়াও অনেকে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে নীরবে পদার্পণ করে নিঃশব্দে বিদায় নেয়। তারা আমার কাছে কম মূল্যবান নয় এবং তারাই আজও আমার মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে।

তেমনই একজনের কথা এখন বলবো। আরতি রায়ের পর বছরখানেকের মধ্যে মনে রাখার মতো এই একটি লোককেই দেখেছিলাম।

বছর কয়েক আগে হাইকোর্টের কাছে যাঁদের যাতায়াত ছিল তাঁদের অনেকেই তাঁকে দেখে থাকবেন। ঠিক একটার সময় প্রায় ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে রিক্‌শার ঠুনঠুন আওয়াজ হয়। লাঠির উপর তুটি হাতে ভর দিয়ে সেই রিক্‌শায় একজন বিমর্ষমুখ আরোহী বসে থাকে। পরনে ছেঁড়া প্যাণ্ট, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে শতছিন্ন কেড্‌স জুতো। কোনো বাড়ির সামনে রিক্‌শা থামিয়ে সায়েবটি ভিতরে ঢুকে যান, বেরিয়ে এসে আবার রিক্‌শা চড়েন। একটু এগিয়ে অন্য এক অপিসের সামনে তিনি আবার নেমে পড়েন।

আবার কখনো কখনো যুগলে আবির্ভাব হয়। যেমন বুড়ো সায়েব, তেমনি বুড়ী মেম। মেমের গায়ের রঙ নিকষ কালো। স্কার্টটা কতদিন যে ধোপার বাড়ি যায়নি ভগবান জানেন। কাছে গেলেই বোঁটকা গন্ধে দেহ ঘুলিয়ে ওঠে। পায়ে মোজা নেই। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো কাদাতে বোঝাই, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের বদলে চটের রেশন থলি।

মেমসায়েবকে দেখে সবাই মুচকি হেসে পালাবার চেষ্টা করে। শুধু টেম্পল চেম্বারের সিঁড়ির নিচের পানওয়ালা বিশ্বনাথ গলা পরিষ্কার করে বলে, "গুড্ মর্ডিং মেমসাব, গুড্ মর্ডিং। লাটসাবকে সাথ গভর্নমেণ্ট হাউসমে, আপকো যো খানা থা…।" রাগে ও

অপমানে কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠে মেমসায়েব পানওয়ালার উর্ধ্ব ও অধস্তন সাতপুরুষের উদ্দেশে সুমিষ্ট সম্ভাষণ বর্ষণ করতে থাকেন। "এ মেমসাব কসুর মাফ কিজিয়ে। আপ্‌কে ওয়াস্তে খুদ লাটসাব এক সিগ্রেট ভেজা হ্যায়।" পানওয়ালা একটা সিগারেট বার করে নাড়তে থাকে। এবার মেমসায়েবের ক্রোধাগ্নিতে শান্তিজল পড়লো। একরকম ছুটে গিয়েই পানওয়ালার হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিয়ে সামনের গ্যাসপোস্টে বাঁধা দড়ির আগুনে সেটা তিনি ধরিয়ে নেন।

মেমসায়েবের সামনে পড়লেই মুশকিল। আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবেন! একটু আড়ালে এনে চুপি-চুপি বলবেন, "বাবু ক্যান ইউ স্পেয়ার ফোর অ্যানাস্?" আপনি যদি চুপ করে থাকেন তখন বলবেন, "অল রাইট, টু অ্যানাস্ উইল ডু।"

এই বুড়ো একদিন লাঠি ভর করে কাঁপতে-কাঁপতে সায়েবের চেম্বারে এলেন, সঙ্গে সায়েবের অনেকদিনের পরিচিত এটর্নি মিঃ জেকব।

মিঃ জেকব সায়েবকে বললেন, "আমার নতুন মক্কেল মিস্টার জেমস্ গোল্ড।"

ছেঁড়া শার্টের বোতামটা লাগাতে-লাগাতে মিস্টার গোল্ড বললেন, "আমি একটু প্রাইভেটে কথা কইতে চাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মিনিট কুড়ি ধরে ভিতরে তিনজনের কথাবার্তা চললো। মিস্টার জেকবের প্রতিবাদে গোল্ড একবার চড়া গলায় বললেন, "না না।"

এমন সময় সায়েব আমাকে ভিতরে ডেকে বললেন, "আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি মিস্টার গোল্ডের ঠিকানাটা লিখে নাও।"

"আমার ঠিকানায় চিঠি দিলেই চলবে," মিস্টার জেকব বললেন।

"আমি মক্কেলের ঠিকানা সর্বদাই রাখি, যদি হঠাৎ কিছু..." সায়েব উত্তর দিলেন।

মিস্টার গোল্ড একটু ইতস্তত করে বললেন, "ওই তো লিখে নিন,...স্যালভেশন হোম।"

ঠিকানা খাতায় লিখে নিলাম। গোল্ড খাতাটার দিকে চেয়ে রইলেন। "বললেন, অনেকদিনের পুরনো খাতা।"

"অ্যাড্রেস বুক যতো পুরনো, ততো তার আভিজাত্য। আমি ইণ্ডিয়াতে আসা থেকে এই এক খাতা ব্যবহার করছি।"

"হ্যাঁ", গোল্ড বললেন, "খাতাটি দেখেই চিনেছি।"

আমরা অবাক। "আপনি এ-খাতা দেখেছেন আগে?"

"নাঃ, বাজে কথা থাক," গোল্ড বললেন।

"No, no Mr. Gold, that sounds interesting." সায়েব বললেন।

"আমাকে চিনতে পারছেন না?"

"ঠিক······ঠিক মনে করতে পারছি না", সায়েব লজ্জিতভাবে বললেন।

"আপনার খাতাটা দিন।" গোল্ড আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে নিলেন। মিনিট পাঁচেক 'জি' অক্ষরের মধ্যে খুঁজতেই বেরোলো। "এই যে দেখুন", খাতাটা তিনি সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলেন।

"জেমস্ ফ্রেডরিক গোল্ড

....

....

ডিঃ সাহারানপুর

ইউনাইটেড প্রভিন্স।"

"মনে পড়েছে, এইবার মনে পড়েছে", সায়েব বলে উঠলেন। "অনেকদিন আগেকার কথা। কিন্তু একদম চেনা যায় না।"

"আমি অবশ্য প্রথমেই পেরেছি", গোল্ড ম্লান হাসলো।

মিস্টার জেকব বললেন, "আমরা দিন কয়েক পরে আবার আসবো। ফী কত মোহর লাগবে জানিয়ে দেবেন।"

ওঁরা দু'জনেই চলে গেলেন। আমি অবুঝের মতো সায়েবের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোককে আগে আপনি চিনতেন?"

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান?"

"কেন? মিস্টার গোল্ড—"

সায়েব গম্ভীরভাবে বললেন, "জেমস্ গোল্ডের শিরায় শতকরা একশ' ভাগ ইংরেজ রক্ত।"

"কিন্তু ওঁর বউ তো মিশ কালো, যিনি টেম্পল চেম্বারের তলায় মাঝে-মাঝে ভিক্ষা করেন।"

"জেমস্ গোল্ডের বউ? আগে যখন জানতাম, গোল্ড তখন অকৃতদার। আর আজও আমাকে বলে গেল সে সংসারে একা।"

"গোল্ডকে কয়েক সপ্তাহ ধরে রিক্শায় চড়ে এপাড়ায় যাতায়াত করতে দেখছি।"

"টাকা থেকেও মানুষ যে পথের ভিখারী হতে পারে, তার এমন দৃষ্টান্ত আগে দেখিনি।" সায়েব বলতে লাগলেন—

"বছর পনেরো আগের কথা। সাহারানপুর জেলা কোর্টে এক বড়ো মামলায় আমি ব্রীফ পেয়েছিলাম। এখানকার এটর্নি বলে দিয়েছিলেন, ওখানে থাকবার অসুবিধা হবে না, মক্কেলের বিরাট বাড়ি আছে। আমার মক্কেল জেমস্ গোল্ড স্টেশনে এসেছিলেন, সঙ্গে বিরাট অস্টিন গাড়ি। গোল্ডের বাড়ির সামনে যখন গাড়ি থামলো আমি অবাক। বাড়ি বলা চলে না—প্রাসাদ।

গোল্ডের সম্পত্তিসংক্রান্ত মামলা করতে এসেছি। তিনি প্রথমেই বলে দিলেন, 'এ-বাড়ি আপনার নিজের মতো মনে করে থাকবেন। সংসারের খুঁটিনাটি আমি একদম বুঝি না। চাকর-বাকরদের হুকুম করলেই সব পেয়ে যাবেন।

দামী আসবাবপত্রে প্রতিটি ঘর বোঝাই। হাতীর দাঁতের কাজ ও বিখ্যাত চিত্রকরদের পেন্টিং-এর সংগ্রহটি বিলেতের অনেক লর্ড পরিবারকে লজ্জা দিতে পারে।

দিন পাঁচেক ছিলাম সাহারানপুরে। প্রতিদিন বিকেলে গোল্ডের ফিটন গাড়িতে কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এসেছি।

বিশাল ডাইনিং হলে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী। খাওয়ার সময় গোল্ড গল্প করতেন, শুধু মামলার গল্প। জীবনে মামলা ছাড়া যেন কিছু জানেন না। উনি বলেছিলেন, 'আমার কাকার সঙ্গে মামলা করেছি, বোনের সঙ্গে এখনও কেস্ ঝুলছে। একবার তিন কাজিনের বিরুদ্ধে ডিক্রি পেয়েছি।' নিজে উকিল না হলেও

আইনের কিছু জানতে তাঁর বাকি নেই। মাছধরা, ছবিআঁকা গলফ খেলার মতো মামলা করাই গোল্ডের নেশা।

কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বাড়িটা কতদিনের পুরনো ? অনেক যত্নে সব কিছু সাজানো।"

"এ-বাড়িতে আমি মাত্র বছরখানেক রয়েছি। এক বুড়ীর কাছ থেকে কিনেছিলাম। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে আমার ভালো লাগে না। বছরখানেক পরে হয়তো অন্য কোথাও বাড়ি কিনে চলে যাবো, কিছুই ঠিক নেই।"

আরও জানলাম তাঁর সংসারবন্ধন নেই। অলস অবসরে মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতাভরা জীবন। মামলা ছাড়া আর কিছু করেন না। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত ধনই নির্ভর।

মামলা শেষে কলকাতায় ফিরে এসেছি। তারপর এই পনেরো বছর গোল্ডের খবর রাখিনি।

আবার আজ দেখা। কঙ্কালসার বৃদ্ধ গোল্ডকে তুমিও দেখলে, সে আজ পথের ভিখারী।"

"কিন্তু কেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কিছুদিন আগে কোনো গোপন কারণে গোল্ডের বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা বার হয়। জীবনে বহু কুকর্মের অংশীদার গোল্ড নিখোঁজ হলেন। কিন্তু সরকার ছাড়লেন না। ফেরারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার বহু উপায় তাঁদের আছে। গোল্ডের মাথায় বজ্রাঘাত। তার সমস্ত সম্পত্তি এখন সরকারী হেফাজতে। এমন কি ব্যাঙ্কের তিন লাখ টাকাও তাঁরা 'ফ্রীজ' করেছেন! গোল্ডের চেকের আজ আর মূল্য নেই। লক্ষপতি জেমস্ গোল্ড কপর্দকশূন্য হয়ে, স্যালভেশন হোমে দিন কাটাচ্ছেন।"

এটর্নি জেকব এসেছিলেন পরামর্শ নিতে, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা।

গোল্ড এলেন কয়েকদিন পরে। লিফট থেকে ঘর পর্যন্ত আসতেই ধুঁকছেন। শতছিন্ন হাফশার্টের তলার অংশটা দিয়ে তিনি নিজের মুখ মুছলেন। সায়েবকে বললেন, "টাকা আমার চাই। আমার টাকা আমি ভোগ করতে পারবো না ?"

সায়েব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মিস্টার গোল্ড, অধৈর্য হলে চলবে কেন ?"

দু'-একটা কথার পর গোল্ড চলে গিয়েছেন। কিছু পরেই দেখি তাঁর সঙ্গিনী মহিলাটি দরজা থেকে উঁকি মারছেন। "মিস্টার গোল্ড আছেন ?"

গোল্ড নেই শুনে তিনি রাগে গজগজ করতে লাগলেন। "কি ঝঞ্ঝাট। আর ভালো লাগে না। এইখানে থাকবে বলে মিনসে চলে গেল ?" মহিলাটি বেরিয়ে গেলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার গোল্ড এলেন, সঙ্গে-মিস্টার জেকব। ভিতরে অন্য একজন এটর্নির সঙ্গে সায়েব কথা বলছিলেন। গোল্ড তাঁর নড়বড়ে দেহ নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আমার সামনের চেয়ারে বসলেন।

আমি বললাম, "এক ভদ্রমহিলা আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন।"

"মিস ফিগিন নিশ্চয়," রাগে গোল্ড দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। "কতবার বলে দিয়েছি বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করতে, তবুও কথা শোনা হয় না।

মিস্টার জেকব আমাকে ইশারা করে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন।

আরেকদিন সাড়ে দশটার সময় চেম্বারে ঢুকে গোল্ড গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস ফিগিন আর আসেনি তো ?"

উত্তর দিলাম, "না, আর আসেননি।"

"আবার যদি আসে-আমাকে বলে দেবেন।"

ভিতরে ঢুকে গোল্ড সায়েবের হাতে একটা চেক দিলেন। "মিস্টার জেকব এই পাঁচশ' টাকার চেক পাঠিয়েছেন, উনি লাঞ্চের পর আসবেন।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি না আসা পর্যন্ত এখানে বসতে পারি ?"

"নিশ্চয়", সায়েব বললেন। গোল্ড বসে রইলেন, সায়েব নিজের কাজ করতে লাগলেন।

কয়েকমিনিট পরে একটু ইতস্ততঃ করে গোল্ড আবার বললেন,

"আপনার গোটাকয়েক পুরনো শার্ট পাওয়া গেলে উপকার হতো। ঠাণ্ডাটা বেশ পড়তে আরম্ভ করেছে।"

"আমার অনেক জামা পড়ে আছে। আপনার কাজে লাগলে আনন্দ পাবো। কালই কয়েকটা নিয়ে আসবো।"

গোল্ডের এবার কাঁদোকাঁদো অবস্থা। বললেন, "এভাবে আর জীবন কাটাতে পারছি না। টাকাটা উদ্ধারের আশা আছে কিনা সত্যি করে বলুন।"

সায়েব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমরা প্রথমেই গভর্নমেণ্টকে নোটিশ দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি।"

মামলার টাকা কোথা থেকে এবং কেমন করে আসছে গোল্ডের কাছে শুনে সায়েব স্তম্ভিত। মিস্টার জেকব ব্যারিস্টারের ফী ও আনুষঙ্গিক খরচা নিজেই বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পরিবর্তে প্রায়ই নানা কাগজে সই করিয়ে নেন। কালকেই পঞ্চাশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোটে গোল্ড সই করেছেন।

শুনে সায়েবের মুখ কুঞ্চিত হলো। বললেন, "মিঃ গোল্ড, কী ভয়ঙ্কর ফাঁদে পা দিয়েছেন, বুঝতে পারছেন? সরকারের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার হলেও এক কপর্দক আপনার ভোগে আসবে না। সেটি পকেটস্থ করবার জন্য অনেকে ওত পেতে বসে আছে।"

গোল্ড চমকে উঠলেন। "আমার সঙ্গে কথা হয়েছে টাকাটা পেলে দশ হাজার টাকা জেকবকে দেবো। উনি আর কিছু চাইবেন না।"

"ক'খানা কাগজে এখন পর্যন্ত সই করেছেন?"

"ঠিক মনে নেই, তবে অন্ততঃ পাঁচটা।"

অসহ্য ক্রোধে সায়েব পায়চারি করতে করতে বললেন, "আরও আগে আমার জানা উচিত ছিল।"

"জেকব বলেছিলেন, এসব যেন আপনার কানে না যায়।"

গোল্ডকে তখনকার মতো বিদায় দিয়ে সায়েব পায়চারি করতে লাগলেন। আমি চেয়ারে বসেছিলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "মানুষের বিপদের সুযোগ নিয়ে জেকবের মতো লোকেরা সব করতে পারে। প্রদীপের তলায় অন্ধকারই সর্বাপেক্ষা গাঢ়। ধর্মাধিকরণের পাশেই যতো অধর্মের ঘাঁটি। সায়েব অস্থির হয়ে উঠলেন।

একটুপরে বললেন, "গোল্ডের কেসে ফী নেবো না। আমি অন্য এটর্নির ব্যবস্থা করছি।"

যথাসময়ে জেকবকে সায়েব জানিয়ে দিলেন, তার কারচুপি ধরা পড়ে গিয়েছে এবং এই অন্যায় তিনি বরদাস্ত করবেন না। জেকব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন—"আপনি ফী নিয়ে কাজ করবেন। মক্কেলের সঙ্গে আমি কি করছি না করছি, তাতে আপনার মাথা গলানোর প্রয়োজন নেই।"

সায়েব উত্তর দিলেন, "মিঃ জেকব, এই বয়সে আমি অন্যায়ের নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতেও রাজী নই।"

জেকবও দমবার পাত্র নন। তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে অন্য কারও অযাচিত উপদেশ শুনতে তিনি যে মোটেই আগ্রহান্বিত নন, তা সায়েবকে জানিয়ে দিলেন।

জেকবের তেজ অবশ্য বেশিক্ষণ রইলো না। যখন তিনি শুনলেন যে, প্রয়োজন হলে সায়েব সমস্ত বিষয়টি হাইকোর্টের গোচরে আনবেন, তখন নরম হয়ে পড়লেন। দিনকয়েক পরে গোল্ডের সই করা কাগজগুলো নিয়ে জেকব চেম্বারে এলেন। কাগজগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হলো। পোড়া কাগজের ছাই-এর দিকে কিছুক্ষণ বাঁকা-চোখে তাকিয়ে থেকে জেকব দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন।

গোল্ড বেশ কিছুক্ষণ সায়েবের দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন। "আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব মনে হয় না।"

সায়েব উত্তর দিলেন, "যতোক্ষণ না টাকাটা উদ্ধার করছি ততোক্ষণ আপনার কিছু উপকারই হলো না। সুতরাং কৃতজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না।"

"কতদিন সময় লাগবে বলতে পারেন?" গোল্ড আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

"বেশিদিন লাগবে না", সায়েব প্রবোধ দিলেন।

কয়েকদিন পরেই গোল্ড আবার এসেছেন। লাঠির উপর ভর করে জীর্ণ দেহটা কোনোরকমে টেনে এনে বেঞ্চিতে বসে হাঁপাতে লাগলেন। দারিদ্র্য ও বার্ধক্য একসঙ্গে যেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। চোখের কোণে ঘন কালো রেখা তাঁর ক্লান্ত মুখচ্ছবিকে আরও অন্ধকার করে তুলেছে।

সায়েব নেই, কোর্টে গিয়েছেন।

"কখন ফিরবেন ?" হতাশ হয়ে গোল্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

"চারটের আগে নয়," আমি বললাম।

দেওয়ালের র‍্যাকে থাকে-থাকে সাজানো ল রিপোর্টারগুলোর দিকে গোল্ড উদাস নয়নে চেয়ে রইলেন।

সায়েবের কাছে শুনেছি এসব রিপোর্টারের মধ্যে গোল্ডবংশের অনেক কাহিনী লুকিয়ে আছে। বহুকাল ধরে গোল্ডরা মামলা করে আসছে। এক শতাব্দী আগের মুরস ইণ্ডিয়ান রিপোর্টার-এও গোল্ডদের অন্ততঃ গোটা পাঁচেক মামলার সন্ধান পাওয়া যাবে।

গোল্ড কখনো আমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। নেটিভদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন এবং আমাদের কাছে আত্মাভিমান প্রকাশের সামান্য সুযোগও নষ্ট করতেন না। কিছু জানবার থাকলে সোজা সায়েবের কাছে চলে যান, আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না।

সায়েব না থাকায় বোধকরি সেদিন আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললেন।

"এটর্নি পাড়ার সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের পরিচয়", গোল্ড তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন। ব্যারিস্টারদের পিছনে লাখ-লাখ টাকা খরচ করেছি আমরা। বাবু, তুমি তার কিছুই বুঝবে না। তোমার সায়েবকে জিজ্ঞাসা করো, আমার কেসের জন্য কতবার আইন পালটিয়েছে।" তারপর মুখ বিকৃতি করে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?" জাস্টিস্ আমীর আলীর জাজমেণ্টের কপি এখনও আমার কাছে আছে। কোন্ ব্যারিস্টার আমার কেস্ করেনি ?—ল্যাংফোর্ড জেমস্, এল. পি. পিউ, এস. এন. ব্যানার্জী, এন. এন. সরকার—" গোল্ড খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন। "এই যে তোমার সায়েব মামলা করছেন, টাকা পেলেই প্রতিটি পাই মিটিয়ে দেবো। এসব তোমার সায়েব বুঝবেন, তোমাকে বলে লাভ নেই। আমি এখন উঠি।"

নতুন এটর্নি কয়েকদিন পরে জানালেন মামলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সরকার বাজেয়াপ্ত টাকা প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকার করছেন।

গোল্ডের আফসোসের শেষ নেই। এতগুলো টাকা—তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে, অথচ একটা পয়সা নেই। উত্তেজনায় দেহটা থর-থর করে কাঁপতে থাকে। ধিক্কারে সমস্ত মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

গোল্ডের নতুন এটর্নি হিসেবে মিঃ লাহাকে সায়েব ঠিক করেছিলেন। তিনি কেস্ ফাইল করলেন।

কিন্তু গোল্ডের আর দেখা নেই। দিন দশেকের মধ্যে টেম্পল চেম্বারে এলেন না। আমাদেরও মনে ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি দরজার কোণ থেকে মিস্ ফিগিন উঁকি মারছেন। হাতে একটা ময়লা রেশন ব্যাগ।

মিস্ ফিগিনকে সায়েবের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "গোল্ডের খবর কী? এ-পাড়ায় একদম আসছে না কেন?"

"আপনারা জানেন না?"

"না তো, কী হয়েছে?"

"মিস্ ফিগিন বললেন, প্যারা-টাইফয়েডে হাসপাতালে পরে আছেন। কাল জ্বর প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। বুড়োর সখ কম নয়, আপেল আর বেদানা খাবার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু আমি কোথায় এসব জিনিস পাবো বলুন তো?"

মিস্ ফিগিনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে সায়েব বলে দিলেন, "উনি যেন খুব সাবধানে থাকেন। কেস্ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলবেন, কাজ এগোচ্ছে।"

"আমি কেন ছাই বুড়োর জন্যে ঘুরে মরি, আমার কী দায়।" গজগজ করতে করতে মিস্ ফিগিন চলে গেলেন।

সায়েব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বেচারার জন্য দুঃখ হয়। এ-কেস্ কতদিন চলবে কিছু ঠিক নেই। বুড়ো গোল্ড এ-টাকা দেখে যেতে পারবে, আশা হয় না।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আরও বললেন, "এক একসময় মনে হয় যেন গোল্ড-বংশের সম্পদ অভিশপ্ত। বহু পুরুষের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে অভিশাপের বিষ মিশে রয়েছে। যতোদূর জানি, এ-সম্পদ সৎপথে উপার্জিত নয়। ভগবানের বিচারে কি এক রহস্যময় বৈচিত্র্য আছে। কখনো কখনো পরিহাসচ্ছলে

বহুজনের অপরাধের শাস্তি তিনি জমা করে রাখেন। তারপর একজনকে তার ফল ভোগ করতে হয়।" সায়েব হাসলেন। "নাঃ, আমরা বড়ো দার্শনিক হয়ে পড়ছি।"

কিছু দিন পরে গোল্ড আবার এলেন। কঙ্কালসার দেহটাকে হঠাৎ দেখলে ভূতের মতো মনে হয়। পরমায়ু যেন ফুরিয়ে এসেছে। সায়েব তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ছ'জনে প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথা বললেন। তারপর গোল্ড বেশ অসন্তুষ্টভাবে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন; "ওসব হবে না। কিছুতেই হবে না। ওরা আমার ছ'চোখের বিষ।"

তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে সায়েবের সঙ্গে গোল্ডের গোপন আলোচনা চলতে লাগলো। ছ'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেন। কিন্তু কি বিষয়ে সায়েব তা প্রথমে আমাকে বলেননি।

শনিবারে হাইকোর্টে কোনো কেস্ হয় না। চেম্বারে তিনি একটু দেরিতে এলেন। আমাকে ভিতরে ডেকে বললেন, "একটা উইল টাইপ করতে হবে। আজকেই সব তৈরী করে রাখতে চাই।"

সায়েব বলে চললেন। আমি লিখে নিলাম—দীস্ ইজ দি লাস্ট উইল এণ্ড টেস্টামেণ্ট অফ……। উলভারহ্যামটনের গোল্ড পরিবারের মাইকেল গোল্ডের শেষ সন্তান, অকৃতদার, অপুত্রক জেমস্ ফ্রেডরিক গোল্ডের শেষ উইল। ভারতবর্ষের অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য তিনি তাঁর চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে যাচ্ছেন।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। হাত কেঁপে গেল। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে সায়েব রহস্যময়ভাবে হাসলেন। বললেন, "বহু কষ্টে রাজী করিয়েছি। গোল্ডের জীবদ্দশায় এ-মামলার নিষ্পত্তি হওয়ায় সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু তার মৃত্যুর পরও টাকাটা সৎকার্যে ব্যয়িত হলে গোল্ডের অভিশপ্ত আত্মা কিছুটা শান্তি পাবে।"

মোটা নীল কাগজে কম্পিত হাতে জেমস্ গোল্ড সই করলেন। সই করতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কেননা উইলটা খামে পুরে সায়েবের দিকে এগিয়ে দিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "টাকা পাবার কি মোটেই আশা নেই? টাকা রয়েছে—অথচ আমার কষ্ট।"

অসুস্থদেহে রোজ লাঠিতে ভয় দিয়ে গোল্ড চেম্বারে আসতেন।

দিন-দিন ক্ষীণবল দেহে এতোদূরে আসার প্রয়োজন নেই। তবু তিনি আসেন। ধুঁকতে-ধুঁকতে বেঞ্চিতে বসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'গুড্ মর্নিং।' নিজের গল্প শুরু করেন আজকাল —পুরনোদিনের গল্প। কল্পনার পাখা উড়িয়ে সেই অতীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন, যখন কেউ ভাবতে পারতো না গোল্ড-বংশের এক সন্তান বিত্তহীন অবহেলিত হয়ে কলকাতার পথে-পথে ঘুরে বেড়াবেন।

"জানো বাবু, রবার্ট ক্লাইভ উইলিয়ম গোল্ডের উপর কীরকম নির্ভর করতেন? ক্লাইভের অনেকগুলো চিঠি আমি রেখে দিয়েছি। ইণ্ডিয়ানদের সে-সব কখনো দেখাবো না। সময়মতো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।" গোল্ডের খেয়াল নেই তাঁর শ্রোতা একজন ইণ্ডিয়ান।

তিনি বর্ণনা করে যান—উইলিয়ম গোল্ডের পর কলকাতার রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন ডগলাস্ গোল্ড। নেটিভরা সভয়ে একধারে সরে দাঁড়াচ্ছে। সামনে এক গরুর গাড়ি রাস্তা জুড়ে রয়েছে। ডগলাস্ বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করেন না। গাড়োয়ানের পিঠের উপর তাঁর হাতের চাবুক নেমে আসে। রাস্তা পরিষ্কার, ঘোড়া লাফাতে-লাফাতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উত্তেজনায় গোল্ডের গলা কাঁপতে থাকে। আমি নীরবে শুনে যাই। জীবনের নির্মম রথচক্রে নিষ্পেষিত এই হতভাগ্যের ক্ষণিক স্বপ্নপরিক্রমায় বাধা দিতে করুণা হয়।

আর একদিন টেম্পল চেম্বারের সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। গোল্ড কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করছেন। কে নাকি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়েছে। তিনি বলছেন, "কোনো ম্যানার জানে না ইণ্ডিয়ানরা।" মিস্ ফিগিন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। বললেন, "বাবু প্লিস্ ডোণ্ট মাইণ্ড। একটা সিকি দাও, মিস্টার গোল্ডকে রিক্‌শায় চড়িয়ে নিয়ে যাই। একে দিনকাল খারাপ, এখনই না মারধর খায়।"

আমি একটা রিক্‌শা ডেকে দিলাম। গোল্ড তখনও রাগে ফুলছেন। গলা ফাটিয়ে চিৎকারের চেষ্টা করছেন। কিন্তু অবাধ্য দেহটা মনের আদেশ পালন করতে পারছে না। মিস্ ফিগিনের

হাতটা জোরে সরিয়ে দিলেন তিনি। "বুড়ী ফিরিঙ্গী জ্বালাতন করিস না।"

মিস্ ফিগিন রাগে হিন্দীতে বাক্যবর্ষণ আরম্ভ করলেন। "তা বলবে না মিন্সে! রোজকার রিক্‌শাভাড়া কিভাবে জোটাই জানো না তো।" গোল্ডকে কোনোরকমে রিক্‌শাতে বসিয়ে রেশনের থলি নিয়ে তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। রিক্‌শাওয়ালা দু'বার ঘন্টি ঠুকে চলতে আরম্ভ করলো।

হাইকোর্টে জেমস্ গোল্ড হেরে গেলেন। সুপ্রীম কোর্টে শেষ চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সায়েব প্রায় হতচৈতন্য গোল্ডকে সান্ত্বনা দিলেন।

"সত্যি চেষ্টা করবেন বলুন, না হলে এখান থেকে আমি যাবো না।"

"যখন কথা দিয়েছি, নিশ্চয় করবো।" সায়েব বললেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে পার্ক স্ট্রীটের পুরনো সমাধিক্ষেত্রে আমাকে একবার যেতে হয়েছিল। সাহিত্যচর্চার রোগ তখন সবেমাত্র ধরতে আরম্ভ করেছে। স্যার উইলিয়ম জোন্সের উপর একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধের সর্বশেষ উপকরণ সংগ্রহের জন্য ওখানে যাওয়া।

সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছে। সমাধিক্ষেত্রে ঢুকেই মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। ছোটো-বড়ো অসংখ্য স্তম্ভ নীরবে শতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এখানে অনেকে ঘুমিয়ে আছেন। কেউ প্রবলপ্রতাপ শাসক, কেউ নৌবহরের সেনাপতি, কেউ বা সামান্য ব্যবসায়ী। কাছে গিয়ে অনেকগুলি স্তম্ভ স্পর্শ করলাম। আজ কোনো ভয় নেই, গোরা সৈন্যরা তাদের প্রভুকে রক্ষার জন্য তেড়ে আসবে না। সেনাপতিকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কেউ নেই—নিজের বুকের উপর ফলকটি একমাত্র ভরসা।

স্যার উইলিয়ম জোন্সের সমাধিপার্শ্বে দাঁড়ালাম। তে-কোণা বিরাট সৌধ, আকৃতিতে অনেকটা পিরামিডের মতো। বহু-শাস্ত্রজ্ঞ স্যার উইলিয়ম, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

সেই কবরখানার মধ্যে আমার থেকে একটু দূরেই গোল্ডকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এখানে বুড়ো কী করতে এসেছে? কয়েকটা সমাধি পেরিয়ে তারদিকে এগিয়ে যেতেই, বুড়ো আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে কেন? কেন তুমি এখানে এসেছো?"

বুড়োর অসৌজন্যে আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। বেশ রেগেই উত্তর দিলাম, "তার কৈফিয়ত আপনাকে দেবার ইচ্ছা আমার নেই।"

লোকটার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছিলো। সমাধিক্ষেত্রে আমার কাজ শেষ হয়েছে। গোল্ডকে পিছনে ফেলে রেখে আমি চলে আসছিলাম। গোল্ড তখন আমাকে ডাকছেন, "বাবু, বাবু, একবার শুনে যাও।" সে-আহ্বানে কান না দিয়ে আমি চলে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি নিজেই আমার কাছে ছুটে এলেন। "বাবু, কিছু মনে করো না। আমারই দোষ হয়েছে। তুমি এখানে এসে ভালোই করেছো। এসো সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

"কার সঙ্গে পরিচয় করাবে? এখানে তো অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

গোল্ড হাসলেন, "এসো, তাঁরা শুয়ে আছেন।"

ঝোপঝাড় ভেঙে আমরা প্রধান গেটের কাছে এলাম। রাস্তা পেরিয়ে অন্য এক সমাধিক্ষেত্রে আঙুল দিয়ে গোল্ড একটা সৌধ দেখিয়ে দিলেন। অনেক পুরনো, অযত্নে মলিন হয়ে রয়েছে। বড়ো ফলকটা অনেক কষ্টে পড়লাম—

Here lies in Perfect Peace
William Robert Gold,
One of the most devoted
and gallant officers
of the Hon'ble Company

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী, নির্ভীক যোদ্ধা, স্ত্রীপুত্রের প্রতি পরম স্নেহশীল উইলিয়ম রবার্ট গোল্ড এক শতাব্দীর নিদ্রা সমাপ্ত করে আর এক শতাব্দীর নিদ্রায় মগ্ন। ১৭৩০ সালে উলভারহ্যামটনে জন্ম, বিশ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আগমন।

পাশে আর একটি ফলক। এলিজাবেথ গোল্ড। 'মর্তজগতে

উইলিয়মের শয্যাসঙ্গিনী, পতিগতপ্রাণা, স্নেহশীলা জননী এলিজাবেথ স্বামী অপেক্ষা দশ বৎসরের কনিষ্ঠা। কিন্তু পরম করুণাময় জগৎপিতা উইলিয়মের পূর্বেই তাঁকে ডেকে পাঠালেন।'

ইশারায় গোল্ড আরও কয়েকটি ফলক দেখালেন—ডগলাস, ডেভিড ও চার্লস।

উলভারহ্যামটনের গোল্ডদের বংশধারা সে-যুগের কলকাতার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও মহামারীর মধ্যেও অব্যাহত গতিতে চলেছে, বুঝতে পারলাম। সে-ধারা এক শতাব্দী অতিক্রম করে আর এক শতাব্দীতে পড়েছে। গম্বুজওয়ালা সমাধিটিতে আরও অনেকে রয়েছেন। নেপিয়ার গোল্ড, সিনথিয়া গোল্ড, রিচার্ড গোল্ড, রেভিনিউ বোর্ডের অন্যতম সদস্য হ্যারল্ড গোল্ড, হার ম্যাজেস্টির সৈন্যবাহিনীর সুযোগ্য কর্নেল স্টুয়ার্ট গোল্ড।

· অবাক হয়ে একটি পরিবারের শতাব্দীর ইতিহাস লক্ষ্য করছিলাম। গোল্ডের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বললেন, "খুব আস্তে, ওঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে!"

সমাধি থেকে তিনি কিছুটা দূরে সরে গেলেন। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, যেন তাঁর পিতৃপুরুষরা কথাগুলো শুনে না ফেলে। তারপর বললেন, "গোল্ডদের সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন কী জানো? তারা একসঙ্গে ঘুমিয়ে থাকবে। জীবদ্দশায় এলাহাবাদ, মাদ্রাজ আর আফ্রিদী সীমান্ত যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যুর পর তারা পার্ক স্ট্রীটের এই কোণে আসতে চায়।"

প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ যেন এখানকার আকাশে বাতাসেও ছড়িয়ে রয়েছে।

"গোল্ডদের সবচেয়ে প্রিয় আকাঙ্ক্ষা যেন এই সমাধিতে শেষ আশ্রয় মেলে।" আধো-অন্ধকারে তাঁর স্বরে এক অনির্বচনীয় বেদনার সুর ধরা দিচ্ছিলো। "কিন্তু সে হবার নয়। আমার উইলটা তোমাদের কাছে রয়েছে; তাতে লিখে দিয়েছি কলকাতা থেকে অনেক দূরে আমাকে যেন মাটি দেওয়া হয়।"

"কেন? উলভারহ্যামটনের গোল্ডদের শেষ বংশধর জীবনের দিবাবসানে পিতৃপুরুষদের পাশে কেন **স্থান** পাবেন না?"

রেগে উঠলেন তিনি। চাপা গলায় বললেন, "সে বুঝবার ক্ষমতা ভগবান নেটিভদের দেননি।"

সন্দিগ্ধভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন। "আমার জন্য তোমার এতো দরদ কেন? ভেবেছো মিষ্টি কথায় ভুলে যাবো। কিন্তু হাজার হোক রাজার জাত আমরা। তোমাদের উদ্দেশ্য সব বুঝতে পারি। আমার বংশে কলঙ্ক লেপন না করলে তোমাদের সুখ হবে না। কিন্তু কিছুতেই নয়। কী লিখবে আমার স্মৃতি-ফলকে? স্যালভেশন হোমের জেমস্ গোল্ড এখানে শুয়ে আছে। খুব মজা হবে, না? কিছুতেই নয়। আমি কিছুতেই তা হতে দেবো না।"

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে তিনি আরও ভিতরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। অন্ধকারে সাপ কিংবা পোকামাকড় থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই। গতিক সুবিধে নয়। আমি সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এলাম।

সুপ্রীম কোর্টে মামলা করা হয়নি শেষ পর্যন্ত। কাগজপত্র তৈরি হবার আগেই গোল্ডের মৃত্যু সংবাদ চোখের জল মুছতে মুছতে মিস্ ফিগিন একদিন চেম্বারে পেঁৗছে দিয়েছিলেন।

চলার পথে অনেক কিছুই তো পথিকের চোখে পড়ে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কত অসংখ্য বৃক্ষ, অগণিত গৃহ, মানুষ, পশু, পক্ষী সে দেখে। কিন্তু যাত্রাশেষে প্রতিজনকে মনে থাকে না। মনের পটে বহু প্রতিফলনে মাত্র একটি ছবির সৃষ্টি হয়। কবি বলেছেন, 'মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুল কেবা মনে রাখে'। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে অনেক শীত ও বসন্ত, অনেক বেদনা ও আনন্দ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আনন্দের উপর হয়তো কখনো বেদনার পলিমাটি পড়েছে, আবার কখনও বেদনার উপর আনন্দের প্রলেপে নতুন স্তর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজকে যখন সে-সব কথা আবার ভাবতে বসি, তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করতে পারি না। ভাঁজে-ভাঁজে যারা পৃথক ছিল, সময়ের পেষণে তারা এক হয়ে গিয়েছে।

অনেক লোককে দেখেছিলাম, অনেক গল্প শুনেছিলাম, সব মনে নেই। কিন্তু ভাবতে-ভাবতে সেদিন রবীন্দ্র কলিতার কাহিনীটা মনে পড়ে গেল।

টেম্পল চেম্বারে সায়েবের ঘরে একটি র‍্যাকে অসংখ্য কাগজ জমা হয়ে ছিল। অনেক পুরনো ব্রীফের বাণ্ডিল সেখানে সাজানো থাকতো। উপরের ধুলো থেকে সহজেই বলা যায়, বহুদিন সেখানে কারুর হাত পড়েনি। মামলা শেষ হয়ে গেলে কাগজপত্রগুলো লাল ফিতে দিয়ে বেঁধে আমিও সেখানে রেখে দিতাম। আইনপাড়ায় একটি কাগজও কেউ নষ্ট করে না। সব যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়, কখন কাজে লেগে যাবে কেউ জানে না।

এই কাগজের পাহাড় থেকে স্থানচ্যুত হয়ে একটা ছেঁড়া পাতা কেমন করে মেঝেতে এসে পড়েছিল লক্ষ্য করিনি। মোহনচাঁদ সেটি আমার টেবিলে তুলে দিয়ে বললে, "বাবু আপনার কাগজ পড়ে গিয়েছে।"

ধুলো ঝেড়ে নিছক কৌতূহল-বশেই ময়লা কাগজটাতে চোখ বোলাতে লাগলাম। কোনো এক রবীন্দ্র কলিতার বাবা মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের কাছে সন্তানের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। প্রথম পাতা থেকে আর কিছু বোঝা গেল না। রবীন্দ্র কলিতা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহটা বোধহয় সেই কারণেই আরও বেড়ে গেল। সায়েবের ব্যাগের ভিতরে কাগজটা রেখে দিলাম, সময় মতো তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে।

সুযোগও এসে গেল। সেদিন রবিবার। সমস্ত দুপুর ও বিকেল কাজ করে আমরা চায়ের টেবিলে বসেছিলাম। সুযোগ বুঝে ব্যাগ থেকে ছেঁড়া কাগজটা বার করে সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলাম।

সায়েব হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি প্রাচীন পুঁথিপত্র নিয়ে গবেষণা করছো নাকি?"

কাগজটা কিভাবে কুড়িয়ে পেয়েছি তাঁকে খুলে বললাম। কয়েক মিনিট ধরে ছেঁড়া পাতাটা তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তারপর চায়ের কাপটা নিজের দিকে একটু টেনে নিয়ে বললেন, "রবীন্দ্রকে কিন্তু বেশ মনে আছে।"

আমি বললাম, "বলুন না শুনি।"

ম্লান হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "সে-গল্প অন্যদিন শুনলে ভালো হয়। শুধু-শুধু আজকের চায়ের আসরটাকে নিরানন্দ করে তুলতে চাই না।"

আমার কৌতূহল তখন জেঁকে বসেছে। বললাম, "পুরনো দিনের কথায় তো দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমি এখনই শুনতে প্রস্তুত আছি?"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সায়েব বাইরে খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। বিকেলের পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়াগুলো ক্রমশঃ আরও শীর্ণ ও দীর্ঘ হচ্ছে। দু'জন মালী ঘাসকাটা কল দিয়ে একমনে ঘাস কাটছে। আর ঘরের ভিতর আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে রয়েছি। সায়েব বলতে লাগলেন—

ক্রিমিন্যাল কেস্ করতে একবার চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। দিন সাতেক থাকার দরকার। দায়রা জজের আদালতে কেস্। একদিন সন্ধ্যায় ওখানকার স্থানীয় এক উকিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাথার চুল প্রায় সমস্ত সাদা হয়ে এসেছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখগুলো কোটরের মধ্যে ঢুকে রয়েছে।

ভদ্রলোক নিজে ভালো ইংরেজী জানেন না। ছোকরা উকিলটি বললেন, "নিরুপায় হয়েই খগেনবাবু আপনার কাছে এসেছেন। ওঁর বড়োছেলেটিকে আপনিই একমাত্র বাঁচাতে পারেন।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছলছল চোখে এগিয়ে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

"রাজনৈতিক অপরাধের মামলা", উকিলবাবু বললেন।

খগেনবাবুর বড়োছেলে রবীন্দ্র কলিতা। নামটা অসমীয়া মনে হলেও ওঁরা আসলে বাঙালী, চট্টগ্রামের অধিবাসী।

সাব-পোস্টমাস্টার খগেনবাবু একবছর হলো অবসর নিয়েছেন। পেনশনের সামান্য টাকায় সংসার চলে না। যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা মেয়ের বিয়েতে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রের আশায় দিন কাটছে। ছেলে বড়ো হয়ে রোজগার করবে। ইস্কুল ছেড়ে সে কলেজে ঢুকেছে। পড়াশোনায় সে বেশ ভালো। বাপমায়ের দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্র সংসারের মুখোজ্জ্বল করবে।

একদা গভীর রাতে ডাকাডাকিতে খগেনবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দেখলেন, লাল পাগড়িতে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। রাগতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি সরকারের পেনশন হোল্ডার, আমার বাড়িতে রাত্রে হামলা কেন?"

পুলিশ অফিসারটি বললেন, "আপনার ছেলে রবীন্দ্র কলিতাকে চাই।"

খগেনবাবু অবাক! "আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। আমার ছেলে নিতান্ত বালক। ইস্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছে?"

"আজ্ঞে ভুল আমাদের সহজে হয় না।" পুলিশ অফিসারটি বিছানা থেকে ঘুমন্ত রবীন্দ্রকে তুলে নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন।

পরেরদিন খগেনবাবু থানায় গেলেন। স্বদেশী কাজে সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য পুলিশ বহু ছেলেকে হাজতে এনেছে, রবীন্দ্র তাদেরই একজন। অনুসন্ধান শেষ হতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে জামিনও চলবে না। সপ্তাহখানেক থানায় যাতায়াত করে ছেলের সঙ্গে তাঁর মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। কোর্টে কেস্ ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন খগেনবাবু।

কিন্তু একদিন ভোরে আবার কড়া নাড়ার শব্দে তিনি দরজা খুললেন। দুই লরী বোঝাই পুলিশ সমেত দারোগা এসেছেন। সঙ্গে তল্লাসী-পরোয়ানা। তারা সমস্ত বাড়ি তছনছ করে যেখানে যা পেলো খুলে দেখলো, কিছু বই ও কাগজ সঙ্গে নিয়ে গেল। পুলিশ অফিসারটি যাবার আগে বললেন, "গতকাল সন্ধ্যায় আপনার ছেলে হাজতের মধ্যে একজন দারোগাকে খুন করেছে।"

উকিলটি বললেন, আপনি এখন যে মামলা করছেন, ঠিক তারপরেই ওই কোর্টে রবীন্দ্রের কেস্ উঠবে।"

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে আমি না বলতে পারলাম না। ঠিক করলাম ওই কেস্টা করেই কলকাতায় ফিরবো।

পরেরদিন রবীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য থানায় গেলাম। ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিশকে আগেই খবর দিয়ে দেখা করার অনুমতি নিয়ে রেখেছিলাম। বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘরের ভিতর আমি রবীন্দ্র কলিতার জন্য অপেক্ষা করছি। একটু-

পরেই সে এল। নিতান্ত বালক, গোঁপের রেখা পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। দীর্ঘ সুঠাম দেহ, বড়ো-বড়ো তুটি উজ্জ্বল চোখ। চুলগুলো ঢেউ-খেলানো।

আমি বললাম, "রবীন্দ্র, তোমার কেস্‌টা আমি করবো ঠিক করেছি।"

সে কিন্তু গম্ভীরভাবে বললে, "আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমি জানি, যা করেছি তা ঠিকই করেছি এবং ফলাফল জেনেই করেছি।"

"তুমি নিজেই খুন করেছো, রবীন্দ্র?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেটকে তো বলেছি, আমিই খুন করেছি।"

আঠারো বছরের ছেলের মুখে এমন নির্ভীক উত্তর শুনে আমার নরেন মণ্ডলের কথা মনে পড়ছিল।

"রবীন্দ্র, অবুঝ হতে নেই। আমি আবার আসবো! ইতিমধ্যে মনস্থির করা চাই।" এই বলে আমি সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

পরেরদিন কোর্ট থেকে সোজা থানায় গেলাম। রবীন্দ্র আবার এসে দাঁড়ালো। প্রথমে আমরা সাহিত্য, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলাম। রবীন্দ্র বেশ কথা বলছিল। বিদায় নেবার কিছু আগে আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। "রবীন্দ্র, তোমার মামলা দিন কয়েকের মধ্যেই কোর্টে উঠবে।"

সে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। "আমি নিজেই খুন করেছি। রাগের মাথায় খুন করিনি, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেই শয়তানটাকে শাস্তি দিয়েছি।"

রবীন্দ্রকে বোঝালাম, "এখন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। আমাকে কেস্‌টা তৈরি করার সুযোগ দাও।" কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়েই সে ভিতরে চলে গেল।

তার বাবা সে-কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "আপনাকে কিছু করতেই হবে। ওর মাথায় নিশ্চয় ভূত চেপেছে, নইলে প্রাণের মায়া করে না!"

পরেরদিন আবার গেলাম রবীন্দ্রকে দেখতে। সঙ্গে চকোলেট ও বিস্কুট নিয়ে গিয়েছিলাম। তু'জনে ভাগাভাগি করে সেগুলো খেতে লাগলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "টেগোরের কিছু পড়েছেন?"

আমি বললাম, "তাঁর যে-সব বই ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে প্রায় সমস্ত পড়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। জোড়াসাঁকোতে টেগোরের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি।"

রবীন্দ্র খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনে বললে, "আমাদের দু'জনের একই নাম, যদিও আমি কবি নই।"

আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু আজ সময় নষ্ট করলে চলবে না। তার হাত চেপে ধরে বললাম, "কেঁদে-কেঁদে তোমার বাবা ও মায়ের কী অবস্থা হয়েছে জানো না। তাদের মুখ চেয়েই আমি রোজ এখানে আসছি।"

রবীন্দ্র আবার গম্ভীর হয়ে উঠলো। কোথায় মিলিয়ে গেল তার মুখের হাসি। আর একটা চকোলেট এগিয়ে দিলাম তার দিকে, সে নিলে না।

আমি বললাম, "রবীন্দ্র, অন্তত আসল ঘটনাটা আমাকে বুঝিয়ে বলো।"

এবার সে আপত্তি করলে না। "ওই শয়তান দারোগাটাকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম। লোকটা মানুষ নয়, পশু। ওর ধারণা ছিল রুলের গুঁতো ও আঙুলে পিন ফুটিয়ে যে কোনো স্বদেশীওয়ালাকে ঘায়েল করা যায়। অনেকদিন ধরে বিভিন্ন থানায় বুটের ধাক্কায় লোককে জ্বালিয়ে এসেছে। অন্য কোনো প্রমাণ না পেয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করবার আশায় আমাদের উপর তার সবরকম ওষুধ ব্যবহার চলেছিল। ভাতে কাঁকর বোঝাই করে দিচ্ছিলো পশুটা। বুট দিয়ে লোকটা আমাদের পা মাড়িয়ে দিতো। টান দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে আনতো। আমার অন্য বন্ধুরা ইতস্তত করছিল, কিন্তু আমি নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। লুকিয়ে একটা থানইট যোগাড় করে রেখেছিলাম। শয়তানটার সাহস এমন বেড়েছিল যে, একাই রুলকাঠ নিয়ে আমার সেলে ঢুকে পরলো একদিন। আমিও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। থানইটের এক ঘায়ে মাথাটা থেঁতলে গেল।" রবীন্দ্র পায়চারি করতে করতে বললো, "কিন্তু আমি মোটেই দুঃখিত নই।"

যে-কেসে চট্টগ্রামে এসেছিলাম, সেটা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই জেলা-জজের কোর্টে রবীন্দ্রের মামলা আরম্ভ হলো। ক্ষণিক

উত্তেজনাবশে হত্যা বলে প্রমাণ করার ইচ্ছা ছিল আমার। আইনের চোখে কাল্পেব্‌ল হোমিসাইড ও মার্ডারের পার্থক্য অনেক। পূর্বাহ্নে চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার নাম মার্ডার। আর ক্ষণিক উত্তেজনার প্ররোচনায় আঘাতজনিত হত্যার নাম কাল্পেব্‌ল হোমিসাইড নট এমাউন্টিং টু মার্ডার। এরজন্য অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তি হয়ে থাকে। যদি প্রমাণ করতে পারি, মৃত দারোগাটির অমানুষিক দুর্ব্যবহারে রবীন্দ্রের বয়সী কোনো যুবকের পক্ষে শান্ত থাকা সম্ভব নয়; ধৈর্যের শেষ বাঁধও একদিন ভেঙে পড়লো এবং উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে সে দারোগাকে আঘাত করে, তবে আট দশ বছরের বেশি জেল হবে না।

কিন্তু কিছুই সম্ভব হলো না। কোর্টে সর্বসমক্ষে রবীন্দ্র বললে যে, তার কৃতকর্মের জন্য সে মোটেই দুঃখিত নয়। বরং, অন্যায়ের প্রত্যুত্তর দিতে পারার জন্য সে তৃপ্ত। সবাই চমকে উঠে তারদিকে তাকিয়ে রইলো। জজও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আমি হতাশ হয়ে চুপচাপ এক কোণে বসে রইলাম, কিছু করার নেই। রবীন্দ্রের বাবা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমার জুনিয়র তাঁকে কোর্টের বাইরে নিয়ে গেলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মামলা শেষ। বিচারাধীন থাকাকালে রাজকর্মচারীকে হত্যার অপরাধে রবীন্দ্র কলিতার মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিয়ে জজ জানতে চাইলেন, সে কিছু বলতে চায় কিনা। রবীন্দ্র বললে, "হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে।"

কোর্টভর্তি লোক তারদিকে তাকিয়ে রইলো। আদেশপত্রে সইয়ের জন্য কলমটা দোয়াতে ডুবিয়ে জজ-সায়েবও আসামীর মুখের দিকে তাকালেন। আসামীর কাঠগড়া থেকে সে বললে, "দারোগা বিপদভঞ্জন দত্তকে খুন করে আমি মোটেই দুঃখিত নই। বরং আনন্দিত।" আঠারো বছরের রবীন্দ্র কলিতার মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রামের কাজ তো শেষ হলো। বিদায় নেবার আগে রবীন্দ্রকে শেষবারের মতো দেখতে গেলাম। বেলা তখন প্রায় পাঁচটা। একবার ভাবলাম, চলে যাই, দেখা করে লাভ নেই। যা হবার তো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রকে না দেখে উঠতে

পারলাম না। ভিতরে তালা খোলার আওয়াজে বুঝলাম পুলিশ তাকে নিয়ে আসছে। ভাবতে লাগলাম, প্রথমে কী বলবো। কিন্তু তার একটুও পরিবর্তন হয়নি। তেমনি হাসিতে ভরা মুখ। তবুও আমার চোখ তুলতে সাহস হচ্ছিলো না। মাথা নিচু করে ঢোক গিলে বলতে গেলাম, "রবীন্দ্র, আমি সত্যি—"

আমাকে বাধা দিয়ে, চোঁখ দুটো বড়ো করে সে বললে, "চকোলেট এনেছেন তো ?"

কোটের পকেট থেকে চকোলেটের ঠোঙাটা এগিয়ে দিলাম। ছোট্ট ছেলের মতো একসঙ্গে দুটো চকোলেট সে মুখে পুরে দিলে।

ফুটবল খেলা দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হলো। নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও রবীন্দ্র তুলতে দিলে না—মন্ত্রবলে সে যেন ওই প্রসঙ্গ একেবারে ভুলে গিয়েছে।

"ত্রিশবছরে ভারতবর্ষে কত লোক দেখলাম। কিন্তু রবীন্দ্রকে আজও ভুলতে পারলাম না। আঠারো বছরের ছেলে, অথচ জীবনের সব আকর্ষণকে যেন জয় করে ফেলেছে"—সায়েব আস্তে আস্তে বলে যাচ্ছেন। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "আলোটা জ্বালিয়ে দেবো ?" তিনি বারণ করলেন, "সব সময় আলো ভালো লাগে না। এই তো বেশ আছি।"

"তারপর ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"তারপর আমরা অনেক আলোচনা করলাম।"

রবীন্দ্র আরও বললে, "বাবার অজান্তে বছরখানেক ধরেই সে সন্ত্রাসবাদী দলে কাজ করছিল। বহুদিন গোপনে ইস্কুল পালিয়ে সে ক্লাবে গিয়েছে। বাড়িতে বলেনি।"

আমি বললাম, "তোমার বৃদ্ধ বাবা-মা'র কথাও ভেবে দেখা উচিত ছিল।"

সে ম্লান হাসলো। "আমার পরেও তো একটা ভাই রয়েছে, এবারে ম্যাট্রিক দেবে।" সে থামলো। "আপনারা কলকাতায় থাকেন, যদি দয়া করে ওর কিছু একটা করে দেন তাহলে অনেক উপকার হয়। অনর্থক আমার জন্য এখানে কয়েকটা দিন নষ্ট করে গেলেন।"

রবীন্দ্র ও আমি সামনাসামনি বসে কথা বলছিলাম। কিন্তু

দু'জনের মধ্যে লোহার রেলিঙের দুস্তর ব্যবধান। দুটো রেলিঙের মধ্য দিয়ে আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। জনৈক পুলিশ অফিসার একটু আগে ঘলে গিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের পর আরও পনেরো মিনিট কেটে গিয়েছে। রবীন্দ্র ঝাঁকুনি দিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলে।

কলকাতায় ফেরার কয়েকদিন পরেই অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় রবীন্দ্রের বাবা চেম্বারে হাজির হলেন। হাতে একটা চামড়ার সুটকেস। স্টেশন থেকে সোজা চেম্বারে চলে এসেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "খবর না দিয়ে হঠাৎ কলকাতায় এলেন, কী ব্যাপার ?"

খগেনবাবু কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'বাড়িতে টিকতে পারলাম না, অসম্ভব।' মিনিটখানেক ফ্যালফ্যাল করে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না, কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 'রবির-মা প্রায়ই ফিট হচ্ছেন। ছেলেটাকে কোনোরকমে প্রাণে রক্ষা করা যায় না ? না হয় সারাজীবন জেলেই রাখুক।' কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে-মুছতে তিনি চামড়ার সুটকেসটা টেবিলের উপর তুললেন। পকেট থেকে চাবি বার করে ডালা খুলে এককোণ থেকে জামা-কাপড় সরিয়ে তিনি একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করলেন। অতি যত্নে কম্পিত হাতে বাঁধন খুলতেই কয়েকগাছা সোনার চুড়ি বেরিয়ে পড়লো। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর মায়ের শেষ সম্বল। এইগুলো আমাকে দিয়ে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে কিছু করতেই হবে।'

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। কী করতে পারি ?

'আপনারা বড়ো ব্যারিস্টার, ইচ্ছে করলেই ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেন।" রবীন্দ্রের বাবা আবার কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন।

হাইকোর্টে আপীল ফাইল করা হলো। খগেনবাবু কিছুদিনের জন্য কলকাতায় রয়ে গেলেন।

জেল থেকে রবীন্দ্রের চিঠিও পেয়েছি। সেন্সর করা চিঠি

রবীন্দ্র লিখেছে, সে ভালোই আছে। এখন আর চালে কাঁকর নেই, বিছানায় ছারপোকা নেই। একেবারে জামাই-আদর। সে আরও লিখেছে, ভগবান তাকে বিশ্বাস ও বল দিয়েছেন, কোনো কিছুতেই সে ভয় পায় না।

বাংলায় ঠিকানা লেখা আর একটা চিঠি পেলাম। সুধাংশু কর, এডভোকেট, আমার সঙ্গে তখন বসতো। সে আমাকে ইংরেজী করে শোনালো।

—সায়েব

বড়ো ব্যারিস্টার,

কলকাতা হাইকোর্ট।

আঁকাবাঁকা অক্ষরে রবীন্দ্রের মা লিখেছেন, জজদের যেন আমি তাঁর হয়ে বলি, ছোটোছেলে বুঝতে পারেনি। ভগবানের কাছে আমার মঙ্গলের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করছেন।

প্রার্থনা করেও কিছু হলো না। আপীলে আইনের যুক্তি বিশেষ কিছু দেখাতে পারলাম না। তবুও ঘণ্টাখানেক আর্গুমেণ্ট করেছিলাম। দু'জন জজ মন দিয়ে আমার বক্তব্য শুনলেন। সরকার পক্ষের উকিলও তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন। জজরা রায় দিলেন, এই কেসে লঘুতর শাস্তি দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

"এখন উপায় ?" রবীন্দ্রের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

হঠাৎ অন্ধকারকে বিদায় করে ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। সায়েব ঘাড় ফেরালেন। দেওয়ান সিং কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসেই আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

"দেওয়ান, আলোটা নিভিয়ে দাও, আজ আর কাজ করবো না। অন্ধকারে বেশ আছি।" সায়েবের কথায় দেওয়ান আলো নিভিয়ে দিলে। ক্ষণিকের আলোয় বিরক্ত হয়ে রাত্রি যেন আরও খানিকটা অন্ধকার মুখ থেকে ফুঁ দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে।

"সরি ফর দিস ইণ্টারপশন।" সায়েব আবার আরম্ভ করলেন।

"শেষপর্যন্ত বড়লাটের কাছেই আবেদন করে দেখবো ভাবলাম। ডিসেম্বর মাস, বড়লাট ওই সময়ে প্রতিবছর কলকাতায় আসেন।

খগেনবাবুর হয়ে দীর্ঘ আবেদন লিখলাম। তিনি তাতে সই করলেন। যে পাতাটা আজ আমাকে দেখালে ওটা তারই কপি।

বেলভেডিয়রে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনাটা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। আসামীর অতি অল্প বয়স, প্রায় বালক। প্রাণদণ্ড মকুব করে অন্য যে কোনো শাস্তি দিন। মন দিয়ে আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'আচ্ছা ভেবে দেখি। রাইটার্স বিল্ডিং ও গভর্নরের উপদেশ না নিয়ে আমার পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব নয়।' ”

বললাম, “নিশ্চয়। তবে আসামীর বৃদ্ধ পিতার একমাত্র অনুরোধ ছেলেটির প্রাণরক্ষা করতেই হবে।”

কয়েকদিন পরে আবার খোঁজ নিলাম। সরকার এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

খগেন্দ্র কলিতা রোজ এসে চেম্বারে বসে থাকেন, কখন উত্তর আসে ঠিক নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বাড়িতে খবর পাঠাচ্ছেন তো?”

তিনি ঘাড় নাড়লেন, “রোজ একটা করে চিঠি ছাড়ি।”

টেম্পল চেম্বারে খগেন্দ্র কলিতার নামে শেষপর্যন্ত সেই বহু-প্রতিক্ষীত চিঠিটা এল। অন হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিস মার্কা খামে আষ্টেপৃষ্ঠে লাল শীলমোহর। খগেনবাবু তখনও চেম্বারে আসেননি। ওঁরই নামে চিঠি বলে নিজেও খুলতে পারলাম না। অস্থিরভাবে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করছি, কখন তিনি আসবেন। অন্যদিন দশটার মধ্যেই খোঁজ নিতে আসেন, অথচ সাড়ে দশটা হয়ে গেল আজ।

ভাবতে-ভাবতেই তিনি এসে গেলেন। মোটা খামটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। হাত পা কাঁপছে তাঁর। প্রথম চেষ্টায় খামটা ছিঁড়তেই পারলেন না, শরীরের সকল শক্তি যেন উবে গিয়েছে। দ্বিতীয় চেষ্টায় চিঠিটা খাম থেকে বার হলো। তাঁর কোটরে ঢোকা স্তিমিত চোখ দুটো উত্তেজনায় যেন বেরিয়ে আসছে। কী লিখেছে?

ব্যর্থ। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বড়লাট এই কেসে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক।

খগেনবাবু চিঠিটা পড়লেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে

বারবার পড়লেন। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ঝাপসা চোখে বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি কথা বলতে পারলাম না। তিনি বেরিয়ে গেলেন। এগারোটার সময় কোর্টে কেস্ ছিল, আমাকেও বেরিয়ে যেতে হলো।

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্র কলিতার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হয়, খবর পেয়েছিলাম।

ফাঁসির আগে সে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল—মরতে সে একটুও ভয় পাবে না। সম্ভব হলে আমি যেন মাঝে-মাঝে তার বাবা-মা'র খবর নিই। আর ছোটোভাইটার জন্য যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি তো খুব ভালো হয়।

সায়েব চুপ করলেন। ছেঁড়া কাগজটা টেবিলে পড়ে রয়েছে।

সায়েবকে আমি জানি। রবীন্দ্রের শেষ অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি নিশ্চয় কিছু করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "রবীন্দ্রের ভাই-এর কী হলো?"

অন্ধকারে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঘাড়টা বেঁকিয়ে নিরাসক্তভাবে তিনি বললেন, "ওদের সংসারই অভিশপ্ত, আমি কী করবো? কলকাতায় নিয়ে এসে তাঁকে বহু কষ্টে মানুষ করলাম। ভাবলাম বাবা ও মায়ের দুর্গতি বুঝি এবার ঘুচলো। কিন্তু হলো না। প্রথমবারে ছিল রাজরোষ, আর দ্বিতীয়বারে রাজরোগ। যক্ষ্মায় মারা গেল।"

এবার আলো জ্বালিয়ে দিলাম। মনে হলো আধ-ছেঁড়া কাগজটা টেবিলে শুয়ে আমাদের দু'জনের দিকে যেন ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

॥ ৭ ॥

টেলিফোনটা বাজছিল অনেকক্ষণ ধরে, ওটা আমার টেবিলেই থাকে। ভিতরে সায়েবের কাছে নোট নিচ্ছিলাম। খাতা-পেন্সিল সেখানে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ফোনের রিসিভার

তুলে নিলাম। ওপাশ থেকে একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "সিটি ওয়ান-সেভেন-টু-ফোর ?" এপাশ থেকে জানিয়ে দিলাম তাঁর ভুল হয়নি। ওপাশ থেকে আবার বলা হলো, "আমি ডক্টর মিত্র কথা বলছি। আপনার সায়েবের সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে ?" ডক্টর মিত্রকে দেখা করার সময় জানিয়ে সেটা সায়েবের ডাইরীতে লিখে রাখলাম।

টেলিফোনে কথা শেষ করে কতবার এমনিভাবে ডাইরীতে দিনক্ষণ লিখে রেখেছি। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটের জীবনে, টেলিফোনের মাধ্যমে কত আলাপের সূত্রপাত হয়েছে। ফোনের অজানা অচেনা লোকটি হাজির হয়েছেন তাঁর সমস্যার বোঝা নিয়ে। সায়েব চেষ্টা করেছেন সাহায্য করার, আমি নেপথ্যে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত সব দেখে গিয়েছি। কেউ জিতেছে, কেউ বা হেরেছে। আশা সফল হয়নি, বিদায় নিয়েছে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীট থেকে। তাদের পায়ের চিহ্ন হয়তো ও-পাড়ায় আর কোনো দিনও পড়বে না। তাদের সকলকে মনে রাখতে পারিনি। অপরিচয় থেকে পরিচয় যেমন দ্রুত ও আকস্মিকভাবে হয়েছিল, বিস্মৃতি ততো দ্রুত না হলেও ধীরে-ধীরে কুয়াশার মতো নেমে এসেছে।

তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেও অনেকে আজও স্মৃতিপটে জ্বল-জ্বল করছেন। তাঁদের মুখগুলো অতি স্পষ্টভাবে এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চোখ, মুখ, কপালের প্রতিটি রেখা মনে পড়ে যায়। ডাইরী লিখিনি কোনোদিন, দৈনন্দিন ঘটনাগুলো রোজনামচার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখিনি। কিন্তু সেজন্য আফসোস করি না, হয়তো ভালোই হয়েছে। আমার অগোচরে মন যাকে ভালো বুঝেছে শুধু তাকেই সযত্নে সঞ্চয় করে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাছাই করার হাঙ্গামা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।

ডক্টর শেফালি মিত্র প্রথমদিন চেম্বারে কিভাবে এসেছিলেন, একটুও ভুলিনি। চোখে চশমা, মণিবন্ধে কালো সিল্কের ব্যাণ্ডে খুব ছোট্ট একটি ঘড়ি। বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম হলেও স্নিগ্ধ। অতি সাধারণ সরু কালোপেড়ে শাড়ি পরেছিলেন তিনি। দোহারা চেহারা। হাতে স্টেথসকোপ।

ডক্টর মিত্রের চিকিৎসা-জগতে সুনাম আছে। তাঁর চেম্বারে

মাসিমাকে নিয়ে আমি একবার গিয়েছিলাম। শাড়ির উপর সাদা অ্যাপ্রন পরে রোগী দেখছিলেন তিনি। টেম্পল চেম্বারে প্রথম দর্শনেই তাঁকে চিনতে পারলাম।

তাঁকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সায়েব বললেন, "বসুন ডক্টর মিত্র। উকিল ডাক্তারদের সম্বন্ধটা সাধারণতঃ এক তরফা হয়। আপনারা এ-দিকে আসুন আর নাই আসুন, আমি আপনাদের চেম্বারে যেতে প্রায়ই বাধ্য হই, রোগবিরোগ তো লেগেই আছে। আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ সেইজন্য খুবই সজাগ।"

ডক্টর মিত্র ম্লান হেসে টেবিলের উপরে স্টেথসকোপটা রাখলেন। "আচ্ছা, বলতে পারেন মেয়ে কার?"

শর্টহ্যাণ্ডের নোটবুক হাতে আমিও পাশে বসেছিলাম। প্রশ্ন শুনে ডক্টর মিত্রের মুখের দিকে তাকালাম। মেয়ে কার—আইনের প্রশ্ন? না, হেঁয়ালি? শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ে গেল—নারী প্রথম জীবনে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন!

সায়েব বললেন, "আপনার প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। আইনের চোখে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্রত্যেক মেয়েই স্বাধীন।"

ডক্টর মিত্র একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "আমি নিজেও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। অন্তরাত্মা জানেন, জাহানারা আমার। কিন্তু আইনে নাকি অন্যরকম লেখা আছে। সত্যি নাকি, আপনি ঠিক করে বই-টই দেখে বলুন। আপনি যা ফী বলবেন তাই দেবো, কিন্তু জাহানারাকে আমার চাই।"

বিলেত-ফেরত ডক্টর শেফালি মিত্রকে এমন ভাবাবেগে কথা বলতে দেখে আমি অবাক।

"কে এই জাহানারা?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আসল ঘটনা বর্ণনা না করেই প্রশ্নের উত্তর চাইছি।" নিজেকে সংযত করে নিলেন ডক্টর মিত্র। তিনি বেশ লজ্জা পেয়েছেন।

"জাহানারা আমার মেয়ে। তার পুরো নাম জাহানারা প্যাটেল।"

শেফালি মিত্রের মেয়ে জাহানারা প্যাটেল! বিস্মিত হলেও অত্যন্ত সহজভাবে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মেয়ে?"

শেফালি মিত্র গম্ভীরভাবে বললেন, "জাহানারা আমাকেই মা বলে জানে। আমি তাকে গর্ভে ধরিনি সত্য, কিন্তু নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করেছি।" তাঁর এলোমেলো কথায় সমস্ত ঘটনা আরও হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হলো।

সায়েবরও অনুরূপ অবস্থা। তিনি নিজেই বললেন, "আপনার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমার গোড়াতে শোনা প্রয়োজন। জাহানারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।"

ডক্টর মিত্র লজ্জিত হলেন। "ঠিক বলেছেন। ইতিহাসটা খাপছাড়াভাবে বর্ণনা করে লাভ নেই।"

"আজ থেকে অনেকবছর আগে আমি একজন ইহুদীকে বিয়ে করি। আমি তখন শেফালি মিত্র নই, শেফালি সলোমন। আমার স্বামীর কাঠের ব্যবসা ছিল। তাঁকে বেশ ধনী বলা চলতে পারে। কিন্তু ফ্যান, ফোন, বাড়ি, গাড়ি সব থেকেও আমাদের শান্তি ছিল না।

আমি নিজে ডাক্তার, তবে বিশেষ প্র্যাকটিস করতাম না। করার প্রয়োজন ছিল না এবং স্বামীও পছন্দ করতেন না যে, আমি দিনরাত ডাক্তারীতে মেতে থাকি।

কিন্তু অশান্তি সেজন্য নয়, কারণ অন্য। বছর কয়েকের মধ্যে আমার কোনো সন্তান হলো না। বড়ো-বড়ো কয়েকজন ডাক্তারকে দেখালাম। তাঁরা সকলে একমত—আমার সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

শেফালি মিত্র আস্তে-আস্তে, ভেবে-ভেবে কথা বলায় শর্টহ্যাণ্ডে অনায়াসে লিখে যাচ্ছিলাম।

"তারপর?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ। মিস্টার সলোমন বেশি বয়সে আবার বিয়ে করেছিলেন, আমি সংবাদ পেয়েছিলাম।

মিস্টার সলোমন ব্যবসাসূত্রে মাঝে-মাঝে রেঙ্গুনে যেতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সেখানে কয়েকবার গিয়েছি। জানাশোনা হয়ে

গিয়েছিল কিছু-কিছু। ওখানকার এক মেয়েদের হাসপাতালে চাকরি খালি ছিল। মাইনে কম হলেও কাজটা ছাড়লাম না। হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কিছু-কিছু প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে লাগলাম।

আউট-ডোরে কত রকমের লোক আসে—চীনা, বার্মিজ, ভারতীয়। কিছু-কিছু বাঙালীর সঙ্গেও দেখা হতো। মাতৃসদনটির সুনাম আছে রেঙ্গুনে।

ওখানেই সোফিয়া প্যাটেলের সঙ্গে প্রথম দেখা। রক্তহীন, ফ্যাকাশে, শীর্ণ দেহ। চোখের কোণে কোণে কালো রেখা। মুখের ম্লান হাসিটুকু ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষণ নেই।" ডক্টর শেফালি মিত্র হাতের স্টেথসকোপটা নাচাতে-নাচাতে বলতে লাগলেন, আর আমি লিখে চললাম দ্রুতবেগে।

সোফিয়া প্যাটেলের রোগ নির্ণয় করলেন শেফালি মিত্র—অ্যানিমিয়া। মেয়েটির বছর তেইশ বয়স। অস্থিসার দেহে বড়ো-বড়ো চোখ দুটি বেমানান মনে হয়। ডক্টর মিস্ শেফালি মিত্র কোন্ সময়ে সোফিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছেন। সপ্তাহে একদিন সে আউট-ডোরে আসে। ডক্টর মিত্র সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। অন্য রোগীদের ফেলে রেখে তাকে পরীক্ষা করেন, ওষুধ দেন। সুন্দর ইংরেজী বলে মেয়েটি। দু'জনে গল্প হয়। ডক্টর মিত্র ভুলে যান আরও রোগী বাইরে অপেক্ষা করছে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় দিতে হয়। সোফিয়াকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন তিনি।

নতুন রোগিণী ডাক্তারকে একদিন চা-এ নিমন্ত্রণ করলেন। ডাক্তার খুবই আনন্দের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে গল্প করে, শেষপর্যন্ত চা ছাড়াও, রাত্রের খাবার-পালা সাঙ্গ করে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

সোফিয়ার আউট-ডোরে যাওয়া বন্ধ হলো। রোগ যে সেরে গেল তা নয়, শেফালি মিত্র নিজেই রোগিণীর বাড়িতে আসেন। দু'জনে খুব ভাব। নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবনে সোফিয়ার মতো বন্ধু পেয়ে ডক্টর মিত্রের আনন্দের সীমা নেই।

কিন্তু রোগ প্রশমনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং বাড়ছে।

ডক্টর মিত্র কিন্তু পরাজিত হতে প্রস্তুত নন। বড়ো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তিনি চিকিৎসা চালাতে লাগলেন।

সোফিয়া মুসলমান। তাঁর স্বামীর সামান্য চাকরি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। স্বামীও বেশ মিশুক। ডাক্তারের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি প্রায়ই বলেন, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে সোফিয়ার যে কি হতো জানি না।"

যা হোক, সোফিয়া অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেন। শেফালি মিত্র এজন্য সকল কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। সম্পূর্ণ সেরে উঠে সোফিয়া একদিন নিজের হাতে রান্না করে ডাক্তারকে খাওয়ালেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তাঁরা তিনজন সামনাসামনি বসেছিলেন। শেফালি মিত্রের মনটা সামান্য খারাপ। সোফিয়া ভালো হয়ে গিয়েছেন, তাঁরও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু বেশ খুশি মনে সে-রাতে ডক্টর মিত্র বিদায় নিলেন। সোফিয়া তাঁর দুটি হাত ধরে বলেছেন, "রোগ ফুরোলেই যে নটে গাছটি মুড়োলো এমন যেন না হয়। তোমাকে আসতেই হবে। এখন আর ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক নয় কিন্তু! আমার জোর বেড়ে গিয়েছে। এখন সমান-সমান ক্ষমতা, আমরা দু'জনে বন্ধু।"

তাঁরা দু'জনে সত্যিই বন্ধু হয়ে উঠলেন। সোফিয়া সাধারণ ঘরের মেয়ে, উচ্চশিক্ষা পাননি। তবুও তিনি শেফালি মিত্রের শ্রেষ্ঠ বান্ধবী। সোফিয়ার বাড়িতে প্রায়ই আসেন ডক্টর মিত্র। হাসপাতালের বদ্ধ হাওয়ায় যখন মনটা হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সেখান থেকে পালিয়ে এসে সোফিয়ার সঙ্গে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে বেশ লাগে। সোফিয়ার রান্না ভালো। ডাক্তারী ছেড়ে শেফালি মাঝে-মাঝে রান্নাঘরে এপ্রেন্টিসগিরি করেন। তেল-নুন-লঙ্কার পরিমাণ নিয়ে তর্ক হয়।

দু'জনের মনের কথাও চাপা থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের কথা সোফিয়াকে খুলে বলেন শেফালি মিত্র। নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার বোঝা খানিকটা হাল্কা হয়ে যায়। রুগ্ন দেহ সোফিয়া ডক্টর শেফালি মিত্র অপেক্ষা মনে অনেক সুস্থ ও সবল। সোফিয়া তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয়। দেয় খানিকটা মানসিক সান্ত্বনা।

সোফিয়ার শরীর আবার খারাপ হচ্ছিলো! দেহে যে মাংস লেগেছিল, ক্রমশঃ তা শুকোতে লাগলো। মুখের রক্তাভা, চোখের দীপ্তিও কমছে। স্টেথসকোপটা কান থেকে খুলতে খুলতে শেফালি মিত্র রোগিণীর স্বামীকে একদিন বললেন, এবার আরও সাবধান হতে হবে। প্রেগনেন্সি।"

সোফিয়াকে মাস কয়েক ধরে শেফালি মিত্র যে যত্ন ও সেবা করলেন, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। সোফিয়ার স্বামী প্রায়ই বলতেন, "আপনার ঋণ কখনও শোধ করতে পারবো না। আল্লার দয়ায় আমার স্ত্রী আপনার মতো বন্ধু পেয়েছে।"

সোফিয়া বিছানায় শুয়ে থাকেন। তাঁকে দেখলেই হাতটা তুলে নাড়ান। ম্লান মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিছানার খুব কাছে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে শেফালি বসেন। গল্প হয় দু'জনে, কখনো বই পড়েন তিনি, আর সোফিয়া চুপ করে শোনেন।

ভাবী-মায়ের চেয়ে ডাক্তারের আগ্রহ উদ্দীপনা অনেক বেশি। সোফিয়াকে কতরকমের উপদেশ দেন তিনি। বলেন, "কোনো অনাচার যেন না হয়। মনে থাকে যেন শরীরটা এখন তোমার একার নয়।"

কিছুদিন পরে শেফালি মিত্রকে আরও আনন্দিত মনে হলো। সোফিয়ার খুব কাছে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তিনি বললেন, "সোফিয়া, নতুন খবর আছে।"

ভাবী-মা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। "কী খবর?"

শেফালি স্নেহভরে সোফিয়ার একটি হাত ধরে বললেন, "যতোদূর মনে হয়, একজন নয়, ওরা দু'জন আসছে।"

"যমজ?" সোফিয়া উত্তেজনায় উঠে বসলেন।

পরের দিন শেফালি আবার যথাসময়ে সোফিয়াকে দেখতে এলেন। হাসপাতালে সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছো?"

দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়ে সোফিয়া উত্তর দিলেন, "ভালোই আছি। খুব ভালো আছি।"

তারপর সোফিয়া যা বললেন, শেফালি মিত্রের অবচেতন মনে সেই কামনা বহুদিন অবহেলিত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। প্রথম ধাক্কায়

তিনি কেঁদে ফেললেন, বিশ্বাস হচ্ছিলো না কিছুতেই। সোফিয়া স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। যমজ ছেলে হলে তার একটি শেফালি নিতে পারেন। জীবন বেঁচেছে তাঁর করুণায়। কোনো কিছুতেই সে ঋণ পরিশোধ হবে না। তাছাড়া দুটি সন্তান মানুষ করাও সোফিয়ার রুগ্ন দেহে সম্ভব নয়।

যমজ সন্তানই এল শেষপর্যন্ত। একটি ছেলে একটি মেয়ে। অর্ধচেতন সোফিয়ার বিছানার পাশে শেফালি মিত্রকে অনেক বিনিদ্র রাত কাটাতে হলো। হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার অবশেষে বললেন, এবার বিপদ কেটে গিয়েছে।

"সুস্থ হয়ে নতুন-মা বাড়ি ফিরে এলেন?" ডক্টর শেফালি মিত্র চেম্বারে বসে বলে যাচ্ছেন।

আমার হঠাৎ খেয়াল হলো কাহিনীর মধ্যে এমন ডুবে গিয়েছি যে, কোন্ ফাঁকে লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

"সব লিখে নিচ্ছো তো?" সায়েব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর ডক্টর মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলে যান।"

"আমার বর্ণনা হয়তো একটু দীর্ঘ হচ্ছে, কিন্তু আমি আপনাকে সব বলতে চাই। আপনি তবেই বুঝতে পারবেন, কে অন্যায় করেছে।" ডক্টর মিত্র সায়েবের মুখের দিকে সম্মতির জন্য তাকালেন।

"নিশ্চয়, আপনি যা বলতে চান বলুন।"

"সোফিয়া কথা রেখেছিল। মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিলো সে।" শেফালি মিত্র আবার বলতে লাগলেন।

সোফিয়া কিন্তু একটি শর্ত আরোপ করেছিল। "মেয়ের নাম আমি নিজেই দিয়েছি জাহানারা, ও নাম পরিবর্তন করবে না," সে বলেছিল।

ডক্টর মিত্র আপত্তি করেননি। ছোট্ট ফুলের মতো মেয়েটি বুকে করে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন।

আট মাসের মেয়ে জাহানারা প্রথম কয়েকদিন কেঁদেছিল। পরে সব ঠিক। আয়া রেখেছেন ডক্টর মিত্র। পেরেম্বুলেটরে জাহানারাকে বসিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় অন্য কাজ বন্ধ রেখে নিজে পার্কে বেড়িয়েছেন।

জাহানারা হাঁটতে শিখেছে। শেফালির চিন্তা বেড়েছে। সবাইকে বলে বেড়ান, "আমার নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। মেয়ের এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। মেয়ে খুব দুষ্টু, কিছুতে আয়ার কাছে ঘুমোবে না। আমাকে সময়মতো বাড়ি ফিরতেই হবে।"

মেয়ের দৌরাত্ম্যে সোফিয়ার কাছে যাওয়া কমিয়ে দিলেন ডক্টর মিত্র। দু'-একবার মেয়েকে নিয়েই ওখানে গিয়েছেন তিনি। জাহানারা সোফিয়াকে মাসি বলে ডাকে।

ডক্টর মিত্রের সমগ্র হৃদয় সে ধীরে-ধীরে গ্রাস করলো।

কিছুদিন পরে রেঙ্গুনে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বাঁধলো। দাঙ্গায় অনেকে প্রাণ হারালো, লুঠতরাজ কম হলো না।

দাঙ্গা থামতেই ডক্টর মিত্র কলকাতায় চলে এলেন। রেঙ্গুনে বাস আর নিরাপদ নয়। কলকাতায় তিনি চেম্বার খুললেন।

সোফিয়াও আর রেঙ্গুনে থাকলেন না, ফিরে গেলেন বোম্বাই। সেখানে তাঁর স্বামী একটি চাকরি পেয়েছেন, মাইনে অনেক কম। কিন্তু উপায় কী ?

শেফালি ও সোফিয়ার পত্রালাপ এই গোলমালেও বন্ধ হয়নি। শেফালি বোম্বাইতে জাহানারার ছবি পাঠিয়েছেন।

একটু বড়ো হলে জাহানারাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছেন, "মাই ডিয়ার আন্টি, তুমি কেমন অছো ?"

আন্টি উত্তর দিয়েছেন "সোনা মেয়ে, আমরা ভালো আছি। তোমার মামি লিখেছে, তুমি নাকি খুব ভালো মেয়ে। শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

ইংরেজী শেখাবার জন্য গভর্নেস রেখেছেন ডক্টর মিত্র।

কলকাতার সেরা মিশনারী কন্‌ভেণ্টে জাহানারা পড়তে যায়। নিজে গাড়ি করে মেয়েকে স্কুলে রেখে আসেন। ছুটির আগেই গেটের কাছে গাড়ি নিয়ে তিনি অপেক্ষা করেন। ঘণ্টা পড়ার একটু পরে মেয়ে লাফাতে-লাফাতে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। হাত থেকে বইগুলো নামিয়ে নিয়ে মেয়েকে পাশে বসান তিনি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। তিনি বললেন, "মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, রোদে ঘুরেছো নিশ্চয়।"

জাহানারা রাস্তার দু'দিকে তাকাতে-তাকাতে বলে, "না মা, আমি একটুও রোদে ঘুরি না। রোদে ঘুরলে যে কালো হয়ে যায়, আমাদের ক্লাশের নমিতা বলেছে।"

ডক্টর মিত্র লোভ সামলাতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করেন, "রঙ কালো হলে কী হয় ?"

জাহানারা সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে বলে, "আহা তুমি যেন জানো না। রঙ কালো হলে বিয়ে হবে না।"

শেফালি মিত্র হাসতে-হাসতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বাড়ি ফিরেই সোফিয়াকে চিঠি লিখেছেন তিনি। জাহানারার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে ভোলেন না। "তোমার মেয়ে তোমার মতোই হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। যে কোনো মানুষের মন পাঁচ মিনিটে জয় করে নিতে পারে। জাহানারাকে দেখে আমি সহজে কল্পনা করতে পারি ছোটোবেলায় তুমি কেমন ছিলে।"

"চোদ্দবছরে পড়লো জাহানারা আর আমারও কপাল মন্দ হতে বসেছে।" ডক্টর শেফালি মিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন।

"কেন ?" প্রশ্নটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আমার কাজ শুধু লিখে যাওয়া, যা কিছু জিজ্ঞাস্য সায়েব জেনে নেবেন। কিন্তু গল্পের ঝোঁকে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছি।

শেফালি মিত্র ম্লানমুখে বলতে লাগলেন, "মাসখানেক আগে সোফিয়া চিঠি লিখেছিল, কয়েকদিনের কাজে তার স্বামী কলকাতায় আসছেন।"

উত্তরে আমি লিখলাম, "তুমিও চলে এসো কলকাতায়, কতদিন দেখা নেই। আমার বাড়িতে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, থাকবার অসুবিধা হবে না।"

তারপর একদিন হাওড়া স্টেশন থেকে সোফিয়া ও তার স্বামীকে আনতে গেলাম। কতদিন পরে দেখা। প্ল্যাটফরমেই আনন্দে সোফিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বাড়িতে এসেই জাহানারাকে ডাকলাম। সেও ছুটে এল, জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছো আন্টি ?"

জাহানারা, সোফিয়া ও আমি একসঙ্গে প্রায়ই সিনেমায়

য়েতাম। বোটানিকাল গার্ডেনে ফিস্ট হলো এক রবিবার। জাহানারার কনভেন্ট দেখিয়ে আনলাম সোফিয়াকে। পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো জাহানারা, দেখালো তার নিজের আঁকা রঙীন ছবি। আন্টিকে একটা বাঁধানো ছবি উপহার দিয়েছে সে।

আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি আমি রাখিনি। তবুও সোফিয়া কেমন. গম্ভীরভাবে থাকে। কারণ প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমাকে সরিয়ে দিয়ে জাহানারার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করছিল সে। আমি আপত্তি করিনি, ভেবেছি এমনি গল্প হচ্ছে, আর কিছু নয়।

কিন্তু জাহানারার বাবা সেদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। সোজাসুজি বললেন, "জাহানারাকে এবার আমরা নিয়ে যেতে চাই। এতোদিন দেখাশোনা করেছেন। সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো প্রথমে। মনে হলো এখনই মেঝেতে লুটিয়ে পড়বো। "এ-সব কথার অর্থ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সোফিয়া আড়ালে দাঁড়িয়েছিল এতোক্ষণ। কাছে এগিয়ে এসে সে বললে, "আমার মেয়ে আমি ফেরত চাই; অতি সরল অর্থ।"

আমি সহ্য করতে পারলাম না। তখনি বার করে দিয়েছি দু'জনকে। বলেছি, "হোটেলে যাও। আমার বাড়িতে জায়গা হবে না।

ওরা চলে গেলে রাগটা একটু কমলো। অতোটা অভদ্রতা না করলেও হতো। কিন্তু আপনি বলুন, আমার রাগ করাটা কি অন্যায় হয়েছে?" শেফালি মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

"গতকাল পুলিশ এসেছিল আমার বাড়িতে। জাহানারার সমস্ত খবর নিয়ে গেল। ওরা নাকি থানায় খবর দিয়েছে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। বড়ো ভয় লাগছে।

আজ সকালে আবার এক এটর্নির চিঠি পেয়েছি। জাহানারাকে সত্বর তার বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে।

কিন্তু জাহানারা···জাহানারাকে আমি কেন দেবো? সে-তো আমারই মেয়ে···।" উত্তেজনায় শেফালি মিত্রের স্বর থরথর করে কাঁপছে।

"আমি আইনের কিছু জানি না। আমাকে কি করতে হবে বলুন। জাহানারাকে আমি এতো বড়ো করে তুলেছি, তাকে ছাড়তে পারবো না।...আমি পাগল হয়ে যাবো...।" শেফালি মিত্র, কলকাতার প্রথিতযশা ডাক্তার শেফালি মিত্র, রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন।

"টাকার জন্য ভাবনা নেই। আপনি বলুন জাহানারা কি আমার নয়?" রুমালে আবার চোখ মুছলেন তিনি।

চশমাটা খুলে রেখে সায়েব জিজ্ঞাসা করলে, "রেঙ্গুনে জাহানারাকে যখন আপনি প্রথম নিয়ে এলেন তখন কোনো লেখাপড়া হয়েছিল কী? লিখিতভাবে দত্তক গ্রহণ করাটাই সাধারণ রীতি।"

শেফালি মিত্র উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "না লেখাপড়া তো হয়নি।" হঠাৎ রেগে উঠলেন তিনি। "কিন্তু কাগজে লেখাটাই কি সব? আপনাদের আইনে মুখের কথার কি কোনো মূল্য নেই? কোনো কিছু লেখা নেই বলে ওরা জাহানারাকে নিয়ে যাবে?" শেফালি মিত্রের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

"উতলা হবেন না ডক্টর মিত্র। আইনকে রেল ইঞ্জিনের মতো একটা নির্দিষ্ট লাইন ধরে যেতে হয়। মুখের কথায় বিশ্বাস করা যে সব সময় সম্ভব হয় না।" সায়েব প্রবোধ দিলেন।

সামান্য চিন্তা করে তিনি আবার বললেন, "আপনার পক্ষে অনেক কিছু বলবার আছে। তবে জাহানারার বাবার কেস্‌ও যে খুব দুর্বল তাও বলা যায় না। জাহানারা এখনও নাবালিকা। নাবালিকার অভিভাবকত্ব নিয়েই দু'পক্ষের টাগ-অফ-ওয়ার। আমাদের দুটি পথ খোলা আছে—এক জাহানারার বাবা কোর্টে মামলা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা; অথবা হাইকোর্টে আমরাই জাহানারার অভিভাবকত্বের জন্য আবেদন করতে পারি।"

শেফালি মিত্র বললেন, "আর অপেক্ষা করতে চাই না। আমরাই বরং কোর্টে কেস্‌ করি।"

এটর্নির নাম বলে দিলেন সায়েব। তাঁর কাছে প্রথমে যেতে হবে, তিনি কেস্‌ ফাইলের প্রাথমিক কাজগুলো করবেন!

চেয়ার থেকে ডক্টর শেফালি মিত্র উঠে পড়লেন। স্টেথসকোপটা

টেবিল থেকে তুলে তিনি সায়েবকে বললেন, "পরিচিত মহলে আপনার অনেক কেসের গল্প শুনেছি। আমার বিশ্বাস আছে আপনার উপর। জাহানারাকে ওরা যেন ছিনিয়ে না নেয়।"

শেফালি মিত্র চলে গেলেন।

নোটবুকের পাতাগুলো উলটিয়ে দেখছিলাম। শেফালি মিত্রের হৃদয়ের কথা শর্টহ্যাণ্ডের আঁকাবাকা টানের মধ্যে ধরে রেখেছি।

ঘড়িতে চারটে বাজে। সায়েব বললেন, "এবার যাওয়া যাক।"

আমার নোটবুকের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। কিন্তু কথা বললেন না।

হাইকোর্টে মামলা ফাইলের পর ডক্টর মিত্র মাঝে-মাঝে চেম্বারে আসতেন। নমস্কার জানিয়ে বলতাম, "সায়েব ভিতরে আছেন, চলে যান।"

তিনি কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার কাছে এসে দাঁড়াতেন। "আপনারা তো এ-লাইনে রয়েছেন, আইনের কিছু-কিছু বোঝেন। আচ্ছা, জাহানারাকে আমি রাখতে পারবো না?"

যতোদূর জানি, অতি কঠিন মামলা। তবু হেসে বলতাম, "আপনি ভাববেন না। জাহানারার আসল মা আপনিই।"

তিনি একটু সাহস পেতেন। বলতেন, "আমার ছবির এলবাম এনে একদিন আপনাদের দেখাবো, কতটুকু মেয়েকে বুকে করে এনেছিলাম। সেবার ওর নিউমোনিয়ার মতো হলো। তখন কোথায় ছিল ওর আপন মা? এতো যদি ভালোবাসা, কলকাতায় এসে মেয়ের সেবা করলে না কেন? আমি বলে রাখলাম, ওর মায়ের হাতে পড়লে জাহানারা ছ' মাসও বাঁচবে না? বলুন, আমি অন্যায় বলেছি?"

"না না, এক শ' বার সত্যি। এ-সব আমার তো ভালোভাবে জানা আছে।" আমি বলতাম।

ইতিমধ্যে কেসের কাজ এগোচ্ছে। জাহানারার বাবা প্রতিবাদে জানিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ের অভিভাবক তিনি হবেন, বাইরের লোকের অধিকার নেই সেখানে।

প্রত্যুত্তরে শেফালি মিত্র এফিডেভিটে আপন বক্তব্য জানিয়েছেন।

সায়েব শেফালি মিত্রের বাড়িতে গেলেন একদিন। বললেন "আপনার মেয়েকে ডাকুন, একটু গল্প করে যাই।" জাহানারার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছেন তিনি।

নেপথ্যের সকল প্রস্তুতি শেষে, যে জজের কোর্টে মামলা উঠলো বিচক্ষণ বিচারক হিসাবে ব্যারিস্টার মহলে তাঁর প্রচুর সুনাম।

জাহানারার বাবার পক্ষেও বড়ো ব্যারিস্টার। তিনি জাহানারাকে মা-বাবার কাছে ফেরত দিতে চান।

সায়েব বললেন, "জাহানারাকে তার বাবা ও মা ডক্টর মিত্রকে দিয়ে দেন।"

অপরপক্ষ সঙ্গে-সঙ্গে দান প্রমাণের কাগজপত্র চেয়ে বসলেন। কিন্তু আমাদের কাগজপত্র কিছু নেই। তখন ওঁরা বললেন, জাহানারাকে ডক্টর মিত্র ভালোবাসতেন এবং তার মায়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। মেয়ের ভরণপোষণের জন্য জাহানারার বাবা কয়েকবার টাকা পাঠাতে চেয়েছেন। কিন্তু শেফালি মিত্র তা নেননি।

তাঁরা আরও বললেন, মুসলমান আইনে মেয়ের স্বাভাবিক অভিভাবিকা মা, সুতরাং জাহানারার অভিভাবিকা সোফিয়া প্যাটেল।

সায়েব বললেন, "তাঁরা অভিভাবকের কর্তব্য করেননি।"

ওঁরা উত্তর দিলেন, নিশ্চয় করা হয়েছে। অসংখ্য চিঠিতে মেয়ের সংবাদ নিয়েছেন তাঁরা। অনেক দূরে বাস ও আর্থিক অনটনের জন্য সব সময় চাক্ষুস দেখা হয়নি। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকত্ব তাঁরা কোনোদিন ত্যাগ করেননি। মেয়েকে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ভর্তির সময়ও তাঁদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। ডক্টর মিত্র জাহানারাকে নিয়ে দু'বার সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দু'বারই অনুমতির জন্য তিনি চিঠি দিয়েছেন।

সায়েব উত্তরে বললেন, "অনুমতির জন্য চিঠি দেননি ডাঃ মিত্র। দিয়েছিলেন সাধারণ সংবাদ হিসেবে। যাঁরা তাঁকে মেয়ে দিয়েছেন মেয়ের খবরাখবর তাঁদের মাঝে-মাঝে জানানোটা তিনি কর্তব্য মনে করেছেন!"

শেফালি মিত্র রোজ কোর্টে বসে থাকতেন। দেড়টায় লাঞ্চের

জন্য জজসায়েবের সঙ্গে-সঙ্গে সবাই উঠে পড়লেন। ডক্টর মিত্র নিজের চেয়ারে বসে রইলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "খেতে যাবেন না ?"

ডক্টর মিত্রের চোখ ছল-ছল করছে। "আমার খেতে ইচ্ছে নেই। কেমন বুঝছেন বলুন ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"রায় না বেরুনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না কী হবে। অযথা চিন্তা করবেন না। কিছু খেয়ে আসুন।"

তবু গেলেন না তিনি। বললেন, "খেতে গেলে বমি হয়ে যাবে, এখানেই বসে থাকি।"

লাঞ্চ শেষে আবার কোর্ট বসলো। তর্কযুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হলো।

অপরপক্ষের ব্যারিস্টার বললেন, বাবা কিংবা মায়ের অভিভাবকত্বের দাবি অনস্বীকার্য। একমাত্র কোনো ঘোরতর অপরাধ বা ত্রুটি প্রমাণিত হলে তাদের অপসারিত করে অন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা যেতে পারে। ডক্টর মিত্রের এমন কোনো অভিযোগ আছে কি যে, জাহানারার বাবা চরিত্রহীন, মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল বা অভিভাবক হিসাবে অযোগ্য ?

সায়েব বললেন, "না,—জাহানারার বাবার বিরুদ্ধে সেরকম অভিযোগ আমাদের নেই।"

অপরপক্ষের ব্যারিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কোন্ অপরাধে জাহানারার মা এবং বাবা নিজের মেয়েকে পাবেন না ?"

"আমরাও একই প্রশ্ন উত্থাপন করছি। চোদ্দবছর ধরে নিজের সকল স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে পালন করে শেফালি মিত্র আজ জাহানারাকে হারাবেন কেন ?" সায়েব উত্তর দিলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা এতোদিন পরে কেন মেয়েকে ফেরত চাইছেন ?"

"আমরা মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই এবং অল্প বয়সেই"। জাহানারাকে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে সে একটি পুরো মেম্সায়েব বনে যাবে। কোনোদিন ঘরসংসার করতে পারবে না।" অপরপক্ষ উত্তর দিলেন।

সায়েব বললেন, "মাই লর্ড, নাবালিকার মঙ্গলের জন্যই

অভিভাবকের প্রয়োজন। যতোদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জ্ঞান জন্মায়, ততোদিন অভিভাবক তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে জাহানারার ভবিষ্যতই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়। বাবা-মা'র কাছে থাকা তার ভবিষ্যতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হলে, আপনি জাহানারাকে নিশ্চয় তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন।"

তারপর তিনি একে-একে দেখালেন, চোদ্দবছর ধরে জাহানারা প্রাচুর্যের পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছে। হঠাৎ পরিবেশ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। ভালো স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে সে এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মনে-মনে সে যে ছবি এঁকেছে বাবার কাছে ফিরে গেলে তা কখনো বাস্তবে রূপান্তরিত হবে না।

জজসায়েব বললেন, "আমি নিজে জাহানারার সঙ্গে কথা কইতে চাই।"

জাহানারা কোর্ট-রুমে এল। সাদা সিল্কের সালোয়ারপরা ফুটফুটে মেয়ে। চাঁপা ফুলের রঙ। চুলে লাল সাটিনের রিবন, হাতে লেডিজ রিস্টওয়াচ। জজসায়েব জাহানারাকে নিজের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ, অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ।

ডক্টর মিত্র কোর্ট-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। উত্তেজনায় ছটফট করছেন তিনি। আমাকে বললেন, "আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করছে। জাহানারাকে জজসায়েব কী জিজ্ঞাসা করবেন?"

"বলা শক্ত। কিন্তু জাহানারা আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবে না নিশ্চয়।" আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম।

ডক্টর মিত্র একটু মনোবল পেলেন বোধহয়। "হুঁ, জাহানারা আমাকে খুব ভালবাসে।" কিছুক্ষণের জন্য ভ্রূকুঞ্চন করলেন তিনি। তারপর বললেন, "কিছুই বলা যায় না। হয়তো..."

মিনিট চল্লিশ পরে জজসায়েব কোর্টে ফিরে এলেন। বললেন "চল্লিশ মিনিট সময় নেওয়া আমার উচিত হয়নি। কিন্তু জাহানারার সঙ্গে আমার এমন ভাব হয়ে গেল যে, একটা ছোট্ট গল্প পর্যন্ত এই ফাঁকে শুনে নিয়েছি।" জজসায়েবের কথায় কোর্টের সবাই হেসে উঠলেন।

অবশেষে পাঁচদিনব্যাপী যুদ্ধের অবসান হলো। ডক্টর মিত্র

আমাদের সঙ্গে টেম্পল চেম্বারে এলেন। চোখ দেখে বোঝা যায় রাতে ঘুম হচ্ছে না। আমাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন বুঝছেন, সত্যি করে বলুন।"

আমি বললাম, "কালকে রায় বেরিয়ে যাবে। যুদ্ধ সায়েবও কম করেননি। দেখা যাক।"

পরের দিন সকালে ডক্টর মিত্র, জাহানারাকে সঙ্গে করে চেম্বারে এলেন। জাহানারার চুলে আজ নীল রঙের ফিতে। পরনে অর্গাণ্ডির ফ্রক, বুকের কাছে হনিকুম্ব করা, হাতে একখানা বাংলা বই।

"তুমি বাংলা জানো?" আমি জাহানারাকে জিজ্ঞাসা করলাম।
"বাঃ, আমি তো মামিকে প্রায়ই বাংলা পড়ে শোনাই।"

যথা সময়ে আমরা হাইকোর্টে ছ' নম্বর ঘরে হাজির হলাম। জজসায়েব এলেন একটু পড়ে। সামনের সারিতে সায়েব ব্রীফ হাতে বসে আছেন। পাশে বিপক্ষের ব্যারিস্টার। অনেক পিছনে একটা চেয়ারে শেফালি মিত্র। আমাকে কাছে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন বুঝছেন?" উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছে। জাহানারাকে চেম্বারে রেখে এসেছেন। সেখানে সে ছবির বই পড়ছে।

জজসায়েব তাঁর রায় পড়তে লাগলেন। দু'পক্ষের বক্তব্য তিনি বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তারপর জাহানারার চোদ্দ বছরের জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস, এমন কি তার জন্মের পূর্বে রেঙ্গুনে ডক্টর মিত্র ও সোফিয়ার পরিচয় কাহিনীর বর্ণনা দিতে লাগলেন।

সে-কাহিনী আমাদের ভালোভাবে জানা আছে। আমরা শুধু তাঁর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছি। শেফালি মিত্র সামনের চেয়ারটায় হাত দিয়ে জজের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। উত্তেজনায় হাতটা তখনও মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছে। ভাবছেন, জজসায়েব ফলাফলটা আগেই বলে দিতে পারতেন।

জজসায়েব গার্ডিয়ানস্ এণ্ড ওয়ার্ডস্ এ্যাক্ট-এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন। আমি একবার শেফালি মিত্র এবং আর একবার জাহানারার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি। সোফিয়া কোর্টে আসেননি। প্যাণ্ট পরে জাহানারার বাবা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শেফালি মিত্র চেয়ারটা আরও সামনে এগিয়ে নিলেন।

জজসায়েব টাইপ-করা জাজমেণ্ট পড়ে যাচ্ছেন—মামলাটা বিচিত্র। জাহানারার কোনো সম্পত্তি বা গচ্ছিত অর্থ নেই। সুতরাং নাবালিকার অভিভাবকত্বের জন্য যাঁরা কোর্টে মামলা করতে এসেছেন তাঁদের বৈষয়িক স্বার্থ নেই। তাঁরা দু'জনেই জাহানারাকে ভালোবাসেন, আর কিছু নয়। ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। জাহানারার বাবা ও মা'কে অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করার মতো কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়ের প্রতি আদর্শ পিতামাতার সকল কর্তব্য তাঁরা নিশ্চয় পালন করেননি। অপরদিকে ডক্টর শেফালি মিত্রের ব্যারিস্টার যে কথা বলেছেন, তাঁর মক্কেল হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে জাহানারাকে পালন করছেন।

জাহানারার বাবা ও মা সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বেশি লেখাপড়া শেখা, তাঁরা ভালো চক্ষে দেখেন না এবং তাঁরা কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

আমার মনে হয়, এই দো'টানায়, জাহানারার ভবিষ্যৎ আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। তার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। বালিকা হলেও পৃথিবীর খানিকটা বোঝবার মতো বুদ্ধি তার হয়েছে। জাহানারার সঙ্গে কথা বলে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ক্লাশে ফার্স্ট হয় সে। ভবিষ্যতে সে মস্ত বৈজ্ঞানিক হতে চায়। জগৎকে জানবার আগ্রহ আছে প্রচুর। ডক্টর মিত্রকে সে মা বলে, এবং তাঁকে ছেড়ে যেতে চায় না। শুধু তাই নয়, এখনই বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আমাকে ছোটোখাটো বক্তৃতা সে শুনিয়েছে।

সুতরাং জাহানারার অভিভাবকত্ব ডক্টর মিত্রকে দিলাম। তবে আশা করি, মেয়েকে মাঝে-মাঝে, বাবা-মা'র সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতে দেবেন।

জজসায়েব কাগজ বন্ধ করে হাসতে লাগলেন। আনন্দে শেফালি মিত্রের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। খুব খুশি তিনি। প্রায় নাচতে-নাচতে কোর্ট-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মজা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে তো অনেকবার প্রশ্ন করেছেন, এখন আপনি কেমন বুঝছেন বলুন?"

"তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। এখন আবার প্রশ্ন করছি, ক'সের সন্দেশ খেতে পারেন বলুন।" আমরা দু'জনে হাসতে লাগলাম।

জাহানারাকে নিতে ডক্টর মিত্র চেম্বারে এলেন। সায়েব আগেই এসে বসেছিলেন। মেয়েকে কোলে বসিয়ে শেফালি মিত্র অনেকক্ষণ গল্প করলেন। "মেয়েকে নিয়ে আমার কত মুশকিল দেখছেন তো ?

সায়েব হেসে বলললেন, "এবার মুশকিল আসান হলো।"

জাহানারা চুপচাপ এইসব কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সায়েব বললেন, "আপনার মেয়ে আমার কাছে মুখ বুজে থাকে, কিন্তু জজের কাছে খুব কথা বলে। আমি কী অন্যায় করেছি ?"

ঘাড় নিচু করে জাহানারা বললে, "না-না।"

"আর না-না, বেশ দেখতে পাচ্ছি," সায়েব উত্তর দিলেন।

"আপনাকে দেখলে ও লজ্জা পায়", ডক্টর মিত্র বললেন।

"তা নয়, আসলে আমি যে বুড়ো হয়ে গিয়েছি। মাথায় একটি চুলও নেই। তাই হয়তো···নাঃ, বলবো না। বলার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জজসায়েবকে বিয়ে করার বিরুদ্ধে ও যেভাবে বলেছে, তাতে আমার বলতে সাহস হচ্ছে না।" আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম।

লজ্জায় চোখ বুজে জাহানারা বললে, "ধ্যাৎ।"

মুখ গম্ভীর করে ছোকাদা বসেছিলেন। অনেকদিন পরে বাবুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, অথচ কারুর যেন কথা বলবার ইচ্ছা নাই। অর্জুনবাবু, হারুবাবু, সুনীলবাবু সকলেই বিমর্ষ হয়ে বসে রয়েছেন। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ছোকাদাও উদাসভাবে বার-লাইব্রেরীর দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছেন। কতক্ষণ আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়, চলে যাবো কিনা চিন্তা করছিলাম। ছোকাদা এবার আমাকে দেখতে পেলেন। বসতে জায়গা দিয়ে, একটা বিড়ি বার করলেন।

"বলো দেখি, ব্যারিস্টারদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কারা?" ছোকাদা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছোকাদা ম্লান হাসলেন। "বলতে পারলে না! যারা সবচেয়ে বোকা তারাই ব্যারিস্টারী ছেড়ে জজিয়তি করতে যায়।"

আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম। "সে কী? জজ হওয়া থেকে বড়ো সম্মান কী থাকতে পারে?"

ছোকাদা রেগে উঠলেন। "জজ হয়ে বাপু ক'টাকা রোজগার করবে? সম্মান তো আর ভাতে দিয়ে খাওয়া যায় না। আর বাপু, যতো সম্মান কি জজদের? ব্যারিস্টাররা কি বানের জলে ভেসে এসেছে?"

ব্যাপারটা আমি জানতাম না। ছোকাদার সাহেব মিস্টার মুখার্জি জজ হয়ে যাচ্ছেন। আজ খবর এসেছে। ছোকাদা স্তম্ভিত। প্রথম যে-দিন মামার সঙ্গে ছোকাদা এ-পাড়ায় এসেছিলেন, তিনি ঠিক বলেছিলেন, বাবু হতে গেলে কপাল চাই। কিন্তু কপাল নিয়ে আসেননি তিনি। না হলে দু'-দু'বার এমন হবে কেন? বনোয়ারীবাবুর মতো হবার জন্য সেন সাহেবকে কেন্দ্র করে ছোকাদা স্বপ্ন দেখে ছিলেন। তা হয়নি। অনেক বৎসর পরিশ্রম করে যে সময় সবে পশার জমতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই সময়ে সেন সাহেব জজ হয়ে গেলেন। ছোকাদা অনেক বুঝিয়েছিলেন, জজ হয়ে লাভ নেই, কিন্তু সেন সাহেব শোনেননি। তবে যাবার আগে মুখার্জি সাহেবের কাছে ছোকাদাকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ছোকাদা বলতেন, "এক সাহেব ছেড়ে অন্য সাহেবের কাজ করা অনেকটা দ্বিতীয় পক্ষের সংসারের মতো। মুখে যতোই সোহাগ দেখাই প্রাণ আর বসতে চায় না।"

মুখার্জি সায়েব লোক খারাপ নন। নিজের পশার জমার সঙ্গে সঙ্গে ছোকাদার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুজোর সময় বোনাস দিয়েছেন। এ-লাইনে ছোকাদা কম পয়সা রোজগার করেননি। কাসুন্দেতে টিনের বাড়ি ভেঙে কোঠাবাড়ি তুলেছেন। বাড়িতে ফ্যান হয়েছে, রেডিও এসেছে। ছেলেরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েটার বিয়েটা দিয়েই এবার শান্তি পাবেন ভাবছিলেন।

কিন্তু তা হবার নয়। জজিয়তি পেয়ে মুখার্জি সাহেব লাফিয়ে উঠেছেন।

ছোকাদা বললেন, "ফুটবল খেলা ছেড়ে উনি এবার রেফারিগিরি করবেন।"

চল্লিশ বছর আগে ছোকাদা যে জীবন শুরু করেছিলেন, এবার তার শেষ। মুখার্জি সাহেব বলেছেন, "কানাই, তোমার বয়স হয়েছে, এবার অবসর নাও। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলা করে শেষ ক'টা দিন জীবনকে উপভোগ করো। আমি যতোদিন আছি ততোদিন পুরো মাইনে মিলবে।"

আমাদের সামনে ছোকাদা কাঁদছিলেন। "এবার যেতে হবে। চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই তো সেদিনের ব্যাপার। সবুজ রঙের চাদর গায়ে দিয়ে সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। বনোয়ারীবাবু বসে রয়েছেন।"

ছোকাদা উঠে গেলেন। আমাদের চোখের কোণ ভিজে উঠেছে।

ছোকাদা না থাকলে, হাইকোর্টের অনেক কিছুই আমার অজানা রয়ে যেতো। তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অক্ষয়। বার-লাইব্রেরীর সামনে বেঞ্চিতে বসে চল্লিশ বছর ধরে তিনি আইন-পাড়াকে দেখে আসছেন। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্‌দের কাকে দেখেননি তিনি? এই তো সেদিনের কথা, লর্ড সিংহ বাগ্মীতায় নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তখনও দেশবন্ধু হননি, কোর্টে কেস্ করছেন।

আর রাসবিহারী ঘোষ। ছোকাদা অসংখ্যবার দেখেছেন তাঁকে। তিনি ব্যারিস্টার নন, উকিল। কিন্তু কি বাগ্মিতায়, কি আইনজ্ঞানে এমন প্রতিভা আর একটিও বুঝি হাইকোর্টে দেখা যায়নি। ছোকাদার কাছে শুনেছি, জজরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। "আরে বাপু, রাসবিহারীর মুখে আইনের ব্যাখ্যা শোনাও যা আর বেদব্যাসের মুখে মহাভারত শোনাও তা।"

একজন জজের সঙ্গে রাসবিহারীর মোটেই বনিবনা ছিল না। সেই নিয়ে একবারে ভারি মজা হয়েছিল, ছোকাদা বলেছিলেন। বড়োবড়ো আইনজ্ঞদের মাঝে-মাঝে দুই কোর্টে একই সময়ে ডাক

পড়ে। সে-ক্ষেত্রে এক কোর্টের জজ সাধারণতঃ মামলা স্থগিত রাখেন। একবার রাসবিহারী প্রধান বিচারপতির কোর্টে মামলা করছিলেন। এমন সময় জানা গেল, পরদিন প্রথমোক্ত জজের কোর্টে আর একটি মামলা শুরু হবে। বাধ্য হয়ে তিনি জুনিয়রকে মামলাটি একদিনের জন্য স্থগিত রাখার জন্য আবেদন করতে পাঠালেন।

জুনিয়র কোর্ট গিয়ে বললেন, "ধর্মাবতার, স্যার রাসবিহারী প্রধান বিচারপতির আদালতে এক জটিল মামলায় ব্যস্ত রয়েছেন। অনুগ্রহ করে আগামী সকালের মামলাটি একদিন স্থগিত রাখলে, তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।"

জজসায়েব খাঁটি ইংরেজ। রাসবিহারীকে অপমান করার এমন সুযোগ তিনি ছাড়তে চাইলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, "মামলা স্থগিত রেখে কি হবে? রাসবিহারীর অনুপস্থিতিতে তুমিই মামলা করতে পারো। After all one man is always as good as another man."

অপদস্থ জুনিয়র রাসবিহারীকে সব জানালেন। ব্যাপার শুনে প্রধান বিচারপতি নিজের মামলাটি পরদিনের জন্য স্থগিত রাখলেন।

পরের দিন সকালে নিজের কোর্টে রাসবিহারীকে উপস্থিত দেখে জজসায়েব মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। রাসবিহারীর অসুবিধা সৃষ্টি করতে পেরে তাঁর আনন্দ হয়েছে। রাসবিহারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যতোদূর শুনেছিলাম আপনি অন্য আদালতে ব্যস্ত থাকবেন। তবুও এখানে কেমন করে এলেন?"

রাসবিহারীও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, "ধর্মাবতার, এই আদালত এক মজার জায়গা। এখানে one man is not always as *bad* as another man. তাই প্রধান বিচারপতি আমাকে ছেড়ে দিলেন।" তারপর নির্বিকারভাবে তাঁর মামলা শুরু করলেন। জজসায়েবের মুখের অবস্থা বর্ণনা করার দরকার নেই। তবে দিনের শেষে স্যার রাসবিহারীকে নিজের ঘরে ডেকে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

এই রাসবিহারীর ছাত্র ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আইনের দিক্‌পাল। শিক্ষা সমাপ্ত করে ছাত্র একদিন জজ হয়ে

বসলেন। শিষ্য বিচারক এবং গুরু তাঁর কাছে বিচার ভিক্ষা করছেন। কিন্তু সেজন্য কোনো অসুবিধা হয়নি। শিষ্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও, বিচারের সময় নিস্পৃহ।

যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করে আশুতোষ রায় লিখতেন। একজন বৃদ্ধ জজ একবার তাঁকে বলেছিলেন, "এখন বয়স কম তাই, পরে কিন্তু এতো পরিশ্রম করে রায় লিখতে পারবে না।" আশুতোষ তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন। "যতোদিন পরিশ্রম করতে পারবো, ততোদিন জজিয়তি করবো। যখন বুঝবো আর পারছি না, তখন কাজে ইস্তফা দেবো।"

ছোকদার কাছে আরো যেসব গল্প শুনেছি, বিদায়দিনে সেগুলো মনে পড়ছিল। আমরা কয়েকজন বাবু মিলে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালাম। পাঞ্জাবীর দোকানে চা ও দু'খানা সিঙাড়া খেয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। বিদায় জানাতে গিয়ে আমরা কেঁদে ফেললাম। ছোকাদাও কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন। ট্র্যাম-লাইন পর্যন্ত আমরা তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম।

কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখি তিনি আবার কোর্টে আসছেন। বাবুদের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকেন। বললেন, "বাড়িতে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না।" দশটা বাজলেই কি এক আকর্ষণে মন আকুল হয়ে ওঠে। ব্রীফ, এফিডেভিট, অরিজিনেটিং সামনস, জাজমেণ্ট-আপন-এওয়ার্ড, প্লেণ্ট, রিটন স্টেটমেণ্ট এরা একসঙ্গে তাকে হাতছানি দেয়—বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।

ছোকাদার কথা যখনই চিন্তা করি তখনই আর একজ
মনে পড়ে।

দশ নম্বর কোর্টেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। গোলগাল মোটাসোটা ভদ্রলোকটি, মুখে অমায়িক হাসি। নাম জগদীশবাবু। গলাবন্ধ সুতী কোট পরে যখন বসে থাকতেন তখন বাঙালী বলে মনে হতো

না। ঠিক যেন কোনো মারোয়াড়ী ব্যবসাদার; কে বলবে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর পি. কে. রায়ের মুহুরী।

জগদীশ বাবুর মতো এমন অমায়িক ভদ্রলোক খুব কম দেখেছি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই পিঠে চাপড় দিয়ে বলতেন, "চলো, চা খেয়ে আসা যাক।" আইন-পাড়ায় জগদীশবাবুর পয়সায় কতবার যে চা খেয়েছি তার হিসেব রাখিনি। কারণ সে-হিসেব শুনলে আমার ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমার কি দোষ বলুন? আমি চায়ের দাম দিতে গেলেই জগদীশবাবু বলতেন, "হাজার হোক বয়সে তো তোমার থেকে বড়ো, দোকানে আমার মানটা নাই বা নষ্ট করলে। লোকে বলবে, এক ফোঁটা একটা ছেলে বুড়োর চায়ের দাম দিচ্ছে।"

জগদীশবাবুকে অনেকবার বলেছি, "আমি আর এক ফোঁটা ছেলেটি নেই, এ-পাড়ার একটি ঝানু বাবুতে দাঁড়িয়েছি।" তিনি স্বীকার করেননি। কাঁধে হাত দিয়ে বলেছেন, "আইনপাড়াতে আর কিছু না শেখো, বাক্যবুলিতে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছো।"

অন্য মুহুরীরা বলতেন, "লোকটার দেমাক আছে। আমাদের সঙ্গে ভালো করে কথা কয় না।" কিন্তু কেন জানি না, আমাকে দেখলেই পান চিবোতে-চিবোতে হাসতে-হাসতে জগদীশবাবু বলতেন, "এই যে শ্রীমান, চেম্বারে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে বুঝি। দশ নম্বর ঘরটা তোমার যে কেন ভালো লাগে জানি না। আমি তো মাঝে-মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। সমস্ত জীবন এই একটা ঘরে কেটে গেল। তোমরা তবু নানান কোর্টে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পাও।"

তর্ক করতে আমার খুব ভালো লাগে? তাই বললাম, "আমার ইচ্ছে হয় দিনরাত দশ নম্বরে দাঁড়িয়ে থাকি। মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। হলে, এই ঘর ছেড়ে আপনি অন্য কোথাও যেতে চাইতেন না।"

মোটা হাত দিয়ে আমার পিঠে একটা থাবড়া মারলেন তিনি। "ও, দুষ্টুমি হচ্ছে? ওরে, আমিও তো সন্তুষ্ট থাকতে চাই।" এবার তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, "কিন্তু পারি কই?"

"কিছু মনে করবেন না জগদীশবাবু, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলিনি। আগে কখনো আপনাকে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকতে দেখিনি। কী হলো? রায় সাহেবের সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?

ম্লান হেসে তিনি বললেন, "না, রায় সাহেব আমার দেবতার মতো মানুষ। কিছু হয়নি। তবু এক একসময় মনে হয়, এ ঘরে যদি কখনো না আসতাম, তা হলে ভালো হতো।"

জগদীশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়। মিস্টার রায় তখনো পাবলিক প্রসিকিউটর হননি। জগদীশবাবুও তখন এতো মোটা ছিলেন না। দশ নম্বরে দিনরাত বসে না থেকে, মাঝে-মাঝে অন্য কোর্টে বেড়াতে যেতেন। আজকাল তো চা খাওয়ার সময় ছাড়া ওখান থেকে একটি পা-ও নড়বেন না।

দশ নম্বর ঘরের স্মৃতির সঙ্গে জগদীশবাবু অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছেন। হয়তো আমার দুর্বলতা, কিন্তু তাঁকে ছাড়া দশ নম্বর কোর্টকে এবং দশ নম্বর কোর্ট ছাড়া তাঁকে কিছুতেই কল্পনা করতে পারি না।

অনেকদিন আগে বাবুদের বেঞ্চিতে বসে ছোকাদার সঙ্গে গল্প করছিলাম। তাঁকে বলছিলাম, "এই বেঞ্চিতে বসে থাকলে প্রতি মিনিটে গল্পের খোরাক পাওয়া যায়। চোখের সামনে কত রকম লোকের আনাগোনা চলছে।"

ছোকাদা ঘাড় নেড়ে বললেন, "পরমহংসদেবের সেই সাধুর গল্প শুনেছিস তো? যে বলেছিল, সামনে এগিয়ে যা; তারপরে প্রথমে তামার খনি, আরও সামনে রূপোর খনি এবং আরও এগিয়ে সোনার খনি পাওয়া গেল। আমি পরমহংস নই, সুতরাং বিশ্বাস করবি না। কিন্তু তবু আমি বলছি সামনে এগিয়ে যা, অনেক কিছুর সন্ধান পাবি।

ছোকাদাকে কখনও অবিশ্বাস করিনি। বার-লাইব্রেরীর বারান্দা ধরে তাই সোজা এগিয়ে গিয়েছি। প্রথমে বার-এসোসিয়েশন, আরও এগিয়ে কাঠের পোল পেরিয়ে হাইকোর্টের আর এক অংশ, দশ নম্বর কোর্ট। সামনে পুলিশের ভিড়, থম-থমে ভাব—দায়রা কোর্ট। মূল আদালতের সঙ্গে যেন কোনো আত্মার

সম্বন্ধ নেই, তাই অস্পৃশ্যের মতো আসল বাড়ি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দশ নম্বর ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াই। দরজায় পুলিশ রয়েছে। ভিতরে ঢুকতে দেবে তো? না, প্রবেশে বাধা নেই। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আমিও ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বিরাট হল্‌ঘর। মনে হয় যেন অতি প্রাচীন। জনকয়েক সার্জেণ্ট সন্তর্পণে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজা থেকে অনেক দূরে বিচারকের আসন। মস্ত বড়ো এক পুরনো আমলের চেয়ারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পোশাক অন্য জজদের মতো কালো নয়, টকটকে লাল। পাশেই লম্বা সারিতে জুরিদের আসনে আট-ন'জন চোখে-চশমা গম্ভীর-মুখ ভদ্রলোক।

দূরে একটা বিরাট কাঠের খাঁচার ভিতর ঝাঁকড়া চুল আর গাল ভর্তি দাড়ি সমেত একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দর্শকরা তারদিকে এমনভাবে চেয়ে দেখছে, যেন চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী সুন্দরবন থেকে নতুন আনা বাঘ—দেখবার মজা খুব থাকলেও খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসার ভয়ও আছে। তা ইচ্ছে করলে এ-লোকটা খাঁচা ভেঙে ফেলতে পারে, যেরকম দৈত্যের মতো চেহারা!

জজসায়েবের রক্তরাঙা পোশাকে মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা জ্বলজ্বল করছে। ঘরটার কোণে-কোণে অন্ধকার জড়ো হয়ে রয়েছে। সকাল দশটা না সন্ধ্যা ছ'টা বোঝা দায়। গাটা ছমছম করতে থাকে।

একজন সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ডাক্তারী কথা, সব বোঝা যায় না—রিগর মর্টিস, থোরাক্স। কালো গাউনপরা প্রশ্নকর্তাও যেন ডাক্তারী শাস্ত্রে পণ্ডিত, অবলীলাক্রমে ডাক্তারকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

গলাবন্ধ কোট পরে এক ভদ্রলোক আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই জগদীশবাবু, তখন জানতাম না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আসামী কে?"

ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, "কার্তার সিং। বাস ড্রাইভার কার্তার সিং বালীগঞ্জে রাত বারোটায় জোড়া-খুনের দায়ে ধরা পড়ে। বেটারা জানের মায়া করে না। কোনো উকিল

দেয়নি মশাই। শেষপর্যন্ত কোর্ট থেকে আমার সাহেবকে কেসটা করতে বলায় উনি ডিফেণ্ড করছেন।"

"ওর কে কে আছে? আত্মীয়স্বজন কেউ নেই এখানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কে জানে মশাই, বেটার সাতকুলে কেউ আছে মনে হয় না। বেটারা সেই ভোরে বাস চালাতে আরম্ভ করে, আর রাত এগারোটা পর্যন্ত ছুটি নেই। মধ্যিখানে শুধু তু'বার পেটপুরে মাংস রুটি টেনে নেয়। বাসই ওদের ঘরবাড়ি, রাত্রেও বাসেই ঘুমোয়।"

"কেস্ কেমন মনে হচ্ছে?"

"আমি কি মশাই গণৎকার? কার্তার সিং তো হাজতে আমার সাহেবকে বলেছে ওকে মিথ্যে ক'রে মামলায় জড়িয়েছে। এ-সব মামলায় তো তদ্বিরই সব। সাক্ষীসাবুদ কে যোগাড় করবে?"

প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। বার-লাইব্রেরী থেকে বই নিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আর দেরি করা যায় না, সায়েব চেম্বারে অপেক্ষা করছেন। চলে আসতে হলো। কিন্তু চেম্বারে ফিরেও কার্তার সিং-এর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল ও লাল চোখকে ভুলতে পারলাম না। পৌনে চারটের সময় বার-লাইব্রেরীতে বই ফেরত দেওয়ার অছিলায় দশ নম্বর কোর্টে আবার গেলাম। দরজা ভেজানো ছিল, ভিতরে ঢুকে দেখি কোর্ট জনমানবশূন্য। জজসায়েব, জুরি, উকিলবাবু কেউ নেই। কার্তার সিং-এর খাঁচাও খালি, কেবল গোটাকয়েক পায়রা বেআইনীভাবে ভিতরে প্রবেশ করে ঝটাপটি করছে। কোনো ভয় বা সম্ভ্রমবোধ নেই তাদের। জজসায়েবের চেয়ারে বসে বকুম-বকুম শব্দ করে, আবার কার্তার সিংএ খাঁচার উপর ভারিক্কী চালে এসে বসছে। চারটের আগে কেস্ বন্ধ হলো কি করে, বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করার মতো কাউকে না পেয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। এমন সময় গলাবন্ধ কোট-পরা ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "ভালোই হলো, আপনাকে খুঁজছিলাম। চারটের আগেই কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল কেন?" আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম।

"কেস্ তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কার্তার সিং-এর পনেরো বছর জেল।"

বোকার মতো আমি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম, "আপনার সাহেব কার্তার সিংকে বাঁচাতে পারলেন না ?" তিনি হেসে ফেললেন। "বাঁচাবার মালিক কি আমরা ? সব ওই ওপরের ভদ্রলোকের খেলা"—তিনি আঙুলটা এমনভাবে উপরের দিকে তুললেন যে, মাথার ছাদ ফুড়ে আকাশের ওধারে যিনি থাকেন তার কথা হচ্ছে বুঝতে পারলাম। আঙুল নামিয়ে আমাকে প্রায় আধমিনিট ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। "ক্রিমিন্যাল কেসে আপনার খুব আগ্রহ দেখছি। সকালে এসেছিলেন, আবার এ-বেলায় এলেন। আমার নাম জগদীশ বোস, তবে স্যার জগদীশ নই," জগদীশবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। হাসির ঝড় শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম কি ? কোথায় কাজ করেন ?"

নাম-ধাম পরিচয় দিতেই তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন, "আরে তাই নাকি ? আপনার সায়েবের সঙ্গে আমার সায়েবের যে খুব ভাব। আমাদের আসল বন্ধুত্ব তাহলে অনেকদিনই হয়ে আছে, শুধু পরিচয় হয়ে ওঠেনি, এই যা।" জগদীশবাবু আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন।

সেই থেকে আলাপ।

জগদীশবাবু বলেছিলেন, "সময় পেলে আসবেন মশায়।"

সময় পেলেই ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। হাইকোর্টের সঙ্গে জগদীশবাবুর অনেকদিনের পরিচয়। বিশেষ করে দশ নম্বর কোর্টের নাড়ীনক্ষত্র তাঁর জানা। তিনি একদিন বলেছিলেন, "দেখুন, এই দশ নম্বরে টাকাকড়ির সম্বন্ধ নেই। দশ হাজার কিংবা কুড়ি হাজার টাকার ডিক্রি নয়। আট, দশ কিংবা চোদ্দ বছরের জেল তো মশাই হামেশা হচ্ছে। কখনো আবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।"

জগদীশবাবু অবিচলিতভাবে বলেছিলেন, "ওইখানে থামলেও বা কথা ছিল। কখনও···নাঃ, থাক।"

"কেন বলুন না, বেশ হচ্ছিলো তো।"

"না থাক। সে-সব শুনিয়ে ছোটোছেলের মন খারাপ করিয়ে দিতে চাই না।" তিনি সস্নেহে আমার দিকে তাকালেন, "সর্বনাশা ঘর এটা। কত লোককে ভয় পাইয়ে দেয় ঠিক নেই। এই যে

আমি, আজ না হয় সয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথম যখন এসেছিলাম ?” কথা থামিয়ে পকেট থেকে পান বার করলেন, আমাকেও একটা দিলেন।

আবার আরম্ভ করলেন, “রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠতাম। ভয় লাগতো। চোর-ডাকাত, খুন-খারাপি যতো সব লোমহর্ষক ব্যাপার। অথচ এই খাঁচায় ঢুকলেই আসামীগুলো নেতিয়ে পড়ে! মনটা একেবারে ঝিমিয়ে পড়তো কিন্তু ওই যা বলছিলাম, সব সাময়িক। ক্রমশঃ সব সয়ে যায়, আপনারও যাবে।” জগদীশবাবু আমাকে আশ্বাস দিলেন।

“যতো পারেন দেখে যান”, জগদীশবাবু আর একদিন বলেছিলেন। “শুধু দেখে যান। আজকাল কেস্‌ও অনেক বেড়েছে। কলকাতা সহরে ফৌজদারী মামলা অনেক হচ্ছে। আর কত রকমের মামলা! কত বিভিন্ন পদ্ধতিতে খুন! বুঝলেন মশায়, নেহাত গোবেচারা লোকগুলোই আজকাল দা কিংবা তলোয়ার দিয়ে খুন করে। এখন সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ। খুন-জখম, নোটজাল থেকে পকেটমারা পর্য্যন্ত সব সায়েন্সের ব্যাপার, ধরা শক্ত। কিন্তু ধরা পড়লেই পুলিশ কোর্ট এবং তাঁরা বাছাই করে কিছু এখানে পাঠিয়ে দেন। একদিন সকালের দিকে আসবেন কোর্ট বসার আগে, গোড়া থেকে একটা কেস্‌ দেখলে ভালো লাগবে।”

ঠিক দশটায় দশ নম্বরে একদিন গিয়েছিলাম। তখন বিশেষ কেউ আসেনি। টেবিল চেয়ার সব খালি, নাটক আরম্ভ হবার আগে রঙ্গমঞ্চ যেমন দেখায়। বেলা সাড়ে-দশটায় কয়েকজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকলেন। নিচে রাস্তায় তাঁদের কালো রঙের বিরাট গাড়িটা গর্জন করে খানিকটা ধোঁয়া ত্যাগ করে থেমে গিয়েছে। কোটপরা দু’-একজন কর্মচারীও হন্তদন্ত হয়ে এসে নিজেদের কাজ আরম্ভ করলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক উকিলদের জন্য রক্ষিত চেয়ারগুলো দখল করে বসলেন। একটা বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে গেল। সারি বেঁধে কারা যেন আসছেন। সামনের লোকটির হাতে ন্যায়দণ্ড। পিছনে লাল পোশাকে জজসায়েব। তাঁর পেছনে আর একজন। জগদীশবাবু বলে দিলেন সামনের

লোকটি শেরিফ। জজসাহেবের পাশে তাঁরাও আসন গ্রহণ করলেন। এমন সময় এক ভদ্রলোকের তারস্বর চারিদিকের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো—ইয়া ইয়া ইয়া, অল পার্সনস্ দোজ হ্যাভ্ এনিথিং টু ডু উইথ মাই লর্ড দি জাস্টিস প্রিজাইডিং ওভার দীজ সেশনস্ কাম নিয়ার এণ্ড গিভ্ ইউর অ্যাটেনশন। ঘোষকের কণ্ঠস্বর এক অশ্রুতপূর্ব শব্দঝঙ্কারের সৃষ্টি করে। তোমরা এসো। কাছে এসো। মাই লর্ড দি জাস্টিস দোষীদের দণ্ডবিধান করবেন, তোমরা এসো।

খাঁচার মধ্যে একজনকে এতোক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল। একে একে ন'জন জুরিও শপথ গ্রহণ করে তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তাঁরা বাইরের লোক—কেউ আপিসের কেরানী, কেউ স্কুল-মাস্টার, কেউ বা অধ্যাপক। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে তাঁরাই বিচার করবেন আসামী দোষী অথবা নির্দোষ। মামলা আরম্ভ হতেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, চেম্বারে ফিরতে হবে।

জগদীশবাবু বলে দিলেন, "আবার আসবেন মশায়।"

তারপর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। জগদীশবাবু আমাকে 'মশায়' বলা ছেড়ে দিয়েছেন। সম্বোধনটা আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে শেষে শ্রীমানে পর্যবসিত হয়েছে। জগদীশবাবুর সাহেব, মিস্টার রায় আসামীপক্ষ ছেড়ে সরকারী প্রসিকিউটরের কাজ নিয়েছেন। যে লোক আগে আইনের হাত থেকে আসামীকে ছিনিয়ে আনতেন, তিনিই আজ তাকে দোষী প্রমাণ করেন। মিস্টার রায়কে বহুবার কোর্টে দেখেছি। আমাকে দেখলেই মৃদু হেসে চোখটা টিপে যেতেন তিনি। পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকবছর। টাক আর চুল নিজেদের মধ্যে আপসে ভাগ বাঁটোয়ারা করে মাথাটা পার্টিশন করে নিয়েছে।

জগদীশবাবু কিন্তু একটুও পাল্টাননি। "এই যে শ্রীমান, অনেকদিন আসা হয় না কেন? চলো, একটু চা খেয়ে আসা যাক।" তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এসেছি। একদিন অভিমান করে বললাম, "আমিই শুধু আপনার কাছে আসি। আপনি তো একবারও টেম্পল চেম্বারে আসেন না।"

"ছেলে বটে, সবকিছু হিসেব করে রেখেছে। আচ্ছা যাবো।" জগদীশবাবু হেসে বললেন।

কথা রাখতে টেম্পল চেম্বারে তিনি সত্যি একদিন এলেন। আমার আনন্দের সীমা নেই। সায়েব ভিতরে ছিলেন। তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন। "আজ যেন খুব খুশি মনে হচ্ছে।"

"অনেক কষ্টে আজ এঁকে আনতে পেরেছি।" জগদীশবাবুর পরিচয় দিলাম সঙ্গে-সঙ্গে।

"কেমন আছে পি. কে ?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন। "আমরা অনেকদিনের বন্ধু। দশ নম্বরে তু'জনে একসঙ্গে অনেক কেস্ করেছি।" জগদীশবাবুর সঙ্গে তিনি বহু কথা বললেন।

"পাবলিক প্রসিকিউটরের মুহুরী হতে কেমন লাগছে, জগদীশবাবু ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি। "বেশ ছিলাম আগে। এখন খাতির বেড়েছে, কিন্তু শান্তি অনেক কমেছে। ভালো লাগছে না।" কিন্তু কেন তা বললেন না, আমারও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

জগদীশবাবুর খোঁজে কিছুদিন পরে দশ নম্বরে আবার গিয়েছি। এবার খাঁচার মধ্যে বছর পঁয়তাল্লিশের একটা শীর্ণ লোক। লোকটা বাঁ-হাতে নিজের চোখ তুটো ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"বুড়োবয়সে ভীমরতি, নচ্ছার," জগদীশবাবু বলছিলেন।

"কী কেস্ ?"

"থ্রি-সেভেনটি-এইট।"

"সে আবার কি ? এতোদিন তো শুধু ফোর-টোয়েন্টি জানতাম।"

"থাক্, আর জেনে দরকার নেই।" তারপর নিজের মনে জগদীশবাবু বললেন, "আহা, নিষ্পাপ, অবোধ মেয়েটা।"

লোকটা তখনও মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে বেঞ্চিতে আট-দশ বছরের মেয়ে কোলে করে এক পশ্চিমা ভদ্রমহিলা। পাশে আর একজন মহিলা। ঘোমটায় সব ঢাকা, ঠিক যেন কলা-বৌ। বয়স কত, বাঙালী, না পশ্চিমা, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। পরনের শাড়ি ময়লা হলেও লাল পাড়টা জ্বলজ্বল করছে। দশ নম্বর কোর্টে কেমন থমথমে ভাব।

জুরিরা নিশ্চয় তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, জজসায়েব খাঁচার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "প্রিজনার অ্যাট দি বার, তুমি জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত···জুরিরা একবাক্যে তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন।···সৌভাগ্যের বিষয় সমাজে তোমার মতো চরিত্র বেশি নেই। দশবছর সশ্রম কারাদণ্ড··· ।"

কিন্তু বিচারকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কার কান্নার মধ্যে ডুবে গেল। চমকে ঘাড় ফেরালাম। ঘোমটার ভিতর থেকে সেই মহিলা ডুকরে কাঁদছেন। আসামী তখনও মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা-পোশাকে দু'জন সার্জেন্ট তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। অবগুণ্ঠিতা মহিলাটি অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আসামীও অন্য দরজা দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এডভোকেটের কালো গাউনটা হাতে জড়াতে-জড়াতে মিস্টার রায় চেয়ার ছেড়ে উঠতেই, জগদীশবাবু তাঁর হাত থেকে ব্রীফটা নিয়ে নিলেন। দশ নম্বর ঘরের অন্যতম নায়ক মিস্টার রায়ের নিষ্ক্রমণ-পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উদাস নয়নে পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে তিনি যখন শিশুর মতো চেয়ে থাকেন, তখন, কে বলবে ইনি ক্রিমিন্যাল বারের মুকুটমণি। তাঁর হাত থেকে আসামীর নিষ্কৃতি স্বপ্নের ব্যাপার। নিপুণভাবে জাল পেতে তিনি ধীরে-ধীরে গুটিয়ে আনেন। অকাট্য যুক্তিতে জুরিদের সামনে আসামীদের অপরাধগুলো তুলে ধরেন—সোনা চোর···ডাকাত··· ব্যাঙ্ক লুটের সর্দার···জালিয়াত! আমি আর তাঁকে ক'বার দেখেছি! দেখেছেন জগদীশবাবু, আর দেখেছে ওই সাদা পোশাকের কটা-চোখ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট। সে জানে, খাঁচার ভিতর থেকে আসামী কেমন সন্ত্রাসে মিস্টার রায়ের দিকে চেয়ে থাকে। সে জানে, মিস্টার রায়ের কেসে কতবার তাকে খাঁচা খুলে বলতে হয়েছে, তুমি মুক্ত; আর কতবার তাকে ধীরে-ধীরে রিভলবার বেল্টের সামান্য স্পর্শ অনুভব করে আসামীকে ঘিরে দরজার দিকে যেতে হয়েছে।

"এ-সপ্তাহে একটা আসামীও খালাস পায়নি। প্রত্যেকটা কেসে সাকসেস।" পিঠে চাপড়-বসিয়ে জগদীশবাবু বললেন, "চলো, একটু চা খেয়ে আসা যাক।"

ছ'হাতে পয়সা রোজগার করছেন জগদীশবাবু। তবু সারাক্ষণ শুকনো মুখে বসে থাকেন। সর্বদা যেন কিছু চিন্তা করছেন। তিনি বিয়ে-থা করেননি সুতরাং সংসারের ঝামেলা নেই। রামজী হাজরা লেনে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে অন্য ভাইদের সঙ্গে থাকেন। তাঁর ভাইপো'র অন্নপ্রাশনে সেখানে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। বাড়ির অবস্থা বেশ ভালোই।

"এখন অনেক কাজকর্ম। তাই রায় সাহেবের বাড়িতেই থাকছি। মাঝে-মাঝে বাড়ি যাই।" জগদীশবাবু বললেন।

"কিন্তু সবসময় কী এতো চিন্তা করেন?"

তিনি হাসলেন, "আগে বেশ ছিলাম। এখন মোটে ভালো লাগে না। সাহেব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। আমি বলে রাখলাম, উনি বেশিদিন বাঁচবেন না। আমি বুঝে উঠতে পারছি না।" জগদীশবাবু মাথাটা নাড়লেন।

আমরা তো বাইরে থেকে কিছু বুঝি না", আমি বললাম।

"ভিতর থেকে আমি ঠিক বুঝি," তিনি উদাসভাবে উত্তর দিলেন। "অন্য কিছুতে গোলমাল নেই। যতো নষ্টের গোড়া এই মার্ডার কেস। ওঁর মাথা ঠিক থাকে না! রাত্রে ঘুম নেই। মাঝরাত পর্যন্ত বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করেন। কেউ কাছে গেলে তেড়ে মারতে আসেন। পাতে ভাত পড়ে থাকে, খেতে পারেন না। না ঘুমিয়ে চোখগুলো লাল হয়ে থাকে। এমন করলে লোক বাঁচে? কিন্তু কেন এমন হয়?" জগদীশবাবু বুঝতে পারেন না। "মন্ত্র-শক্তি? উঁহু। কিন্তু জোর করে বলতে পারি না, হলেও হতে পারে।"

তাঁকে বোঝালাম, "আপনি অযথা ভাবছেন। আসলে হয়তো কিছুই নয়।"

আমার প্রবোধবাক্যে যে কিছু ফল হয়নি, মাসখানেক পরে জগদীশবাবুর চেহারা দেখে বুঝলাম। মুখটা আরও শুকিয়ে গিয়েছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে। আমাকে দেখেই তিনি চায়ের দোকানে নিয়ে গেলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "ভালো লক্ষণ নয়। আমার মাথা ঘুলিয়ে উঠছে।" জগদীশবাবুকে কখনো এতো উতলা দেখিনি। "কাউকে বলো না, তোমাকে গোপনে বলছি।" জগদীশবাবু বলতে লাগলেন।—

"সেদিন তখন সন্ধে সাতটা হবে, রায় সাহেব বই পড়ছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। এমন সময় বাইরের দরজা ঠেলে একটি মেয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়লো। ঘোমটায় কিছুই দেখা যায় না। একবার শুধু নাকে রূপোর নথটা দেখতে পেলাম। বাইরে রিক্‌শা দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জলে ভিজে মেয়েটির কাপড় দেহের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। আচমকা সে সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলো। "আপনাকে বাঁচাতেই হবে।" তিনি কোনোরকমে পা ছাড়িয়ে নিলেন। "আমার স্বামী খুনের আসামী।"

"জগদীশ।" রাগে রায় সায়েবের গলা কাঁপছে। "এখনই, এই-মুহূর্তে চলে যেতে বলো।" তাঁর চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে।

"অত্যন্ত বে-আইনী কাজ করতে এসেছেন, এখনি চলে যান," আমি বললাম।

মেয়েটি তবুও নড়লো না, বলতে লাগলো, "আপনার দয়ায় আমার সংসার রক্ষে পাবে…"

দাঁতে দাঁত চেপে রায় সাহেব আমাকে ডাকলেন, "জগদীশ।"

মেয়েটি চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত দো'মনার পর সে আবার এগিয়ে গেল, রায় সাহেবের দিকে। কিন্তু সভয়ে আবার দরজার কাছে সরে এল সে। ঘোমটার ভিতর থেকে সরু গলায় বললে, "বাইরে যে বৃষ্টি পড়ছে।"

"তবু যেতে হবে এবং এখনই।" আমার আগে রায় সাহেব বলে দিলেন।

মেয়েটি বেরিয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ছে আরও জোরে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে-মাঝে। প্রচণ্ড শব্দে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লো। হঠাৎ রায় সাহেব চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে পড়লেন। "জগদীশ, মেয়েটাকে ডাকো।"

"কোথায় ডাকবো স্যার? সে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।"

"না-না, ওসব জানি না। এখনি ডাকো। কেন তাকে যেতে দিলে?"

"আপনিই তো বললেন।"

কিন্তু রায় সাহেব শুনলেন না। তখন বৃষ্টির মধ্যে খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। হেডলাইটে অন্ধকারের বুক চিরে একটা মোটর হুস করে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক জলে ভিজে যখন ফিরলাম, তিনি তখন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। "তাকে খুঁজে পেলাম না স্যার।" চোখ বন্ধ করে তিনি বললেন, "বেশ, ভালো কথা। কিন্তু কেন খুঁজে পেলে না?" আমি আরও ভয় পেলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কোনো উত্তর মনে আসছে না।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন রায় সাহেব। হা-হা করে হাসতে লাগলেন তিনি। "কি আবোল-তাবোল বকছিলাম। একেবারে ভিজে নেয়ে গিয়েছো। এখনি জামা-কাপড় ছেড়ে এসো, নইলে অসুখ বাধিয়ে বসবে।"

জগদীশবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, "এমন লোকের সঙ্গে কাজ করা ঝকমারি। অন্য সময় কোনো গোলমাল নেই। কিন্তু মার্ডার কেসে সব উল্টে যায়। সমস্তরাত ধরে কেস্ তৈরি করবেন। অথচ ভোর পাঁচটায় ওঠা চাই। সাড়ে-পাঁচটায় ঘোড়ার গাড়িতে কাশীমিত্তিরের ঘাট। আমিও সঙ্গে যাই। স্নান করে কপালে চন্দন তিলক কেটে বাড়ি ফিরেই উনি পুজোতে বসবেন—পাক্কা একঘণ্টা গৃহদেবতা রাধাগেবিন্দ জিউ-এর সেবা।

এসব লোকের এ-লাইনে আসা উচিত হয়নি।" জগদীশবাবু নিজের মনে বললেন।

আবার দশ নম্বরে গিয়েছি।

এবার খাঁচায় জালিয়াত গণপতি চাটুজ্যে। দশটাকার নোটের ছাপাখানা খুলেছে বাড়িতে। গণপতির পক্ষে বড়ো এড্‌ভোকেট রায় সাহেবের সঙ্গে জোর যুদ্ধ চালাচ্ছেন। আর খাঁচায় বাবরি চুলওয়ালা, রোগা, কুঁজো গণপতি চাটুজ্যে ঝিমুচ্ছে।

মামলায় ফল কী হবে, আন্দাজ করতে ইচ্ছে হয়। গণপতি চাটুজ্যে হয়তো জালিয়াত নয়, খালাস পেয়ে যাবে। কিংবা দশটি বৎসর শ্রীঘর। কেউ বলতে পারে না, কী হবে। জগদীশবাবু

থাকলে আমরা ভাগ্য-পরীক্ষা করতাম। হুটো আঙুল কপালে ঠেকিয়ে এনে আমার মুখের সামনে ধরতেন। আমি একটা আঙুল ধরতাম। উনি বলতেন, "নাঃ, বেটা এ-যাত্রা ফক্কা।" জগদীশবাবু কোর্টে নেই।

বেরিয়ে এলাম। উটের মতো লম্বা ও রোগা গণপতি চাটুজ্যে খাঁচায় দাঁড়িয়ে রইলো।

"ক্রিকেট খেলার মতো গ্লোরিয়স আনসার্টেন্টি। অনিশ্চয়তা।" সায়েব আমাকে একবার বলেছিলেন, "জুরিরা কি মত দেবেন বলা যায় না। কতবার সুফল আশা করে নিরাশ হয়েছি। আবার কখনও ঠিক উল্টো।"

তিনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন—

"ঐ দশ নম্বর ঘরে অনেক দিন আগে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখানকার এক হাসপাতালের হু'জন ঝাড়ুদার আসামী। নরহত্যার অভিযোগ।

হু'পক্ষের মামলা-শেষে জজ জুরিদের দিকে চেয়ারটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেন। একঘণ্টা পরে সমগ্র মামলার বিশ্লেষণ যখন শেষ হলো তখন সহজেই ফলাফল আন্দাজ করতে পারলাম। নিশ্চিত পরাজয়। নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য জুরিরা ভিতরে চলে গেলেন। সারাদিন পরিশ্রমে মন অবসাদে পূর্ণ। হাসপাতালের একদল ঝাড়ুদার কোর্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারাই চাঁদা তুলে মামলার খরচ চালাচ্ছে। কিন্তু কোনো আশা নেই। আমি বেরিয়ে এলাম।

শীতের অকাল সন্ধ্যা গাঢ়ভাবে নেমে এসেছে। হাইকোর্টের কোথাও লোকজন নেই। ক্লান্তিতে দেহ আর চলতে চায় না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটও প্রায় জনমানবশূন্য। অনিচ্ছুক দেহটা টানতে-টানতে কোনোরকমে টেম্পল চেম্বারের লিফ্‌টে এসে দাঁড়ালাম।

চেম্বার বন্ধ। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে সুইচ হাতড়াতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত আলোটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে জ্বলে উঠলো। গাউনটা টেবিলেই পড়ে রইলো। তারপর সমস্তদিনের

ঘনীভূত ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, বুঝতে পারিনি। আচমকা ঘুমে ব্যাঘাত পড়লো। টেম্পল চেম্বারে ধুপ-ধাপ শব্দ হচ্ছে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন উন্মাদ বেগে উঠে আসছে। ক্রমশঃ শব্দ আরও কাছে এগিয়ে আসছে। অজানা আশঙ্কায় মনটা ভরে উঠলো। ড্রয়ার থেকে রিভলবার বার করবো কিনা ভাবছি। ধুপ-ধাপ, দুদ্দাড় শব্দ প্রায় উপরে এসে গিয়েছে। একদল লোক বন্যাজলের মতো আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকতে বারণ করলাম, কেউ শুনলো না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার পায়ের ধুলো তারা মাথায় ঠেকাচ্ছে। 'আমরা দু'জন ছাড়া পেয়েছি', একজন ঝাড়ুদার হিন্দীতে বললো।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। জুরিরা অপ্রত্যাশিতভাবে আসামীদের মুক্তি দিয়েছেন।"

এ-গল্প জগদীশবাবুকে বলেছি।

"আমিও দেখেছি অনেকবার। জীবন ও মৃত্যু কখনও-কখনও একটা সরু সুতোর উপর ঝুলে থাকে", জগদীশবাবু বলেছিলেন।

লোভ সামলাতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করে বসলাম। "আচ্ছা, কতবার মৃত্যুদণ্ড দিতে শুনেছেন আপনি?"

"সে কি আর গুনে রেখেছি ভাই।" জগদীশবাবু মনে-মনে হিসেব করতে লাগলেন। "ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু অনেকবার হবে।"

"চলো, চা খেয়ে আসি।" তিনি বললেন।

"একটু পরে খাওয়া যাবে, এখন গল্প হোক।"

"তবে একটা পান খাই।" পান চিবোতে লাগলেন জগদীশবাবু। হঠাৎ পান চিবানো থেমে গেল। আবার আরম্ভ হলো একটু পরে, যেন কিছু ভাবছিলেন।

"তুমি তো রাজ্যের খবর রাখো, হয়তো বলতে পারবে। এই ফাঁসির হুকুম হবার পর আসামীদের কোথায় নিয়ে যায়, মাঝে-মাঝে জানতে ইচ্ছা হয়। তুমি কিছু জানো?"

আমি কিছুই জানতাম না। জগদীশবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি।

কিন্তু অনেকদিন পরে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জানতে

পেরে প্রথমেই জগদীশবাবুর কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু তখন কোথায় জগদীশবাবু? আচ্ছা, ঘটনাটা আগে বলে নিই, তারপর সে-কথায় আসা যাবে।

টেম্পল চেম্বারে একটা পোস্টকার্ড এসেছিল, ইংরেজীতে লেখা ঃ—

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল

ডিয়ার মিঃ—

আমি ফাঁসির আসামী। আপনি দয়া করিয়া অন্ততঃ একবার দেখা করিতে আসিবেন। আপনার জন্য আমি পথের দিকে তাকাইয়া থাকিব। আসা চাই-ই। ইতি—

রাম সিং।

চিঠিটা পড়ে সায়েব আলীপুরে ফোন করলেন। বললেন, "আমরা লাঞ্চের পরই সেণ্ট্রাল জেলে যাবো।"

আলীপুর জেলের গেটের সামনে আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম, তখন প্রায় দুটো। সায়েবকে অভিবাদন জানিয়ে দ্বাররক্ষী সার্জেণ্ট লৌহ-কপাট উন্মুক্ত করলো। একটা বড়ো খাতায় আমাদের নাম ও ঠিকানা লিখতে হলো।

"আপনি কি এখনই দেখা করতে চান?" সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, তাহলে ভালো হয়।"

সার্জেণ্টের সঙ্গে আমরা চললাম। সামনে আর একটি বিশাল লৌহ-কপাট। এবার আসল রাজ্য। অনেকগুলো লোক খালি গায়ে কাজ করছে। কেউ মাটি কোপাচ্ছে, কেউ ডাল ভাঙছে। অনেকে কাজ বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমরা সার্জেণ্টকে অনুসরণ করে আরও এগিয়ে চললাম। দু'পাশে লাল রঙের ছোটোছোটো বাড়ি। প্রতি বাড়ির সামনে সশস্ত্র প্রহরী। শেষপর্যন্ত একটি বাড়ির সামনের সান্ত্রী সার্জেণ্টকে স্যালুট জানালো। সার্জেণ্ট থমকে দাঁড়ালো। বাইরে লেখা—Condemned Ward.

আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। স্বল্পপরিসর দুটি ঘর। প্রথমটি ফাকা, কেউ নেই। অন্যটিতে এক দীর্ঘদেহ পশ্চিমা পায়চারি

করছে। কাঁধে পৈতে, পরনে সাদা রঙের টার্কিস তোয়ালে। আমার বুকের ভিতর কেমন ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগলো।

"রাম সিং তুমি যাঁকে চিঠি লিখেছিলে তিনি এসেছেন", সার্জেণ্ট বললে।

রাম সিং তাড়াতাড়ি বন্ধ গেটের রেলিঙের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরের বাইরে একটি কুঁজো। হাত বাড়িয়ে জল গড়িয়ে নেওয়া যায়।

"আমাকে আপনি এবারের মতো খালাস করে দিন। আর কখনো করবো না।" রাম সিং হিন্দীতে এমনভাবে বলতে লাগলো যেন সায়েব ইচ্ছা করলে এখনই দরজা খুলে তাকে মুক্তি দিতে পারেন। ভাঁটার মতো লাল লাল দুটো চোখ নিয়ে রাম সিং আমাকে বললে, "আমি ইংরিজী জানি না। সায়েবকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন।"

জেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সায়েব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের কেস্ ?"

এক সঙ্গে তিনটে খুন। বড়বাজারে এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে দারোয়ান ছিল রাম সিং। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে মালিক গিয়েছিলেন পাটনায়। একদিন গভীর রাতে রাম সিং মালিকের স্ত্রীর শোবার ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে অন্য তিনজন কর্মচারীর কাছে ধরা পড়ে যায়। "কি হচ্ছিলো ওই ঘরে ? আমরা সব বুঝতে পেরেছি। গত রাতেও তোমাকে ওই ঘর থেকে বেরোতে দেখেছি। দাঁড়াও, বাবু ফিরে আসুক।" পরদিন সকালে ঐ তিনজন কর্মচারীর মুণ্ড ও ধড় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। রাম সিং ফেরার। তিন মাস পরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে রাম সিং ধরা পড়লো।

দশ নম্বর কোর্টে বিচার ও মৃত্যুদণ্ড।

অফিসারটি বললেন, "কাগজপত্র আপিসে আছে দেখতে পারেন।"

রাম সিং আবার হিন্দীতে বললে, "আমাকে এবারের মতো বাঁচিয়ে দিন। আমার আড়াইশ' টাকা দেশে আছে। লিখলেই পাঠিয়ে দেবে।"

সায়েবের প্রশ্নে অফিসারটি আরও বললেন, "রাম সিং-এর আপীলও নাকচ হয়েছে। এমন কি করুণাভিক্ষার আবেদনেও ফল হয়নি।"

রাম সিংকে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তোমাকে আমার কাছে চিঠি লিখতে কে বলেছে?"

"মেজরসাব্ বোলা।"

"মেজরসাব্! Who is this Major he is referring to?"

সার্জেণ্ট বললে, "মেজর রোশনলাল, ঐ পাশের ঘরটাতে ছিলেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর রোশনলালের কথা মনে পড়ে গেল। খবরের কাগজে তাঁর চাঞ্চল্যকর মামলার রিপোর্ট রোজ পড়েছি।

যুদ্ধফেরত ইয়ার-নোজ-থ্রোটের ডাক্তার মেজর রোশনলাল। দু'তিনটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। শেষে লেকের জলে মৃতদেহের কিছু অংশ ফেলতে গিয়ে যিনি ধরা পড়ে গেলেন।

"হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সেই মেজর রোশনলালই ও ঘরটাতে ছিলেন। পরশু তার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।", সার্জেণ্ট বলছিল।

"অদ্ভুত নার্ভের লোক মেজর রোশনলাল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভেঙে পড়েননি। কিন্তু ফাঁসির মঞ্চে উঠে রোশনলাল দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, you know I am a Hindu। আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য লক্ষ-লক্ষবার আমি এই পৃথিবীতে ফিরে আসবো।"

পাশের ঘরটার দিকে আবার চাইলাম। সেটা সত্যি-সত্যি খালি।

"মেজরসাব বলে গিয়েছেন আপনাকে চিঠি লিখতে।" রাম সিং আবার বললে।

আমার অনভ্যস্ত হৃৎপিণ্ডটা দ্রুতগতিতে বাজনা বাজাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

রাম-সিং-এর দিকে শেষবারের মতো চেয়ে সায়েব বললেন, "আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু আর কিছু করবার নেই।"

আমরা বেরিয়ে আসতে-আসতে শুনলাম রাম সিং তখনও বলছে, "কিন্তু এবারের মতো আমাকে বাঁচিয়ে দিন আর কখনো করবো না।"

জগদীশবাবু এ-গল্প শুনলে আনন্দিত হতেন। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলতেন, "বাঃ, কত খবর যে তুমি যোগাড় করতে পারো।" তারপরেই বলতেন, "চলো, চা খেয়ে আসি। পাঞ্জাবীর দোকানের দুটো সিঙাড়া একস্ট্রা।"

কিন্তু এ-গল্প জগদীশবাবুকে বলা হয়নি। সেণ্ট্রাল জেলে যাবার অনেক আগে ট্র্যামের চাকায় দুটি পা হারিয়ে মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

সে-আলোচনা থাক। লিখতে গেলেই চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। কাগজপত্র দূরে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ব্যারিস্টারের বাবুর ধাতে সাহিত্য সহ্য হবে না। গরীবের কেন আবার এই ঘোড়া রোগ।

আবার মনে পড়ে যায় দশ নম্বরের কথা। জগদীশবাবু তখন যদি জানতেন, এ-সব আমি কোনোদিন লিখবো হয়তো রেগে যেতেন, কিছু বলতেন না। কিংবা খুশি হয়ে পাঞ্জাবীর দোকানে ডবল-হাফ চা ও চারখানা একস্ট্রা সিঙাড়া খাওয়াতেন।

দশ নম্বর কোর্টের বেঞ্চিতে বসে আমরা দু'জনে কত মামলা দেখেছি। জগদীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি, "মিস্টার রায়ের খবর কি?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। তিন দিন কোর্টে আসছেন না।"

"কেন?"

"সেদিন এক মার্ডার কেসে পনেরো বছরের জেল হলো। রায় সাহেব কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। ভোর চারটের সময় স্নানে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে না নিয়েই। তারপর দু'ঘণ্টা ধরে রাধাগোবিন্দের পুজো হচ্ছে। কিন্তু শরীরে এতো অত্যাচার সইবে কেন? জ্বর হয়েছে।"

কয়েকদিন পরে আবার সব ঠিক। মিস্টার রায়কে কোর্টে কেস্ করতে দেখেছি পূর্ণোদ্যমে। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হেসেছেন।

কিছুদিন পরে মিস্টার রায়কে মস্ত এক কেসে দিনের পর দিন দশ নম্বর কোর্টে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কোন পক্ষ জিতবে বলা কঠিন। বিষ-প্রয়োগে ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত আসামী কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার। হত্যাকাণ্ড ঘন-রহস্যের মেঘে

আবৃত। কিন্তু মিস্টার রায় কোনো কিছু রহস্যের অন্ধকারে থাকতে দেবেন না।”

জগদীশবাবু বললেন, “এমন পরিশ্রম করলে লোকটা বাঁচবে না।”

“কি বলছেন জগদীশবাবু, বাঁচবেন না?” আমি বললাম।

“বাঁচবে কী করে? বাঁচবে কী করে শুনি? এই রকম নিত্য পূজা,—নিরামিশ আহার,—তার ওপর মার্ডার কেস্”, জগদীশবাবু বিড়-বিড় করতে লাগলেন।

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার শক্তি মুখার্জি সওয়াল করছেন। “হে জুরি-বৃন্দ, আইন বলে, শত-সহস্র অপরাধী মুক্তি পাক কিন্তু একটি নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায়। এক হীন ষড়যন্ত্রের ফলে আমার মক্কেল আপনাদের সম্মুখে অভিযুক্ত। গত চারদিন ধরে আপনাদের নিশ্চয়ই তা বোঝাতে পেরেছি—”

শক্তি মুখার্জির পর জজ-সাহেব জুরিদের কাছে মামলা বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন। জাজেস চার্জ টু দি জুরি। দশ নম্বর ঘরের সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে। জজ-সায়েব বলে চলেছেন···“এক অতি কঠিন ও রহস্যজনক মামলায় আপনারা জুরিরূপে উপস্থিত। সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে সমর্থ হয়েছে কি না, ধীরমস্তিষ্কে বিচার করবেন।···সর্বশেষে মনে করিয়ে দিই, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কোনো ব্যক্তির শাস্তি লাভ অবাঞ্ছনীয়।”

ন'জন জুরি কোর্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জজ-সায়েবও ভিতরে চলে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কোর্টের গুঞ্জন বাড়লো।

জগদীশবাবুকে এই আমার শেষ দেখা। তিনি বললেন, “শেষ পর্যন্ত দেখে যাও, আর তো বেশি দেরি নেই।”

মিস্টার রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। শক্তি মুখার্জি আসামীর সঙ্গে কি সব কথা বলছেন।

জগদীশবাবু বললেন, “চলো, চা খেয়ে আসি।”

হেস্টিংস স্ট্রীটে পাঞ্জাবীর দোকানে চা ও সিঙাড়া খেয়ে মিনিট কুড়ি পরে আমরা ফিরে এলাম। জুরিরা এখনও আসেননি। মিস্টার রায় শক্তি মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছেন।

একঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। জুরিরা ফিরলেন না। দু'ঘণ্টা···

তিনঘণ্টা। জগদীশবাবু ও আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম, শীত-শীত লাগছে। অন্য কোথাও লোকজন নেই। কে যেন যাদুমন্ত্রে এই কলহাস্যমুখর বিশাল রাজপুরীকে নির্জন পষাণপুরীতে পরিবর্তিত করেছে।

রাত আটটা। জুরিরা এখনও এলেন না। সকলে জুরিদের জন্য নির্দিষ্ট প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে আছে। দরজাটা এবার সামান্য দুলে উঠলো। বোধ হয় জুরিরা ফিরছেন। নাঃ, লাল তকমাপরা জজ-সায়েবের চাপরাসী শুধু উঁকি মেরে গেল।

খাঁচার মধ্যে আসামী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"এতো দেরি হচ্ছে কেন? কি এতো আলোচনা হচ্ছে?"

"আরে মশাই, বর্ডার লাইন কেস্।"

প্রায় ন'টা। শীতটা আরও বেড়েছে। দশ নম্বর কোর্টের ঘড়ির পেণ্ডুলামটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ও ডানদিক থেকে বাঁদিকে যাতায়াত করছে।

মৃদু গুঞ্জন উঠলো, "আসছে, আসছে।"

এবার সত্যিই জুরিরা আসছেন। পিছনের দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল। ওই তো জুরিরা ঢুকছেন। প্রথমে ফোরম্যান। এক, দুই, তিন, চার···

মিনিটখানেকের মধ্যে জজ-সায়েব এলেন। ঘরে অশরীরী নিস্তব্ধতা। যেন বুকের স্পন্দনও শোনা যাচ্ছে।

ঘোষক রাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করছেন, মিস্টার ফোরম্যান এণ্ড জেন্টলমেন ইন দি জুরি, হ্যাভ ইউ কাম টু ইউর ডিসিশন—আপনারা কী কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন?

"হ্যাঁ, ধর্মাবতার···"

বুকের ভিতরে বাজনার বেগ বেড়ে যাচ্ছে।

"আর ইউ ইউন্যানিমস্?" আপনারা সকলে একমত?

অনেকগুলো চোখ একসঙ্গে জুরিদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"হ্যাঁ, ধর্মাবতার, আমরা সকলে একমত।"

অসংখ্য যন্ত্রের ঐকতানে সৃষ্ট আবহসঙ্গীত যেন কানে আসছে। মিস্টার রায় তাকিয়ে আছেন। শক্তি মুখার্জি আগ্রহের আতিশয্যে

চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন। খাঁচার আসামীও যেন আরও কাছে এগিয়ে আসতে চায়।

“আসামী দোষী না নির্দোষ ?”

সঙ্গীতের শব্দঝঙ্কার যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

“দোষী…”

সকল গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ।

জজ-সায়েব চক্ষু কুঞ্চিত করে এক মিনিট কি যেন ভাবলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। বাঁদিকের পকেট থেকে একটা জিনিস বার হলো। কালো টুপি।

জগদীশবাবু আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। “হয়ে গেল।”

“প্রিজনার এট দি বার…” জজ-সায়েব ধীরে-ধীরে বলে চললেন। শেষ কথাটা আজও মনে পড়ে। “টু বি হ্যাঙড বাই নেক আনটিল ডেড্।”

চরম দণ্ড।

সার্জেণ্ট দণ্ডিতের পাশে এসে দাঁড়ালো।

… … … …

প্রায় সবাই চলে গিয়েছে। জগদীশবাবু তখনও বসে রয়েছেন। উত্তেজনায় তাঁর সর্বদেহ কাঁপছে। “এবার, এবার কি হবে ? রায় সাহেব ?”

মিস্টার রায় যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন। মাতালের মতো চোখ দিয়ে শূন্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। “বাড়ি চলুন স্যার। অনেক রাত হয়েছে”, জগদীশবাবু মিস্টার রায়ের হাতটা ধরে বলছেন। তাঁর খেয়াল নেই। জগদীশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। জগদীশবাবু দু'হাতে তাঁর দেহটাকে ঝাঁকুনি দিলেন। কিছুই হলো না। ছল-ছল করছে জগদীশের চোখ। তারপর বাহ্যজ্ঞানহীন লোকের মতো মিস্টার রায়কে তিনি একরকম তুলেই নিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে দেখতে পর্যন্ত পেলেন না।

অবাক হয়ে ভাবছি, এ কী রহস্য ? কেন মিস্টার রায় এমন হয়ে পড়েন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্রতা নিয়ে তিনি শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু শেষে অবসাদে টলে পড়েন। কেন এমন হয় ?

কোনো সদুত্তর খুঁজে পাইনি। অনেক ভেবেছি। কিন্তু সব নিষ্ফল। রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়নি।

আমার সকল জিজ্ঞাসায় ছেদ টেনে দিয়ে দশ নম্বর ঘরের বিশাল দরজাটা ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। রাত অনেক।

টেম্পল চেম্বারে আমার দেখা শেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্রের নাম নিকোলাস ড্রলাস। তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। ধর্মতলা স্ট্রীট কিংবা ডালহৌসির মোড়ে এখনও মাঝে-মাঝে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেই। ভিড়ের মধ্য থেকে ড্রলাসের হঠাৎ আবির্ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দেখা হলেই চিরপরিচিত কায়দায় ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে সে নিশ্চয় বলবে—"হ্যাল্লো বাবু, হাউ ডু ইউ ডু।" তারপর সে মামলার খবর জানতে চাইবেই। কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারবো না। ড্রলাস যে-ধরনের মানুষ উত্তর না পেয়ে হয়তো রাস্তার মধ্যেই চিৎকার শুরু করে দেবে।

টেম্পল চেম্বারে যতো অদ্ভুত ও সৃষ্টিছাড়া মানুষ দেখেছি। নিকোলাস বোধহয় তাদের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্যজনক। ড্রলাসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ছে। একখানা চিঠি নিয়ে সে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কঙ্কালসার চেহারা। চোখে মুখে কর্কশ রুক্ষতার ভাব। চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে ড্রলাস কাশতে শুরু করলো। কাশি সহজে থামতে চায় না, সঙ্গে হাঁপানির টানের মতো শব্দ। চিঠিটা সম্পূর্ণ পড়তে দেবার মতো ধৈর্য নেই তার। দু'বার ঢোক গিলে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলে, "ইউ তেক্ মাই কেস্ অর নত্।"

চিঠি লিখেছেন বিচারপতি রায়। পত্রবাহক জনৈক দুঃস্থ নাবিক। এখানকার কোনো বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে এক জটিল মামলায় জড়িত। সায়েব এই মামলা গ্রহণ করলে জাস্টিস রায় আনন্দিত হবেন।

সায়েব মামলা গ্রহণ করবেন জেনে ড্রলাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কি একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু কাশিতে আবার

তার কথা আটকে গেল। একটু সুস্থ হয়ে, ছেঁড়া শার্টের হাতা গুটিয়ে, ঘুষি পাকিয়ে সে বললে, "হুঁ, দুনিয়াতে জোর না করলে কিছু হয় না। যতোদিন ভালো ছেলের মতো সবার হাতে পায়ে ধরলাম কিছু হলো না। আর যেই মেজাজ গরম করলাম, চিৎকার করলাম, অমনি জজ সায়েবেরও টনক নড়লো। আর পাক্কা কুড়ি মিনিটে ব্যারিস্টার যোগাড়।"

সেদিন নিকোলাসের ভাবভঙ্গীতে ভয় পেয়েছিলাম। লোকটা মাতাল না পাগল! কিন্তু ক্রমশঃ নিকোলাসকে জেনেছি। বুঝেছি সে পাগল তো নয়ই, মাতালও নয়।

নিকোলাস ড্রলাসকে বুঝতে হলে তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনী গোড়া থেকে শোনা প্রয়োজন। সায়েব ও আমি নিকোলাসের মুখ থেকে তার ভবঘুরে জীবনের অদ্যোপান্ত বিবরণ শুনেছিলাম।

নিকোলাস ড্রলাস গ্রীসের লোক—যে গ্রীসে পেরিক্লিস ও আলেকজাণ্ডার জন্মেছিলেন, যে দেশের মাটিতে লালিত হয়েছিলেন সক্রেটীস ও এরিস্টটল। নিকোলাসের গ্রীস অবশ্য অন্য যুগের। বিগতকালের গৌরবের লেশমাত্র সেখানে নেই। সমস্ত দেশ দারিদ্র্যে জীর্ণ। অর্ধেক লোকও পেট-পুরে খেতে পায় না। নিকোলাসের স্বপ্ন ছিল বড়ো লোক হবার। নিজের দেশে তা সফল হবে না। তার এক দূর-সম্পর্কের ভাই দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে এক রেস্তোরাঁ খুলে কিছুকালের মধ্যে ব্যাঙ্কে দু'পয়সা করেছিল। নিউইয়র্কে লোকের হাতে পয়সা আছে। আর সে-পয়সা তারা যখের মতো আগলে রাখে না, প্রাণ-ভরে খরচ করে। সুতরাং সেখানে রাতারাতি ভাগ্যপরিবর্তন করা শক্ত হবে না, নিকোলাস ভেবেছিল। এক অশুভ মুহূর্তে সে দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে পাড়ি দিয়েছিল নিশ্চয়। নতুবা যে নিউইয়র্কে লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে লোকে বছর কয়েকের মধ্যে ডলারের সমুদ্রে সাঁতার কাটে, সেখানে তিন বছরেও ভাইয়ের রেস্তোরাঁয় কুকের কাজ ছাড়া নিকোলাসের অন্য কিছু জুটলো না কেন? রোজগারের মধ্যে খাওয়া-পরা ছাড়া সপ্তাহে দু'ডলার।

ড্রলাসের ধৈর্যের বাঁধে ভাঙন ধরেছিল—আত্মীয়স্বজনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুযোগ পেলে তারাও কুড়ি ডলারের কাজ

করিয়ে দু'ডলার দেয়। শেষে একদিন ভাই-এর সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম। লোকজন এসে না সরিয়ে দিলে দু'জনকেই পুলিশের শরণ নিতে হতো।

রাজপথে রাত্রি কাটিয়ে ড্রলাস চাকরির সন্ধান করে। অবশেষে এক জাহাজে চাকরি জুটলো। ড্রলাস ভাবে, ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। এতো সহজে চাকরি, আর প্রথমেই এসিস্ট্যাণ্ট স্টুয়ার্ডের পদ! মাইনে প্রথমে বছরে মাসিক দু'শ' ডলার, তারপর মাসিক আড়াইশ'।

সাগর দিয়ে ঘেরা দেশের মানুষ ড্রলাস। সমুদ্রকে ভয় পায় না। সে ভাবলো, মন্দ কি? নানান দেশ দেখা যাবে, ঘোরা যাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত।

জাহাজের নাম এস. এস. ওয়াটারম্যান, চলেছে ভারতবর্ষের দিকে। জাহাজে খাবারের দায়িত্ব ড্রলাসের। কোল্ড-রুম থেকে মাংস, মাখন ইত্যাদি বার করা, রান্না ও মেন্থর ব্যবস্থা তাকে করতে হয়। কোল্ড-রুমে সর্বক্ষণ কাজ করে ড্রলাসের ঠাণ্ডা লাগলো। চীফ স্টুয়ার্ডকে সে ক'দিন বলেছিল, সর্দি না কমা পর্যন্ত কোল্ড-রুমে অন্য কাউকে কাজ দিন। চীফ স্টুয়ার্ড তাতে কান দেননি। ডিউটি কমা দূরের কথা, ছ'ঘণ্টার জায়গায় ন'ঘণ্টা কাজের হুকুম হলো।

অনিয়ম ও অত্যাচারে ড্রলাসের রোগ পাকিয়ে উঠলো। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাণ্ডা-ঘরে কাজের বিরাম নেই। কলকাতায় এসে ড্রলাসের অত্যাচার-জর্জরিত শরীর আর বসে থাকতে রাজী হলো না। জাহাজের ডাক্তার জানিয়ে দিলেন, ডবল নিউমোনিয়া। খিদিরপুরের কাছাকাছি এক হাসপাতালে রোগীকে পাঠানো হলো।

এস. এস. ওয়াটারম্যানের কলকাতায় বারো দিন থাকবার কথা। কিন্তু কোনো কারণে সাতদিনের মাথায় জাহাজ হঠাৎ রেঙ্গুনের পথে পাড়ি দিলো। ড্রলাস তখনও হাসপাতালে। অসুস্থ শরীরে ঠাণ্ডা-ঘরে কাজ করায় রোগ বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। জাহাজের কর্তারা ড্রলাসকে জানিয়ে গেলেন, চিন্তার কিছু নেই। রেঙ্গুন থেকে ফেরার পথে তাকে তুলে নেওয়া হবে।

প্রায় একমাস পরে নিকোলাস ড্রলাস হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। বুকভরে গ্রহণ করলো উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস। যমে-মানুষে টানাটানিতে যমের হার হয়েছে। কিন্তু

ডাক্তাররা বললেন, সারাজীবনই তাকে ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানিতে ভুগতে হবে।

"শয়তান, ওরা আসল শয়তান।" সায়েবকে বলতে বলতে ড্রলাস চিৎকার করে উঠলো। মুখের ভাবে মনে হলো জাহাজ কোম্পানীর সায়েবদের সামনে পেলে সে খুন করতে পারে।

"আমার কি এই শরীর ছিল? না কোনোদিন ভেবেছি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোলো ঘণ্টা শুধু কাশতে-কাশতেই কেটে যাবে? বড়কর্তারা হাচি হলেই কেবিনে শুয়ে পড়বেন। আর হতভাগা ডাক্তারগুলো ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ফেলে রেখে ডেকের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ছুটোছুটি করবে। আর আমরা বমি করে মরতে বসলেও একবার আসবে না।"

কলকাতায় কোম্পানীর আপিসে মাসখানেক নিষ্ফল যাতায়াতের পর ড্রলাস জানলো এস. এস. ওয়াটারম্যান আর কলকাতায় আসছে না। ড্রলাস ভাবলে, হয়তো অন্য জাহাজে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে কোনো বন্দরে এস. এস. ওয়াটারম্যানের দেখা মিলবে।

নতুন জাহাজের অপেক্ষায় আরও কিছুদিন কাটে। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে ড্রলাস একদিন জাহাজ কোম্পানীর বড়োসায়েবের ঘরে ঢুকে পড়ে চিৎকার শুরু করলো। "মাসের পর মাস আমাকে ল্যাজে খেলানো চলবে না। কোন্ জাহাজে আমার যাবার ব্যবস্থা করছো বলো।" বড়োসায়েব উত্তর না দিয়ে বেয়ারা দিয়ে ঘর থেকে তাকে বার করে দিলেন। যাবার আগে ড্রলাসও বলেছিল, "আমার কথায় উত্তর দেবে কেন? কিন্তু উকিলের চিঠির উত্তর দিতে পথ পাবে না।"

এটর্নির চিঠি জাহাজ-আপিসে সত্যিই এসেছিল। কোম্পানীও সত্বর উত্তর দিতে কসুর করেননি। এটর্নি জানতে চেয়েছেন, তাঁর মক্কেল নিকোলাস ড্রলাসকে এস. এস. ওয়াটারম্যানে ফেরত পাঠাবার কী ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কোম্পানী উত্তর দিলেন, "নিকোলাস ড্রলাস নামে আমাদের কোনো কর্মচারী নেই। তবে একজন নিকোলাস ড্রলাসকে কয়েকমাস পূর্বে অসুস্থতার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল।"

মাথার উপর বাজ পড়লেও নিকোলাস এতো আশ্চর্য হতো না।

চাকরি গিয়েছে! কী অপরাধে? এতদিন পর্যন্ত তাকে কিছু বলা হয়নি কেন? রাগে ও অপমানে ড্রলাসের সর্বশরীরে জ্বলন শুরু হয়। কোম্পানীকে সে ছাড়বে না। তাদের যোগ্য শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না। গ্রীসের সন্তান সে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নোয়ানোর শিক্ষা তাদের সাত-পুরুষে নেই।

সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল তাই দিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলো। অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্তের জন্য ক্ষতিপুরণ দাবি করলে সে।

ভারতবর্ষে মামলা চালানো খুব সোজা ব্যাপার নয়। এর জন্য অর্থ ও ধৈর্যের প্রয়োজন। আইনের লড়াইতে ড্রলাস অভ্যস্ত নয়। যে পরিবেশে সে মানুষ, সেখানে হাতের কব্জিতে জোর থাকতে কেউ আদালতে যায় না। মরদরা আদালতে নালিশ করার আগে নদীতে ঝাঁপ দেবে। চেম্বারে এসে ড্রলাস প্রায়ই বলতো, "ভেরি ব্যাদ প্লেস। এভ্‌রিবদি থিফ্‌ হিয়ার, বিগ্‌ম্যান বিগ্‌ থিফ্‌।" পৃথিবীতে কাউকে সে বিশ্বাস করে না। এখানে সবাই চোর, সবাই নাকি জাহাজ কোম্পানীর টাকায় ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

মামলা দায়ের হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ক'বছর কি করা হচ্ছিলো।"

ড্রলাসের মুখ লাল হয়ে উঠলো। চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম। কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু ভাষার অসুবিধা। ইংরেজী ভালো বলতে পারে না। উত্তেজনার মাথায় সে গ্রীক ভাষার অনর্গল বকে যাচ্ছিলো। আমাদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বললে, "শয়তান কোম্পানী। দুশমন কোম্পানী। ওরা ভেবেছিল আমাকে কলকাতা থেকে সরাতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।"

আসলে, মামলা দায়ের করার কিছুদিন পরেই পুলিশের শুভদৃষ্টি তার উপর পড়লো। যুদ্ধের বাজারে বেকার বিদেশী স্বভাবতঃই সন্দেহজনক। জাহাজ কোম্পানীও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সন্দেহ-জনক গ্রীকটির দেশে ফিরবার খরচ দিতে রাজী হয়েছেন।

তখন ভালো করে সকাল হয়নি; রাস্তার আলো তখনও জ্বলছে। এলিয়ট রোডের এক অন্ধকার ঘর থেকে নিকোলাস

ড্রলাসকে তুলে নিয়ে সিকিউরিটি পুলিশের গাড়িটা সোজা খিদিরপুরে হাজির হলো। কেন তাকে বহিষ্কৃত করা হচ্ছে, ড্রলাস জানতে পারেনি। শুধু তাকে বলা হয়েছিল, তোমাকে দেশে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু দেশ কোথায়? দেশ তো নাৎসীদের হাতে। বিতাড়িত গ্রীক সরকার তখন আলেকজান্দ্রিয়াতে রাজধানী বসিয়ে দিন গুনছেন। পুলিশের মতে আলেকজান্দ্রিয়াই তার দেশ। ড্রলাস চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিল। অনুনয় বিনয়েও কিছু ফল হয়নি। অভিমানে হতভাগ্য নাবিকের চোখের কোলে সেদিন জল এসেছিল। সে জানতে চেয়েছিল, কী তার অপরাধ। সে তো চোর নয়, গুণ্ডা নয়, কোনো দোষই করেনি সে। তা ছাড়া কোম্পানীর কাছে তার অনেক টাকা পাওনা রয়েছে। তারা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুলিশ সে-সব কথায় কান দেয়নি।

গ্রীসের অস্থায়ী রাজধানীতে ড্রলাসের জন্য আরও অনেক দুঃখ তোলা ছিল। জাহাজ থেকে নামবার সঙ্গে-সঙ্গে সামরিক পুলিশ শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করলো। ড্রলাস কাকুতি মিনতি করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল সে গুপ্তচর নয়। কিন্তু সামরিক কোর্টের বিচারকরা সহজে বিচলিত হন না। এরকম ছন্নছাড়া লোক গুপ্তচর না হয়ে পারে না। অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারের অন্ধকার নিকোলাস ড্রলাসকে গ্রাস করলো।

প্রায় চার বছর পরে লৌহ-কপাট আবার উন্মুক্ত হলো। কিন্তু এই চার বছরের একদিনও ড্রলাস জাহাজ কোম্পানীকে ভুলতে পারেনি। ভুলবেই বা কী করে? পুরো চার বছর সে কাশিতে কষ্ট পেয়েছে। কাশতে-কাশতে চোখ দুটো প্রায়ই বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা হয়েছে। আর প্রতিবারই মনে পড়েছে, কোম্পানীই তার পিছনে পুলিশ লাগিয়েছে। কে জানে, তারাই হয়তো এখানে জেলের ব্যবস্থা করেছে।

মুক্তি পেয়ে ড্রলাস দেশে ফিরলো না। ফিরবার ইচ্ছা হয়নি এমন নয়, কিন্তু তাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। অন্যায়ের উত্তর না দিতে পারলে গ্রীকের জীবনে রইলো কি?

আবার কলকাতা। চার বছর আগে যে নিকোলাস ড্রলাসকে এই শহর বিদায় দিয়েছিল, সে আবার এসেছে। কোথায় আলেকজান্দ্রিয়া

আর কোথায় কলকাতা! কিন্তু কপর্দকহীন নিকোলাস যে কী ভাবে এই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেছিল জানি না।

"আমার কেসের কী হলো?" ভূত দেখলেও হাজরা ও বাসু কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার হাজরা সাহেব এমন আশ্চর্য হতেন না। কোনো মক্কেল যে বছর পাঁচেক পর হঠাৎ আবির্ভূত হতে পারে ও মামলার খবর জানতে চাইতে পারে, এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। ড্রলাস বললে, "মাই কেস্ উইথ দি শিপিং কোম্পানী। আই নত্ ঘোস্ত্।"

বাদীর অনুপস্থিতিতে মামলার অবস্থা কি হয়েছে হাজরা সাহেব জানতেন না। সে খবর যদি কেউ জানে, তিনি স্বয়ং ভগবান, কিংবা ওপাড়ার ভাষায়, যম।

আইনের চৌহদ্দি ড্রলাসের জানা নেই। জানতেও সে চায় না। কিন্তু কেন সে ক্ষতিপূরণ পাবে না? জাহাজ কোম্পানী কেন তাকে প্রতারণা করবে? এই সামান্য ব্যাপারে বাদী, বিবাদী, প্লেন্ট, রিটন্ স্টেটমেণ্টের কী প্রয়োজন, সে বুঝতে পারে না।

ড্রলাসের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠেছে। সে নিজেই আজ জজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু আজব জায়গা! নিজের কথা নিজে বলার রেওয়াজ নেই। তোমার হয়ে কথা বলার জন্য অন্য লোক গাউন পরে বসে রয়েছে, পয়সা দিলেই জজ-সায়েবকে সব বুঝিয়ে দেবে। সোজা কোর্ট-ঘরের মধ্যে ঢুকে ড্রলাস চিৎকার শুরু করে, "হোয়াত্ এবাউত্ মাই কেস্? কোম্পানী এ থিফ্ স্যার। দে সেন্ত মি তু জেল।"

কোর্ট-ঘরে আলোড়ন পড়ে যায়। চাপরাসীরা ছুটে আসে। আধময়লা শার্ট ও প্যাণ্ট-পরা ড্রলাসকে পাগল ভেবে অনেকে ভয়ে ছুটতে শুরু করে। জাস্টিস রায় নিজে চেয়ার থেকে নেমে এসে ড্রলাসকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। নিজের বক্তব্য গুছিয়ে বলার শক্তি ড্রলাসের নেই। শুধু হাতের মুঠো পাকিয়ে সে বলে, "এভরিবদি থিফ্। কোম্পানী গিভিং মনি তু এভরিবদি।" জাস্টিস রায় সেদিন এই গ্রীক নাবিকের জন্য প্রকৃত দুঃখ অনুভব করেছিলেন। না হলে এটর্নি হাজরাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন না; আর সায়েবকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে মামলা গ্রহণ করতে বলতেন না।

ড্রলাস প্রায়ই আমাদের চেম্বারে আসে। প্রথমদিকে তাকে এড়িয়ে যেতাম। সে কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতো, "হ্যাল্লো বাবু, হাউ ডু ইউ ডু?"

গ্রীক বলতে পূর্বে আমার মনের মধ্যে গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলো ভেসে উঠতো। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত নাসা, পেশীবহুল দেহ। ময়লা বেশবাসে কঙ্কালসার রক্তহীন ড্রলাসকে দেখে মনে হতো সে শুধু শিল্পীর স্বপ্নে রূপ পরিগ্রহ করেছে। ড্রলাসের তবুও আকর্ষণী শক্তি আছে। তার টানা-টানা চোখ দুটোর দিকে তাকালে অকারণে ভালবাসা জন্মায়।

ড্রলাসের প্রতি সায়েবের গভীর মমতা। দিনের পর দিন বিনা ফী-এ তাঁকে নথিপত্র তৈরী করতে দেখেছি। সায়েব বলতেন, "জলের লোকদের আমি ভালোবাসি। আমি নিজে যে সাগরজলে-ঘেরা দেশের লোক। ছোটবেলায় কত জেলে কত নাবিকের সঙ্গে ভাব করেছি, কত গল্প করেছি। ওরা বড় অসহায়। ডাঙার মানুষের প্যাঁচালো বুদ্ধির সঙ্গে পেরে ওঠে না।"

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আমি নিজেও ড্রলাসের অনেক গল্প শুনেছি। শুধু জাহাজের নয় দেশবিদেশের গল্প। নিজের গ্রামের কথা নিকোলাস প্রায়ই বলতো। তার পাড়াপড়শীরা খুব ভালো লোক। আমরা স্বচ্ছন্দে তার গ্রামে যেতে পারি, কোনো অসুবিধা হবে না। নিকোলাসের কাছ থেকে আসছি শুনলে, তারা খুব যত্ন করবে। তবে হ্যাঁ, সে যে এতো কষ্টে আছে, যেন কিছুতেই না বলি। আমি হেসে জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু কথা কইবো কী করে, গ্রীক তো জানি না। আর ও-ভাষা শিখতে গেলে তো তিনমাসে মাথায় টাক পড়ে যাবে। নিকোলাস আমাকে বোঝাতো, একদম মিথ্যা কথা। ইংরেজরা ইচ্ছা করে পৃথিবীতে এইরকম রটিয়েছে। গ্রীক খুব সোজা ভাষা, ইংরেজী থেকে অনেক সহজ। আমার শিখতে মোটেই অসুবিধা হবে না। আর না শিখলেও চিন্তা নেই। বুড়ো ইউমোফপুলাস খুড়ো গ্রামে আছেন। রেলি ব্রাদার্সে চাকরি নিয়ে পুরো পঁচিশবছর তিনি কলকাতা আর বোম্বাইয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। চোস্ত ইংরেজী বলেন। তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। ইংরেজীতে কথা বলার লোক পেলে খুব খুশী হবেন ইউমোফপুলাস খুড়ো।

ড্রলাসের এই শান্ত স্নেহমধুর রূপটাই সব নয়। অতি সহজে সে ধৈর্য হারায়। একদিনের কথা। কোম্পানীর কাছে কত টাকা দাবি করা যায় আলোচনা হচ্ছে। সায়েব বললেন, তিনবছরের বেশি মাইনে দাবি করে লাভ নেই। সঙ্গে-সঙ্গে ড্রলাস চিৎকার শুরু করলো, "কেন? আমি তো সাতবছরের মাইনে পাবো। আমাকে তো অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।" সায়েব প্রথম মৃদু হেসে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নিজের খেয়াল-খুশি মতো দাবি করা চলে না। ড্রলাস ততোক্ষণে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, "আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। সবাই চোর এখানে। কোম্পানী সব জায়গায় টাকা ঢালছে।"

কথাগুলো আর সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, "ড্রলাস, তুমি অকৃতজ্ঞ। সায়েব যে কেন অনর্থক তোমার জন্য এতো পরিশ্রম করছেন জানি না।"

গলার স্বর আরও চড়িয়ে ড্রলাস বললেন, "আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমি কি লোক দেখিনি? বিনা উদ্দেশ্যে কেউ এতো খাটে? আমি অতো বোকা নই, নিশ্চয় ভিতরে কিছু—" কথা শেষ না করেই সে ঘর থেকে সবেগে প্রস্থান করলো।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগলো। এমন অকৃতজ্ঞের জন্য সায়েব যে কেন সময় নষ্ট করেন, তিনিই জানেন।

বই থেকে মুখ তুলে সায়েব মৃদু হাসলেন। বললেন, "বেচারাকে দোষ দিই না। পৃথিবীতে স্নেহ ভালোবাসা কারুর কাছে পায়নি। কেন সে আমাকে বিশ্বাস করতে যাবে?"

তবুও ড্রলাসের ঔদ্ধত্য সেদিন ক্ষমা করতে পারিনি। ভেবেছি এমন লোকের জন্য কাজ না করাই ভালো।

কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। সায়েব ডিক্টেশন দিচ্ছেন। আমি শর্টহ্যাণ্ড খাতায় লিখছি। এমন সময় জুতোর শব্দে চেয়ে দেখলাম দরজার আড়ালে ড্রলাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধীরে-ধীরে ভিতরে প্রবেশ করে সে ঘাড় নিচু করে দাঁড়ালো। অপরাধী ছাত্র যেমন করে শিক্ষকের সামনে আসে, সেও তেমনি পা ঘষতে-ঘষতে কাছে এগিয়ে এসে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। সায়েব মুখ তুলে

বললেন, "হ্যাল্লো ড্রলাস।" মুখ নিচু রেখেই ড্রলাস কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে, "স্যার, আই এম সরি। ইউ নত্ ব্যাদ ম্যান। আই এম সরি।" তারপর আচমকা সবাইকে বিস্মিত করে সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আশ্চর্য মানুষ," দরজার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সায়েব বললেন।

পরের দিন ড্রলাসের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে সে আবার বলেছে, "হ্যাল্লো বাবু, হাই ডু ইউ ডু।" আগের দিন যেন কিছুই ঘটেনি।

সায়েবের ঘরে অন্য মক্কেল ছিল। ড্রলাসকে আমার সামনের চেয়ারে বসতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম চা আনাবো কিনা। অনেক অনুরোধের পর সে রাজী হলো। চা-এর কাপে চুমুক দিতে-দিতে কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ ড্রলাস, এখন কি করে চলছে ?

"ওয়ান লোফ্ ফর লাঞ্চ এণ্ড ওয়ান লোফ্ ফর দিনার," ড্রলাস উত্তর দিলে।

"মাঝে-মাঝে ডকে জাহাজের অফিসারদের ফাই-ফরমাশ খেটে দিই, মাসে বারো তেরো টাকা হয়। তাছাড়া তুমি তো জানো, সায়েব কিছু-কিছু···।" আমি অবশ্য জানতাম না। বুঝলাম তিনি সেটা গোপন রেখেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ ড্রলাস, এতো কষ্ট কেন সহ্য করছো ? চেষ্টা করলেই তো অন্য একটা জাহাজে চাকরি যোগাড় করতে পারো।"

দাঁতে দাঁত ঘষতে-ঘষতে ড্রলাস আমার দিকে তাকালো। মনে হলো সন্দেহ করছে, কোম্পানী হয়তো আমাকেও টাকা দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে সে বললে, "তুমি কি বলতে চাও শয়তানকে শাস্তি না দিয়েই চলে যাবো ? সে হবে না। বছরের পর বছর তারা আমাকে ঘুরিয়েছে, আমাকে চালান করেছে, জেলে পাঠিয়েছে। আমি ওদের ছেড়ে দেবো ? তাছাড়া মামলা তো শীঘ্রই কোর্টে উঠবে।"

মামলার দিন নির্ধারণ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। স্বয়ং দেবতারাও

এখানে অক্ষম ! মামলা দায়ের করে, আপনি পায়ে হেঁটে পৃথিবী ভ্রমণে বেরুতে পারেন। হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিব্বত ও চীন পরিভ্রমণ সমাপ্ত করুন। তারপর সাহারায় বছরখানেক কাটিয়ে, সোজা দক্ষিণে চলে যান। উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরুও বেড়িয়ে আসতে পারেন। ফিরে এসে দেখবেন, অপরপক্ষ আজ পেটের ব্যথা, কাল মেয়ের বিয়ের অজুহাতে তখনও দিন নিচ্ছেন।

ড্রলাসের মামলায় এই সত্যের নিদারুণ উপলব্ধি হলো। তাড়াতাড়ি শুনানির যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ফল হয়নি। প্রায়ই নানান অজুহাতে দিন পিছোয়। রুক্ষ চুল, মলিন মুখে ড্রলাস এসে দাঁড়ায়। যখন শোনে আবার দিন পড়েছে, সমস্ত মুখটা যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ড্রলাসের এই ভয়াবহ রূপ আমাকে অনেকবার দেখতে হয়েছে।

একদিন কিন্তু সে বোমার মতো ফেটে পড়লো। "এগেন দেত্। অল থিফ্ হিয়ার। এভরিবদি তেকিং মনি ফ্রম কোম্পানী।" সায়েবের শরীর ক'দিন ভালো যাচ্ছিল না। রাগতস্বরে আমাকে বললেন, "কবে এই নাবিকটার হাত থেকে উদ্ধার পাবো, বলতে পারো শংকর ?"

"আচ্ছা, আচ্ছা দেখা যাবে।" বলে ড্রলাস জোরে দরজা ঠেলে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার টেবিলের সামনে বসলো। তারপর কাগজে ঘষঘষ করে কি যেন লিখলো। কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, "দেখে রাখো, আমিও চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

বারকয়েক চেষ্টা করেও পাঠোদ্ধারে অক্ষম হলাম। বুঝলাম, এটা নির্ঘাত গ্রীক ভাষা। ফেরত দিয়ে বললাম, "মিস্টার ড্রলাস আম গ্রীক বুঝি না। আর এই চত্বরে কেউ বোঝে বলেও জানি না।" রাগতস্বরে ড্রলাস বললে, "তুমি কি বলতে চাও জজরাও গ্রীক জানে না ?" আমিও শ্লেষের সুরে বললাম, "এটা গ্রীস নয়, তবে জজরা যদি মিস্টার নিকোলাস ড্রলাসের জন্য গ্রীক শিখে থাকেন, জানি না।" কথাটা বলেই লজ্জা অনুভব করলাম। বেচারাকে আঘাত দেওয়া উচিত হয়নি। ড্রলাস আমার মুখের দিকে অসহায়ভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপর নিজের মনে বিড়বিড়

করে বলতে লাগলো, "আমি যে ইংরেজী জানি না। জানলে চীফ জাষ্টিসকে লিখতাম। আর লিখেই বা কি হবে! সেখানেও কোম্পানী কি যায়নি?" কাগজটা পকেটে পুরে যথাসম্ভব জোরে মাটিতে পা ঠুকতে-ঠুকতে সে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে ড্রলাস আবার হাজির। হাসিমুখে বললে, "হ্যালো বাবু, হাউ ডু ইউ ডু।" গতকালের ঘটনা যেন সে ভুলে গিয়েছে। অন্যদিন অপেক্ষা আজ তাকে অনেক হাসিখুশি দেখাচ্ছে। জামাকাপড়গুলো ধোপভাঙা।

"বাবু, আমার সঙ্গে একবার আসবে?" জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" "সেটা পরে জানতে পারবে। এখন চলো।" প্রায় জোর করেই ড্রলাস আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললো। তার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্য বলতে কি, একটু ভয় হলো। যে রকম লোক, সব কিছুই করা সম্ভব। লিফ্‌ট থেকে নামলাম। টেম্পল চেম্বার থেকে বেরিয়ে আমরা ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীট ধরে হাঁটতে শুরু করলাম! আমার ভয় আরও বাড়ছে। হঠাৎ কাঁধে ড্রলাসের হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। "বাবু আমার জন্য তোমাকে খুব খাটতে হচ্ছে, না?"—ড্রলাসের স্নেহভরা কণ্ঠস্বর।

যেখানে এসে আমরা থামলাম, সেটি এক রেস্তোরাঁ। খাবারের অর্ডার দিয়ে ড্রলাস গুণগুণ করে গান ধরলে। আমি তখনও কিছু বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ সে বললে, "আশ্চর্য লাগছে? কিন্তু আজ যে ২০শে নভেম্বর, আমার ছেলের জন্মদিন। দেশে থাকলে কত আনন্দ হতো। নয়, দশ, এগারো···হ্যাঁ সে বারো বছরেই পা দিলো।" চায়ের কাপে মুখ দিতে গিয়ে ড্রলাস চমকে উঠলো। কাপটা একটু সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু ওরা বেঁচে আছে তো? এতো বড়ো যুদ্ধে সব হয়তো লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। সাতবছর কোনো খবর পাইনি। আচ্ছা বাবু, তোমার কি মনে হয়? আমার ছেলে, তার মা, ওরা বেঁচে আছে?"

কী উত্তর দেবো? ঘরছাড়া হতভাগ্য নাবিক, দীর্ঘ সাতবছর প্রিয়জনের সঙ্গসুখে বঞ্চিত। জীবনের-মরুভূমিতে নিজেকে রক্ষা করতেই সে ব্যস্ত। স্ত্রী-পুত্রের জন্য চিন্তার অবসর নেই। তবুও

মাঝে মাঝে ক্যালেণ্ডারের একটা বিশেষ দিন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় ঘরের কথা, সন্তানের কথা।

বললাম, "নিশ্চয় বেঁচে আছে। হয়তো এতোদিনের মাস্টার ড্রলাস অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে।"

"হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু যাই বলো, প্রথম যখন দেখা হবে তখন ভারি মজা হবে।"

বিরহী ড্রলাসের মন কোন্ সুদূরে চলে যায়। কল্পনার পটে হয়তো আগামী দিনের কথা জেগে ওঠে। মামলায় জিত হয়েছে। অনেক টাকা নিয়ে সে নিজের গ্রামে একটা দোকান করে বসেছে। পাড়ার লোকেরা গল্প শুনতে আসে। নিউইয়র্ক শরটা কেমন; এডেন ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে কোনটা ভালো, ইণ্ডিয়া, সেই ইণ্ডিয়া যেখানে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে গিয়েছিলেন, তার এখন কী অবস্থা! কলকাতা শহর, জাহাজ কোম্পানী, ইংরেজ ব্যারিস্টার আরও কত কি···

দু'টাকার বিল্ এল। ড্রলাসের কয়েকদিনের খাবার খরচ। ভাবলাম, নিজেই পয়সাটা দিই। মন বললে, না, ছেলের জন্মদিনে, পিতার গর্ব ক্ষুণ্ণ করবার অধিকার তোমার নেই।

অবশেষে জানুয়ারীর গোড়ারদিকে মামলার দিন পাকাপাকি-ভাবে নির্ধারিত হলো। জাস্টিস রায় কথা দিয়েছেন, ড্রলাসের মামলা দিয়ে নতুন বছরের কাজ আরম্ভ করবেন।

বড়োদিনে সেবার সায়েবের রাণীক্ষেতে যাবার কথা ছিল। মেমসায়েব আগেই চলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি যাওয়া স্থগিত রাখলেন। ছুটির পরই মামলা। শক্ত কেস, উপরন্তু কোনো জুনিয়র নেই।

কথায়-কথায় সায়েবকে জিজ্ঞাসা করলাম, বড়োদিনের উৎসবে এবার কে কে আসবেন? সায়েব হাসলেন, "তুমি জানো, এককালে আমি যুদ্ধ করতাম।"

"হ্যাঁ জানি, এলবামে অনেক ছবি দেখেছি!"

"এবার বড়োদিনে একজন যোদ্ধাকে নিমন্ত্রণ করছি। মস্ত যোদ্ধা।"

নাম জানতে চাইলাম। সায়েব আবার হাসলেন। "ইলিয়ড, অডিসির গল্প পড়েছো? হোমারের অমরকাব্যের মহানায়ক ইউলিসিস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত। শত্রু সংহারের জন্য দেশত্যাগী হলেন তিনি। পিছনে পড়ে রইলো প্রিয়া, পড়ে রইলো সাধের সংসার। অতিক্রান্ত হলো বহুবর্ষ। নানা দেশের আকাশে উড়লো তাঁর বিজয়কেতন। ইউলিসিস ক্লান্ত শ্রান্ত। জায়াচিন্তায় মগ্ন। কিন্তু অভিযান এখনও শেষ হয়নি। অনেক বাকি। এখনো সময় হয়নি নিকট।

ইউলিসিসকে কেন্দ্র করে ছোটোবেলায় অসংখ্য স্বপ্ন রচনা করেছি। ভেবেছি তাঁর সাক্ষাৎ পেলে খুব মজা হবে। কিন্তু দেখা হয়নি। আজ এতোদিন পরে এই বৃদ্ধবয়সে তাঁর দেখা মিলেছে। তিনি আজও প্রবাসী, গৃহহারা। বড়োদিনে তিনিই আমার একমাত্র অতিথি। তাঁর নাম নিকোলাস ড্রলাস।"

বড়োদিনের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আমি ড্রলাসের কাছে যাবো। সায়েব বললেন, "যাবার পথে আমার একটা শার্ট, একটা প্যাণ্ট ও একটা টাই নিয়ে যেও, দেওয়ান সিংকে বলা আছে। আর ড্রলাসকে বলো, এগুলো না নিলে আমি দুঃখিত হবো।"

সেদিন শনিবার। প্রায় দুটো বাজে। ড্রলাসের ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠলো। হাফপ্যাণ্ট ও গেঞ্জি পরে ঘরের এক কোণে ড্রলাস খেতে বসেছে। সামনের পুরনো খবরের কাগজের উপর একটা পাঁউরুটি ও খানিকটা চিনি! কাপড়ের বাণ্ডিল ও চিঠিটা তার হাতে দিলাম। সে কথা বলতে পারলে না। শুধু কৃতজ্ঞতায় আমার হাত চেপে ধরলে।

বড়োদিনের লাঞ্চ-টেবিলে সেবার আমিও উপস্থিত ছিলাম। ধোপদুরস্ত স্যুট পড়েছে ড্রলাস। সিগারেটের টিন এগিয়ে দিয়ে সায়েব বললেন, "মিঃ ড্রলাস, তুমি আমার অতিথি। কোনোরকম লজ্জা করলে চলবে না।" খাওয়ার আগে মদ এল। লাল গ্রীক মদ। যথারীতি গ্লাশ উপরে তুলে সায়েব বললেন, "নববর্ষে আমার একান্ত প্রার্থনা নিকোলাস ড্রলাসের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হোক।" অভিভূত ড্রলাস ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো! অনেক কালের রোদে-পোড়া মাটিতে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে।

বছরের গোড়াতেই মামলা শুরু হলো। কঠিন মামলা। জাহাজ কোম্পানী নামজাদা ব্যারিস্টার দিয়েছেন। আইনের সামান্যতম খুঁটিনাটি নিয়ে বাক্যযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যার জন্য তু'পক্ষই অসংখ্য নজির দেখালেন। জাহাজের মালিক স্প্যানিশ, কিন্তু জাহাজের রেজেস্ট্রি আর্জেন্টিনায়। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ও চুক্তি ভেঙেছে ভারতবর্ষে।

পুরো পাঁচদিন মামলা চললো। পঞ্চম দিনের শেষে সায়েবকে চিন্তিত মনে হলো। গাউন হাতে করে হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছিলেন। শীতের দিনেও তাঁর কপালে ঘাম জমে উঠেছে। ঐতিহাসিক সিঁড়ি। শতাব্দী ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য আইন যোদ্ধারা এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন ও নেমেছেন। এতো শুধু ন্যায়ের মন্দির নয়, ন্যায়ের তুর্গও বটে। মানুষের অধিকার রক্ষার সদাজাগ্রত প্রহরী।

রেড্ রোড ধরে গাড়ি ছুটছিল। শীতের অপরাহ্ণ। পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য সবেমাত্র বিদায় নিয়েছে। ছমছমে ভাব। দিনের শেষে ক্লান্ত পাখির দলও বাসা অভিমুখে চলেছে। দিগন্ত পানে তাকিয়ে সায়েব বললেন, "প্রাচীন যুগে এমন সময়ে যুদ্ধ বিরতির বিউগল বেজে উঠতো। নিকোলাস ড্রলাসের যুদ্ধও শেষ করে এলাম। ফলাফল অনিশ্চিত।"

রায়ের দিনে সায়েব কোর্টে গেলেন না। পরিবর্তে জুনিয়র মিস্টার মজুমদারকে পাঠালেন। ড্রলাসকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোর্টে গেলাম। কোর্ট-রুমে বেশ ভিড়। ড্রলাস গম্ভীরমুখে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। তার পাশে বসতে সাহস হলো না। কে জানে রায় শুনে কী করে বসবে। মিনিট কয়েক পরেই ঘরের কোণে পর্দা সরে গেল। জাস্টিস রায় আসছেন। বুকের মধ্যে দপ-দপ করছে

নিকোলাস ড্রলাসের জয় হয়েছে। আনন্দের আতিশয্যের বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে পড়লাম, কিন্তু ড্রলাস কোথায়? সে ততোক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। তাকে সামলাতে আমিও পিছন-পিছন ছুটলাম। ড্রলাসের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গাড়ি-ঘোড়ার তোয়াক্কা না করে রাস্তা পেরিয়ে সে টেম্পল

চেম্বারের উপর উঠছে। যেন ম্যারাথন দৌড়। যুদ্ধে জয় হয়েছে জয়বার্তা নিয়ে চলেছে গ্রীক বার্তাবহ।

চেম্বারে যখন হাজির হলাম, সায়েব তখন খবর পেয়ে গিয়েছেন। শুনতে পেলাম ড্রলাস বলছে, "আই এম সো সরি স্যর। এভরিবদি নত্ থিফ্।"

সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "যুদ্ধে জয় তো হলো। এখন কী করবে?"

আনন্দের আতিশয্যে প্রায় নাচতে-নাচতে ড্রলাস বললে, "টাকা পেলেই দেশে ফিরবো। তার আগে বউকে টেলিগ্রাম পাঠাবো, আমি বেঁচে আছি। শীঘ্র দেখা হবে।"

মিঃ মজুমদার কিন্তু গম্ভীরমুখে ফিরলেন। আড়ালে সায়েবকে ডেকে কী সব বললেন। সায়েবের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। এক মুহূর্তে জয়ের আনন্দ কোথায় হারিয়ে গেলে। কোম্পানী রায় মানবে না, তারা আপীল করবে। অর্থাৎ আরও দু'বছর।

চোখের নিমেষে ড্রলাস কি যেন করে বসলো। তার হাতের কাঁচের গ্লাশ মেঝেতে আছড়ে পড়লো। ঝন-ঝন করে শব্দ। ড্রলাস নেই। চারিদিকে ভাঙা কাঁচের টুকরো।

ঘরের মধ্যে থমথমে বিশ্রী গুমোট। ভাঙা গ্লাশের টুকরো-গুলোর দিকে সায়েব কয়েকবার বিষণ্ণমুখে তাকালেন। একটা কথাও বললেন না। চারটের অনেক আগে ক্লাবে ফিরে গেলেন। বিকেলের ট্রেনে মাদ্রাজ যেতে হবে। সেখানে জরুরী কেস্ আছে।

দিন দুই পরের কথা। চেম্বারে বসে আছি। সায়েবের অনুপস্থিতিতে বিশেষ কাজ নেই। টেলিফোন বেজে উঠলো। নিকোলাস ড্রলাস ফোনে সায়েবের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।

"তারা আবার এসেছে আমাকে ধরতে। আমাকে এখুনি তারা ধরে নিয়ে যাবে। সায়েবকে একটিবার ফোন ধরতে বলো, প্লীজ।"

আমাকে বলতে হলো, সায়েব এখানে নেই, মাদ্রাজ গিয়েছেন। টেলিফোনেই তার ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ পেলাম। আর কথা বলবার আগেই ফোনের সংযোগ কেটে গেল।

একসপ্তাহ পরে সায়েব ফিরলেন। সব বললাম তাঁকে।

সিকিউরিটি পুলিশকে ফোন করে তিনি ড্রলাসের সংবাদ জানতে চাইলেন। উত্তর এল, নিকোলাস ড্রলাস নামে এক গ্রীককে বিশেষ ক্ষমতাবলে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

ফোন নামিয়ে রেখে সায়েব শুধু বললেন, "হুঁ।"

সেই শেষ, এরপর নিকোলাস ড্রলাসের আর কোনো খবর পাইনি। বিশাল পৃথিবীর বৃহৎ জনারণ্যের কোথায় সে মিশে গিয়েছে কে জানে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না এ-কথা ভাবতেই পারি না। নিকোলাস ড্রলাসকে আমি জানি। সে আবার আসবে। আবার সে ছুটবে কোম্পানীর পিছনে।

"হ্যাল্লো বাবু, হাউ ডু ইউ ডু?" ড্রলাসের মুখ থেকে সেই অতিপরিচিত ডাক শোনবার প্রতীক্ষায় আছি।

কত অজানারে জানবার সুযোগ দুর্লভ, সন্দেহ নেই। এক পরম পুণ্য লগ্নে টেম্পল চেম্বারে এসেছিলাম। দেখতে পেয়েছি জীবনের এক মহা ঐশ্বর্যময় দিক। কোনো পরিশ্রম, কোনো অনুসন্ধান না করে আকস্মিক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। যেন আনমনে হাঁটার পথে আচমকা হোঁচট খেয়ে চেয়ে দেখলাম, পায়ের কাছে কলসী বোঝাই মোহর। আনন্দে লাফিয়ে উঠেছি। জমা হয়ে রয়েছে অসংখ্য জীবনের আখ্যান। গতানুগতিকতার নুড়ি পাথরের স্তূপে হীরের মতো চকচক করছে বৈচিত্র্য ও সংঘাতময় জীবন।

গল্পকার বা শিল্পী নই আমি। মামুলি পড়াশুনা, সাধারণ কৌতূহল আর আটপৌরে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এ-পাড়ায় এসেছিলাম। তাই মহত্তর মানবতা বা চিরন্তন মানুষের কোনো সত্য, যাদের দেখেছি, তাদের মধ্য থেকে নিংড়ে আনতে পারিনি। কিন্তু যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে অজানা অচেনা মানুষের অন্তহীন শোভাযাত্রা বিস্মিত ও অভিভূত চিত্তে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তার ছাপ আজও মনের মধ্যে অটুট রয়েছে। সংসারের অসংখ্য ধোয়ামোছাতেও সে স্মৃতি আজও অস্পষ্ট হয়নি।

রাণী মীরা, ব্যারিস্টার বোস, শ্রীমতী সুনন্দা, মিস্, ট্রাইটন, হেলেন, গ্রুবার্ট, নিকোলাস ড্রলাসদের একদিন যতো নিকট থেকে ছেখেছিলাম, আজ তাঁরা ততোদূরে সরে গিয়েছেন। আমার স্মৃতির এলবামে পরম যত্নে তাঁদের ছবি সাজিয়ে রেখেছি। সব ছবিই হয়তো সমান উজ্জ্বল নয়। কিন্তু আমার কাছে প্রতিটি ছবির এক বিশেষ মূল্য আছে। হৃদয়ের সঙ্গে স্মৃতির আঠায় তারা যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

সব ক'টি কিন্তু আইনের গল্প। তবে ভরসা এই যে, ব্যারিস্টারের বাবুর কাছে লোকে আইনের গল্পই আশা করে। আমিও করতাম একদিন। ছোকাদা ও জগদীশবাবুকে চেপে ধরতাম, গল্প শোনাও। উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নি, জজ, সাক্ষী, মক্কেলের গল্প বলো। তাঁরা বলতেন, আইনের গল্প, সব সময় ভালো লাগে না। মাঝে-মাঝে ঘরসংসারের আলোচনা করে মুখ পালটিয়ে নিতে হয়।

তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আইনটা মুখ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। যাদের জন্য আইন তারাই প্রধান। এতোদিন ছিলাম ও-পাড়ায়, এক বিন্দু আইন শিখিনি, কিন্তু জীবনের অনেক শিক্ষা লাভ করেছি। আইনের বিশ্লেষণ জজ-ব্যারিষ্টারদের জন্য তোলা থাক। যা দেখেছি মানুষের মাঝে আমি তাতেই ধন্য। বিচারে গলদ কোথায়, কম খরচে আরও দ্রুত মামলা ফয়সালা করা যায় কিনা, পণ্ডিতরা চিন্তা করবেন। ছোকাদার ভাষায়, আমরা জিঞ্জার মার্চেণ্ট, জাহাজের খবরে লাভ নেই।

কিন্তু নদীর ধারে দাঁড়ালে আদার ব্যাপারীও যেমন মাঝে-মাঝে জাহাজ দেখতে পায়, সায়েবের সান্নিধ্যে আমিও তেমনি মাঝে-মাঝে আইনকে দেখেছি। নেপথ্য থেকে প্রত্যক্ষ করেছি বিচার-নাট্য। কোন্ ফাঁকে মক্কেলের জয় পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি নিজের সুখ দুঃখ। আমি তো কেবল বাবু, কিন্তু আমারও গোঁ চেপে গিয়েছে জিততে হবে। যে কোনোপ্রকারে আমাদের মক্কেলের জিত চাই।

ওল্ড পোস্ট আপিস "স্ট্রীট থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে আজ যখন পুরনোদিনের হিসেবনিকেশ করি, প্রশ্ন জাগে আমাদের সব

মক্কেলদের দাবিই কি ন্যায়সঙ্গত ছিল ? অপরাধ তাঁদের কেউ-কেউ নিশ্চয় করেছেন। সুতরাং পরোক্ষভাবে অন্যায়ের সমর্থন করছি।

মনে পড়েছে, সায়েব একদিন এ-প্রশ্নের বিশ্লেষণ করেছিলেন। বলেছিলেন, "মার্শাল হলের নাম শুনেছো নিশ্চয়—বিলেতের সর্বযুগের খ্যাতি-সম্পন্ন ফৌজদারী ব্যারিস্টার। তিনি বলতেন, All my geese are swans—আমার সব কানা ছেলেই পদ্মলোচন। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতেন তিনি। ব্রীফ হাতে করলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতো, মক্কেল নিরপরাধ।

কেবল মার্শাল হল নয়, সব আইনযোদ্ধার ক্ষেত্রে এটি সত্য।"

সকলে পারে না। কিন্তু সায়েব পারতেন। ব্যারিস্টার হয়েও নিস্পৃহভাবে হাইকোর্টের জীবনকে বিচার করতে পারতেন। তিরিশ বছর ধরে তিনি দেখেছেন হাইকোর্টকে। কাজ করেছেন। কত কেস্ এল। বিচার হয়েছে, জজরা রায় দিয়েছেন, ল-রিপোর্টের পাতায় তার খানিকটা ইতিহাস বন্দী হয়েছে। আর কিছুটা আছে সায়েবের মনে।

বলতে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু বোঝবার বিদ্যে আমার ছিল না। তবু সময় পেলেই আমাকে বলতেন আমিও শুনতাম।

বেলা পড়ে আসছে। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে যে দীর্ঘ সুঠাম দেহ নিয়ে সায়েব একদিন টেম্পল চেম্বারে এসেছিলেন, সে-দেহ আর নেই। জীবন-সায়াহ্নে দেহ দুর্বল হচ্ছে। ব্যাধি নয়, জরার আক্রমণে। মন কিন্তু পূর্বের মতো সরল, অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ। অনেকদিন থেকে তাঁকে দেখছি। পরিবর্তন আসছে কোথাও। অতীতের কাহিনী বলতে পূর্বে এতো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ঠিক ধরতে পারি না, হয়তো আমার মনের ভুল।

কেননা, মাঝে-মাঝে তিনি কৌতুকে উছলে ওঠেন। কখনো বলেন, "চলো, পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি।"

গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করি। খেয়াল-বশে হাতের ছড়িটা মাঝে-মাঝে মাটিতে ঠোকেন। একদল স্কুলের ছেলে ফুটবল খেলছে। দু'দিকে ইট দিয়ে গোল তৈরি হয়েছে! সায়েব দাঁড়িয়ে পড়েন। বল্লেন, "বিনা পয়সায় ফুটবল খেলা দেখা যাক।"

বল নিয়ে ছেলেরা ছুটছে। একজনের পা থেকে বল কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে অন্য একজন। আনন্দে একহাতে তিনি মাটিতে ছড়ি ঠোকেন, অন্য হাতটি রাখেন আমার কাঁধে।

আমরা আরও এগিয়ে যাই। ছেলেরা খেলছে দলে-দলে। বললেন, "আমারও ওদের দলে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। ছোটোবয়সের খেলায় অনেক আনন্দ।"

দমকা-হাওয়ায় মাথার চুলগুলো উড়ছিল। তাদের সংযত করে কিছু বলার আগেই, তিনি বললেন, "চলো, এবার ফেরা যাক।"

ফেরার পথে বিশেষ কথা হয় না। শুধু তিনি এক ফাঁকে জানিয়ে দেন, "ডবল চা খেতে হবে আজকে।"

চা-এর টেবিলে দেওয়ান সিংকে ডাক দিয়ে বললেন, "আজকে বেজায় খিদে লেগেছে।"

টোস্টে মাখন লাগিয়ে তার উপর খানিকটা জেলি ছড়িয়ে দেন। "এই মাখন আর জেলি নিয়ে, আমার বাবা ও মায়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া লাগতো। মা বলতেন, হয় মাখন না হয় জেলি নাও। গেরস্তর সংসারে দুটো চলে না। বাবা বলতেন, ঠিক বলেছো। তবে জেলি ও মাখন আলাদা খেলে দুটো টোস্ট লাগতো। আমি একটাতে কাজ সারছি। সুতরাং তোমার খরচ এতে আরও কম হচ্ছে। লম্বা বেণী হাতে পাকাতে-পাকাতে মা রেগে উঠতেন।"

"বেণী? ইংলণ্ডে মেয়েরা বেণী রাখে?"

"এখন বব ছাঁট। কিন্তু আমাদের মায়েরা সেকেলে মানুষ, তাঁরা ইয়া বড়ো-বড়ো বেণী রাখতেন।"

চা খেয়ে উঠে পড়লাম।

কয়েকদিন পরে চেম্বারে সায়েব বললেন, "আজকাল সকালে রোজ বেড়াতে যাচ্ছি।"

"কেমন লাগছে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"খুব ভালো, শরীরটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের হাওয়ায় বেশ চাঙা হয়ে ওঠে।"

শুনে আনন্দিত হয়েছি। হাঁটা-হাঁটিতে শরীরটা আরও ভালো থাকবে।

কেস্ ছিল না সেদিন। একটার সময় চেম্বার থেকে তিনি চলে গেলেন। আমাকে বললেন, "ঠিক সাড়ে চারটেতে ক্লাবে এসো, জরুরী কাজ আছে।"

সকাল-সকাল বাড়ি ফিরবো ভেবেছিলাম। কিন্তু হবে না। নিশ্চয় কোনো নতুন কেস্ আসছে।

ঠিক সাড়ে চারটাতে হাজিরা দিলাম। ঘরে ঢুকতেই সায়েব বললেন, "আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

একটা রোগা ছেলে ময়লা জামা ও হাফ্‌প্যাণ্ট পরে চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটা রঙীন ছবির ম্যাগাজিন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে আবার ছবি দেখতে লাগলো।

যখন সায়েব বললেন, এই ছেলেটির জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তখন ভয়ঙ্কর রাগ হলো। ইংরেজী ভালো বোঝে না, আমাকে দোভাষীর কাজ করতে হবে।

জরুরী কাজের এই নমুনা! মনের মধ্যে রাগ গুমরে উঠছিল। বাজে লোকের জ্বালাতনে বিরক্ত হয়ে উঠছি। দিনকয়েক আগে চেম্বারে মিসেস বার্ড এসেছিলেন। সঙ্গে গোটাতিনেক বাচ্চা। মিস্টার বার্ড লরি ড্রাইভার। মদের ঝোঁকে ছিল সেবারে, লরির তলায় একটা ছেলে চাপা পড়লো। ছ'মাসের জেল। সায়েব আপীল করেছিলেন কিছু হয়নি। স্বামী জেলে, মিসেস বার্ড চেম্বারে এসে বসে থাকেন। সংসার চলে না। একটা ছেলে কোলে শুয়ে থাকে। আর দুটো বেজায় ছটফটে। বড়োটা টাইপরাইটার নিয়ে খট্‌খট্ করতে আরম্ভ করে। তাকে আটকাতে গেলে, ইতিমধ্যে অন্যটি র‍্যাক থেকে কাগজ বার করে ছিঁড়তে আরম্ভ করে। সায়েবকে বলেছি, কিন্তু তিনি খেয়াল করেন না।

"ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বেড়াচ্ছিলাম, ও এসে আমার ছড়ি ধরে টানছিল। কথা বুঝতে পারিনি, তাই আজকে আসতে বলেছি।" সায়েব বললেন।

নাম বাসুদেব ধাড়া। বয়স পনেরো, দেখলে মনে হয় এগারো। শীর্ণ দেহের উপর মোটা মাথা, ঠিক যেন কাঠির ওপর আলুর দম। প্রশ্নোত্তরে জানলাম, যশোর জেলায় বাড়ি। এখানে এক দর্জির দোকানে জামায় বোতাম লাগায় এবং পরিবর্তে দু'বেলা খেতে

পায়। থাকে আরও বড়ো জায়গায়—নিউ মার্কেট! দর্জির ব্যবসা ভালো চলছে না, তাই তাড়িয়ে দিয়েছে।

শুনে সায়েব বললেন, "হুঁ।"

তিনি মিনিটখানেক ভাবলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু বড্ড রোগা। অল্ রাইট। ক্লাবের মেশিনে ওর ওজন নিয়ে এসো।"

"চাকরি খুঁজছে ও। ওজনে কী হবে।"

"না-না, ওজন নিয়ে এসো। আমার প্ল্যান আছে।"

"বাহাত্তর পাউণ্ড।"

"ওনলি বাহাত্তর। সকালে···না সকালে হবে না। বিকেলে তুমি রোজ চা খেতে আসবে। ওজন বাড়াতে হবে।" তিনি বাসুদেবকে বললেন।

"চা খেলে ওজন বাড়ে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না-না, যতোদিন না বিরাশি পাউণ্ড হচ্ছে বাটার ও জেলিটা আমরা খাবো না।

মুখ কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, "ঠিক করে ফেলেছি। ওজন না বাড়লে অন্য কোনো চিন্তা করবো না।"

বাসুদেব রোজ বিকেলে চা খেতে আসে। যাবার সময় সায়েব তাকে একটা টাকা দেন। রবিবার দেখা হয় না বলে, শনিবার দু'টাকা দেন।

এক শনিবারে ক্লাবে গিয়েছি। দেড়টা বাজে। বাসুদেব বসে আছে। সায়েব লাঞ্চে গিয়েছেন।

একটুপরে তিনি ফিরলেন। দরজাটা বন্ধ করে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তিনি বললেন, "চুপ।"

সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ফিস্-ফিস্ করে বললেন, "বামাল-সমেত পালিয়ে এসেছি। ধরতে পারেনি।"

ভয় পেয়ে গেলাম। বামাল! মানে?

বললেন, "পকেটেই আছে।" তারপর পকেট থেকে একটা আপেল বার হলো। "লাঞ্চ টেবিলে ডিসে দেওয়ামাত্রই চারিদিকে আড়চোখে তাকিয়ে টপ' করে সরিয়ে ফেলেছি।" আপেলটা বাসুদেবকে দিয়ে বললেন, "ঠিক হ্যায়, দু'মিনিটে বেমালুম গায়েব করে দাও আপেলটা।"

হাসতে-হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গিয়েছিল।

"খবরের কাগজ বিক্রি করবো ভাবছি," বাসুদেব একদিন সায়েবকে বললে।

বেজায় খুশি তিনি। "এই তো চাই। চেষ্টা না থাকলে কিছু হয় না।"

জামা জুতো কিনে দিলেন। "স্মার্ট না হলে কেউ কাগজ কিনবে না।"

প্রথমদিন বাসুদেব মুখ শুকনো করে ফিরলো। সারাদিন মাত্র দু'খানা বিক্রি হয়েছে। কাপে চা ঢাললেন সায়েব, বেশি করে দুধ মিশিয়ে বাসুদেবের দিকে এগিয়ে দিলেন। "প্রথম দিনে দু'খানা বিক্রি খারাপ নয়। তোমার কি মত?" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"মন্দ নয়। ক্রমশঃ বাড়বে", উত্তর দিলাম।

কিভাবে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো। আধ ঘণ্টা ধরে তিনি বাসুদেবকে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু কিছুতে পাঁচখানার বেশি বিক্রি হয় না। চা-এর টেবিলে বাসুদেবের বিক্রির সংখ্যা জানবার জন্য আমরা অধীর হয়ে বসে থাকি। "আজ ক'খানা?"

"চারটে।"

শুনে আমার মুখের দিকে তিনি তাকালেন। কপাল কুঞ্চিত করে বললেন, "কাল রাত্রে ভাবছিলাম। এতোদিনে কারণটা বুঝতে পেরেছি।"

"কি কারণ?"

"মোজা দরকার। আরও স্মার্ট হতে হবে, তবে বিক্রি বাড়বে।"

হাসি চেপে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো।

আসল গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে অনেক কাগজওয়ালার ভিড়। নতুন লোককে তারা ভালো চোখে দেখে না। চোখ রাঙায়, অকারণে তেড়ে যায়। সায়েব কিন্তু নিরুৎসাহ হন না। বিকেলে চা-এর কাপ সামনে রেখে অপেক্ষা করেন। ক্রিকেট টেস্টের খবর নেওয়ার মতো ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করেন, "হাউ মেনি?"

শরীর ভালো যাচ্ছে না তাঁর। একমাসে দু'বার অসুখে পড়লেন। সম্পূর্ণ সেরে না উঠতেই মাদ্রাজ যেতে হবে। সেখানে একটা মামলা অনেকবার নানা অজুহাতে পিছিয়ে, এবার পাকা দিন পড়েছে।

যাবার আগে বাসুদেবকে দশটা টাকা দিয়ে তিনি বললেন, "দশদিন পরে ফিরছি।"

মালপত্রের লগেজ কম নয়। দু'ট্রাঙ্ক বই নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গেলাম। মাদ্রাজ মেল ছাড়তে দেরি আছে। সঙ্গে দেওয়ান সিং যাচ্ছে। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় সায়েব বই পড়তে লাগলেন। আমি তাঁর ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। কোন্ ফাঁকে জানলা দিয়ে দৃষ্টি বাইরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বুঝলাম আমার দিকে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন। বইটা মুড়ে পাশে রেখেছেন। চোখ নামিয়ে নিলাম।

"সাবধানে থেকো। চেম্বারের খবরাখবর আমাকে লিখো। আমিও চিঠি দেবো।"

মাদ্রাজ মেল ছেড়ে দিলো। শেষ বগিটার পেছনের লাল আলোটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

চেম্বারে রোজ যাই। বেয়ারাকে সেখানে বসিয়ে হাইকোর্টে যাই। বার-লাইব্রেরীর সামনের বেঞ্চিতে বসে গল্প করি। বেঞ্চিতে অনেক নতুন মুখ। বিভূতিদার সঙ্গে প্রথম যাদের দেখেছিলাম, তাঁদের অনেকেই নেই। লোক পাল্টিয়েছে। কিন্তু বেঞ্চির রূপ পাল্টায়নি। ঠিক আগের মতো সব কিছু। ছোকাদাকে মনে পড়ছিল। তাঁর কৈশোরে হাইকোর্টের রূপ একই ছিল। আরও আগে হাইকোর্ট কেমন ছিল জানি না। কেউ লিখে যাননি তখনকার কথা। সে যুগের বাবুদের জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে তাঁদের সায়েবদের। এই একই বেঞ্চিতে বসে বাবুরা হয়তো সুখ দুঃখের গল্প করতেন। বার-লাইব্রেরীর ভিতরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু কেদারবাবুর কাজ বাড়ছে। নতুন বই আসছে প্রতিমাসে। র‍্যাকগুলো উঁচু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মইটাও বড় করতে হচ্ছে।

বাসুদেব এসেছিল চেম্বারে। মাদ্রাজের খবর নিতে। চিঠি আসেনি এখনো।

কয়েকদিন পরে চিঠি এল। পেন্সিলে লেখা দেওয়ান সিং-এর চিঠি—সায়েবের শরীর ভালো নেই, লাঞ্চের আগে কোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন।

মনটা খারাপ। চেম্বারে হাজিরা দিয়ে হাইকোর্টে গেলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মক্কেলদের দেখছিলাম। চিনি না তাদের। কিন্তু তাদের মতো অনেককে দেখেছি। লোকটা হয়তো জিতবে, ফিরে যাবে আনন্দে। কিংবা ভাগ্যে রয়েছে দুঃখময় পরিণতি।

দুঃখের প্রতি স্বাভাবিক টান আছে নাকি আমার? প্রশ্ন করি নিজেকে। বেদনার উপলব্ধিকে আমি কিছুতে এড়াতে পারি না। প্রেমের নয়, আমার জন্য বিষাদের ফাঁদই পাতা আছে ভুবনে ভুবনে। তাই বিষাদের মধ্যেই আনন্দ সন্ধানের চেষ্টা করি। যারা আসে এখানে তারা আনন্দ নিয়ে আসে না। সমস্যার সমাধানেও আনন্দ ফিরে পায় না অনেকে। জিতটা হয় হারের সামিল। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাবুদের বেদনার উপলব্ধি ক্ষণিকের। আমরা উপভোগ করি হাইকোর্টের প্রতিটি মুহূর্ত। আমাদের সায়েবরা যখন কোর্টে কোমর-বেঁধে ঝগড়া করেন, আমাদের মক্কেলরা যখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফলাফলের প্রতীক্ষা করেন, তখন আমরা গল্প করি, বিড়ি চেয়ে খাই, তদ্বিরের খবর নিই। আর সায়েবরা? তাঁরাও তো কোর্টের ঝগড়াঝাঁটিটা কোর্টের মধ্যেই সেরে আসেন। বাইরে ভাই-ভাই।

জজ সায়েবরা? বলতে পারবো না। দূর থেকে সসম্ভ্রমে তাঁদের দেখেছি। এক-এক সময় মনে হয়েছে তাঁরা মানুষ নন। অন্য কিছু। বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় অতি সাবধানে সর্বদা ন্যায় অন্যায় ওজন করে চলেছেন। লিখছেন পাতার পর পাতা, বই হয়ে ছাপা হচ্ছে সে-সব, দপ্তরীরা বাঁধাচ্ছে। এক কপি কেদারবাবু লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রাখছেন।

চেম্বারে তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। পরের দিন তালা খুললাম ঠিক সময়ে।

পিওন এসেছে। টেলিগ্রাম! দেওয়ান সিং-এর টেলিগ্রাম। গতকাল গভীর রাতে সজ্ঞানে সায়েব চোখ বুঝেছেন। তিনি ফিরবেন না।

সেই দিনই আর একটা চিঠি পেলাম সায়েব নিজের হাতে লিখেছেন—

"শংকর,

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে এসেছি। বিশেষ চিন্তা করো না। এখন বেশ ভালো মনে হচ্ছে। তবে কলকাতায় ফিরতে আরও কয়েকদিন দেরি হবে।

চিঠির উত্তর দিও, আর বাসুদেব ক'খানা কাগজ বিক্রি করছে জানাতে ভুলো না।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি"

কাঁদিনি। একটুও কাঁদিনি। নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। এক ফোঁটা জল আসছে না চোখে। বজ্রাঘাতে চোখের জল যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

শেষ। শেষ হয়ে গিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসের এক অধ্যায়। আমারও। চোখ বুজেছেন শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার। ইতি পড়েছে আমারও জীবনের এক অধ্যায়ে।

আইন-পাড়ায় আর নয়। চাকরি পেলেও নয়। এখানে থাকতে হলে পাগল হয়ে যাবো। আবার পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

শেষবারের মতো চেম্বারের দরজা বন্ধ করে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে দাঁড়িয়েছিলাম। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে টেম্পল চেম্বার। স্মৃতির পর্দায় সিনেমা ছবির মতো অসংখ্য দৃশ্য ভেসে উঠছে।

বিভূতিদার হাত ধরে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে আসবার প্রথম দিনটি মনে পড়ছে। লালরঙের হাইকোর্ট-বাড়িটার বিশালতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেদিন সেই অচেনা জগৎকে ভালোবাসতে পারিনি—ছিল ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উপলব্ধি। তারপর পরিচয়ের সূর্যকিরণে ভয়ের মেঘ কেটে গিয়েছে। ছোটো হয়ে এসেছে বিশাল প্রাসাদটি। একতলা, দোতলা, তিনতলার প্রতিটা ঘর প্রতিটা থাম চিনেছি।

তবুও অজানা রয়ে গিয়েছে চৌদ্দ আনা। দু'আনা জানবার আগেই শেষ হয়েছে সময়, ছিন্ন হয়েছে বাঁধন।

যে জীবনকে দেখেছি তার কিছুই বলা হয়নি।

ভাবীকালের কোনো ঐতিহাসিক ভারতের এই প্রাচীনতম ধর্মাধিকরণের প্রামাণিক ইতিহাস নিশ্চয় রচনা করবেন। ইতিহাসের উপাদান রয়েছে যথেষ্ট। হাইকোর্টের রেকর্ড-রুমে জমা হয়ে রয়েছে অসংখ্য দলিল, অগণিত নথিপত্র। ভাবীকালের ঐতিহাসিক সেই স্তূপ থেকে উদ্ধার করবেন কত অজানা তত্ত্ব ও তথ্য।

আমি ঐতিহাসিক নই। ইতিহাসের কোনো উপাদানও রেখে যেতে পারলাম না।

কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ টানবার আগে একটি ছোট কাহিনী মনে পড়ছে। সায়েবই বলেছিলেন আমাকে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে লণ্ডনের এক এক্স-রে ছবির প্রদর্শনীতে তিনি গিয়েছিলেন। বেজায় ভিড়। নতুন রশ্মির অবিশ্বাস্য ক্রিয়াকলাপ দেখতে অনেকে এসেছেন। সায়েবের পাশে দাঁড়িয়ে এক চীনা ভদ্রলোকও ছবি দেখছিলেন। সায়েবের বয়স তখন খুব কম। বালকসুলভ চপলতা-বশে অজানা ভদ্রলোকটিকে তিনি বলে ফেললেন, "কী আশ্চর্য, এই আলোতে দেহের প্রতিটি হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে!" দার্শনিকের গাম্ভীর্য নিয়ে চীনা ভদ্রলোকটি তার দিকে তাকিয়ে, উদাসভাবে বললে, "Yes my boy. But only bones. Unfortunately it does not show your heart"—(হ্যাঁ, তা সত্যি। কিন্তু কেবল হাড়। এতে হৃদয় দেখা যায় না)।

ঠিকই বলেছিলেন চীনা ভদ্রলোকটি এবং আশা করি, আমিও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কেবল আইনের অন্তরস্থিত অস্থিকে খুঁজে বেড়ানোর অপরাধ করিনি।